জ্যামিতি-শিক্ষা

এক দরিদ্রা বিধবা অতি কষ্টে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে মানুষ করিতেছিলেন। পুত্রটিকে তাঁহার ভবিষ্যতের আশা-ভরসার স্থল জানিয়া ঋণ করিয়াও লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। পুত্রের জন্য একজন গৃহশিক্ষকও রাখিয়া দিয়াছিলেন। বালকটি সপ্তম শ্রেণিতে উঠিয়া একদিন উচ্চৈঃস্বরে ইংরেজী ভাষায় জ্যামিতি পাঠ করিতেছিল। গৃহশিক্ষক বালকের সম্মুখে বসিয়া তাহাকে উপদেশ দিতেছিলেন। যখন বালক 'Let ABC be a triangle.' (মনে কর, এ-বি-সি একটি ত্রিভুজ)—এইরূপ পাঠ করিতেছিল, তখন বালকের মাতা ঘরের ভিতর হইতে ইহা শুনিয়াই গৃহশিক্ষকের নিকট আসিয়া তর্জন-গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি আপনাকে প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া মাহিনা দিতেছি। কোথায় বালক উচ্চ শ্রেণিতে উঠিয়া আরও অধিক নূতন পড়া পড়িবে, আর আপনি কি না তাহাকে এখনও এ, বি, সি পড়াইতেছেন! ইহা ত' সে অতি শিশুকালেই বর্ণমালা পড়িবার সময়ই পড়িয়াছে। আজ হইতে আপনাকে আর আমি রাখিব না। আপনি পাঠশালারই মাষ্টার হইবার উপযুক্ত। এ, বি, সি ছাড়া আপনার আর অধিক বিদ্যা নাই।"

বিধবাটি এইরূপভাবে ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, গৃহশিক্ষককে আর কোনো কথাই বলিবার অবসর দিলেন না। তখন বাধ্য হইয়া শিক্ষক মহাশয়কে স্থান ত্যাগ করিতে হইল।

অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি তথাকথিত ধর্মসম্প্রদায়ের যুক্তিও এই বিধবারই মত। তাঁহারা বলেন—"এই জগতে আমরা দাসত্ব করিতে করিতে হীন হইয়া পড়িয়াছি। এই দাসত্বই যত অসুবিধার মূল। ধর্ম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াও যদি দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, এমন কি, মুক্তিলাভের পরেও যদি ভগবানের সেবা অর্থাৎ দাসত্ব করিতে হয়, তবে আর আমাদের উন্নতি হইল কী? আমরা যখন অজ্ঞান থাকি, মায়াবদ্ধ থাকি, তখনই আমাদের দাস-মনোভাব (slave mentality) প্রবল হয়। কিন্তু মুক্তি লাভ করিলে 'আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপই উপলব্ধি হইবে।"

অন্যাভিলাষী—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া যাহাদের হৃদয়ে অন্য কামনা আছে।

কর্মী—যাহারা কর্ম করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম বা শান্তি-ফল কামনা করে, কিংবা কর্মের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়, অথবা কর্মই পরমেশ্বর, ইহা মনে করে।

জ্ঞানী—যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে চাহেন। যাঁহারা বলেন—'জীব' বলিয়া কোন বস্তু নাই, সবই ব্রহ্ম, এই জগৎ মিথ্যা। ভগবানের সেবা বা ভক্তি নিত্য নহে, উহা একটি সাময়িক উপায় মাত্র।

যোগী—যাঁহারা যোগপথ অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার সহিত মিশিয়া যাইতে চাহেন।

তপস্বী—যাঁহারা তপস্যার প্রভাবে সিদ্ধি বা শান্তি লাভ করিতে চাহেন।

শুদ্ধভক্ত—যাঁহারা কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত বা তপস্যাকে ভগবানে প্রেম লাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা একমাত্র পরমেশ্বর বিষ্ণুকেই স্বয়ং ভগবান জানিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তের অনুগত হইয়া কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।

শুদ্ধ ভক্তগণ এইরূপ যুক্তি শ্রবণ করিয়া বলেন যে, ভক্তি বা **ভগবানের সেবা চেতন জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি।** সেই ভক্তি **সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি**—এই তিন অবস্থায় প্রকাশিত হইয়া ভক্তির নিত্যত্বই স্থাপন করে। সাধনকালে যে কৃষ্ণের দাসত্ব, তাহা সাধনভক্তি আর মুক্ত হইয়া সিদ্ধ অবস্থায় যে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দাসত্ব বা সেবা তাহা প্রেমভক্তি। মুক্তাবস্থায় যে ভগবানের দাস্য, তাহাই অপ্রতিহতা সেবা। 'বর্ণ-পরিচয়' কালে এ, বি, সি, ডি (A, B, C, D), বা ক, খ, গ, ঘ শিক্ষা করা যায়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত হইয়াও সেই বর্ণমালারই বিলাস বা বিচিত্রতাই আলোচনা করিতে হয়।

যাহারা **নির্বিশেষবাদী,** তাহারাই বিধবার যুক্তির ন্যায় এ, বি, সি, ডি কেবল অতি শিশুরই পাঠ্য, উহা আর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কার্যে আসে না—এরূপ কল্পনা করে। কৃষ্ণের দাসত্ব কেবল সাধনকালে করিতে হইবে, তাহা নহে, সিদ্ধ অবস্থা লাভ করিয়াও চিরকাল কৃষ্ণের দাসত্ব নিত্য নূতনভাবে করিতে হইবে। **সিদ্ধাবস্থায়** যে কৃষ্ণের দাসত্ব বা সেবা, তাহাই প্রকৃত ল সম্পূর্ণ সেবা। মায়ার দাসত্ব ও কৃষ্ণের দাসত্ব এক নহে।

জীবাত্মা—জীব + আত্মা; শুদ্ধজীব। জীবাত্মা ভগবানের অতি ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ। অপ্রতিহতা—যাহা প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয় না।

নির্বিশেষবাদী—যাঁহারা বলেন—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ভক্ত প্রভৃতি নিত্য নহে। মুক্তিতে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান বলিয়া কিছু থাকে না।

সিদ্ধাবস্থা—সাধন করিতে করিতে যখন সিদ্ধি বা প্রয়োজন লাভ হয় সেই অবস্থা; মুক্তাবস্থা।

'কস্ত্বং' 'খস্ত্বং'

এক গ্রামে এক সময় বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধরগণ লেখা পড়ার প্রতি এতটা বিরাগী হইয়া পড়িল যে, উহারা অধিকাংশ সময়ই তাস, পাসা, দাবা, জুয়া প্রভৃতি খেলিয়া কাটাইত। কেবলমাত্র পেটের জন্যই যজমানের পূজা-পার্বণাদি করিতে যাইত বটে, কিন্তু অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমানকে ও দেবতাকে বঞ্চনাই করিত, অথচ লোকের নিকট গর্ব করিয়া বেড়াইত যে, তাহাদের মত পণ্ডিত আর পৃথিবীতে নাই; কারণ, বহু প্রাচীন পণ্ডিতের রক্ত তাহাদের শরীরে রহিয়াছে।

একজন সত্যপ্রিয় ব্যক্তি ঐ সকল তথাকথিত পণ্ডিতের গর্ব খর্ব করিবার জন্য এক প্রকৃত পণ্ডিতকে অনেক অনুরোধ করিয়া সেই গ্রামে লইয়া আসিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যখন গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন ঐ সকল বঞ্চক ব্যক্তি তাহাদের গ্রামের মোড়লের নিকট গিয়া এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। মোড়লটিকে গ্রামের সকলেই 'দাদা ঠাকুর' বলিয়া ডাকিত এবং তাহাদের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—''তোমাদের কোনো ভাবনা নাই। পূর্বপুরুষগণের যে রক্ত আমার মধ্যে রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই এই পণ্ডিতকে পরাস্ত করিব। আমি উহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিব। আর অধিক কিছু বিচার

করিতে বা আমাদের কলঙ্কের কথা তুলিতেই পারিবে না। তাহাকেই অপমানিত হইয়া চলিয়া যাইতে হইবে।''

পণ্ডিত মহাশয় বিচার-সভায় আসিয়া দেখিলেন যে, গ্রামের দাদা ঠাকুরটি উচ্চ আসনে বসিয়া রহিয়াছেন। তখন পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''কস্ত্বং?'' অর্থাৎ ''তুমি কে?'' দাদা ঠাকুর এক নিঃশ্বাসে বলিতে লাগিলেন—''খস্ত্বং গস্ত্বং ঘস্ত্বং ঙস্ত্বং চস্ত্বং ছস্ত্বং জস্ত্বং ঝস্ত্বং ঞস্ত্বং টস্ত্বং ঠস্ত্বং ..... ক্ষস্ত্বং''।

পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, এরূপ পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার বিচার করা বৃথা; কাজেই সসম্মানে স্থান পরিত্যাগ করাই ভাল। যখন পণ্ডিত মহাশয় দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্থান ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন দাদা ঠাকুরের শিষ্যগণ উচ্চহাস্য করিতে করিতে বলিল—''দেখিলে? দাদা ঠাকুর কত বড় পণ্ডিত। অমন পন্ডিতকেও আর মুখ খুলিতে হইল না। দাদা ঠাকুরের সঙ্গে সংস্কৃতে বিচার করিতে পারে—এরূপ লোক কি পৃথিবীতে আছে? দাদা ঠাকুর কি অনর্গলই না সংস্কৃত বলিতে পারেন! যেন মুখে ফুলঝুরি ছোটে!''

কতকগুলি লোক পুরুষানুক্রমে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভগবানের পার্ষদ মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া অভিমান করিয়া **ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ নিষ্কিঞ্চন** শুদ্ধ-বৈষ্ণবের উচ্চ কুল ও পাণ্ডিত্যের অভাব কল্পনা করে। তাহারা সেই জড়-অভিমানে মত্ত

ভক্তিসিদ্ধান্ত—ভক্তির তত্ত্ব বিচার বা মীমাংসা।

নিষ্কিঞ্চন—যিনি জাগতিক ধন-জনের ভিখারি নহেন, ভগবানে শরণাগত।

হইয়া অনুস্বারবিসর্গের পাণ্ডিত্যের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিবার স্পর্ধা করিয়া থাকে। যখন কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণব ইহাদিগকে প্রশ্ন করেন—''কস্ত্বং'' অর্থাৎ ''তুমি কে? তোমার স্বরূপ কী?'' তখন **স্থূলবুদ্ধি জড়-অহঙ্কারী** ব্যক্তিগণ তাহাদিগের দেহটাতেই 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া এক নিঃশ্বাসে **অপরা বিদ্যার** জড়-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উত্তর প্রদানপূর্বক বৈষ্ণবকে জয় করিবার অভিমান করিয়া থাকে। সেরূপ পাণ্ডিত্য 'অস্ত্বং হইতে ক্ষস্ত্বং' পর্যন্ত অপরা বিদ্যার পাণ্ডিত্য-প্রলাপ-মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিত 'কস্ত্বং'—কে তুমি?' এই প্রশ্নের উত্তরে ''গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ''—অর্থাৎ ''আমি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের দাস, তাঁহার দাস''—এইরূপ উত্তরই প্রদান করিয়া থাকেন।

৯০ ❀ ৩৫

ইয়েস, নো, ভেরিগুড

YES, NO, VERY GOOD

একজন গ্রাম্য লোক শুনিয়া শুনিয়া কিছু ইংরাজী শিখিয়াছিল। সে 'ইয়েস্ (Yes), নো (No), ভেরি গুড (Very

স্থূলবুদ্ধি—মোটা বুদ্ধি অর্থাৎ 'দেহটাই আমি', যাহার এইরূপ বিচার।

জড়-অহঙ্কারী—পৃথিবীর অহঙ্কারে মত্ত।

অপরা বিদ্যা—বিদ্যা দুই প্রকার, পরা ও অপরা। যে বিদ্যার দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয় না তাহা অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা; আর যে বিদ্যার দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা বা ভক্তি।

Good)', এই কয়েকটি শব্দই বিশেষভাবে মনে রাখিয়াছিল। কিন্তু কোন্ অর্থে ও কোথায় এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা সে জানিবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই বা পরিশ্রম স্বীকার করে নাই। তবে তাহার এইমাত্র বোধ হইয়াছিল যে, এই তিনটি শব্দ লোকের নিকট বলিতে পারিলেই 'ইংরেজী-নবিশ' বলিয়া সম্মান লাভ করা যায়।

এক সময় কয়েকজন দুষ্ট লোক একটা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড করিয়া আত্মগোপন করিবার জন্য ঐ গ্রাম্য লোকটিকেই বোকার মত দেখিয়া আসামী বলিয়া ধরাইয়া দিল। যখন লোকটিকে বিচারকের সম্মুখে আনয়ন করা হইল, তখন বিচারক মহাশয় লোকটিকে বাংলা ভাষায়ই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি খুন করিয়াছ?" গ্রাম্য লোকটি মনে করিল—যদি সে হাকিমের নিকট দুই-চারটি ইংরেজী 'বুকনি' বলিতে পারে তাহা হইলে হাকিম নিশ্চয়ই শ্বেতাঙ্গের (সাহেবের) অনুচর মনে করিয়া তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন এবং ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগের দায় হইতে মুক্তি দিবেন। এইরূপ বিচার করিয়া গ্রাম্য লোকটি বিচারকের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিল—"ইয়েস্" (হ্যাঁ)! বিচারক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সঙ্গে আর কেহ ছিল কি?" উত্তরে গ্রাম্য লোকটি তৎক্ষণাৎ বলিল—"নো" (না)। তখন হাকিম বলিলেন—"তাহা হইলে তোমাকে জেলে যাইতে হইবে, তুমি তাহাতে প্রস্তুত আছ কি?" গ্রাম্য লোকটি এবার বিচার করিল—এবারে সে তাহার শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করিয়া হাকিমের এই অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করিবে। সে আদৌ খুন করে নাই, সুতরাং কিছুতেই তাহার জেল

হইতে পারে না সে খুব ভালমানুষ, ইহা জানাইবার জন্য হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"ভেরি গুড" (আচ্ছা)।

ভক্তিরাজ্যেও কতকগুলি লোক শুদ্ধভক্তগণের উপদেশ, **পরিভাষা** ও সিদ্ধান্তের প্রকৃত মর্ম **উপলব্ধি** করিতে না পারিয়া কেবল তোতাপাখির মত ঐ সকল কথা উচ্চারণ করে। উহারা ঐ উপায়ে লোকের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিবার ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু তাহাদের দশা এই গ্রাম্য লোকটিরই ন্যায় হইয়া থাকে। সাধু ও শাস্ত্র-বাক্যের 'বদহজম' হইলে সাধুসমাজ কখনই উহাকে আদর করেন না। তদ্দ্বারা মায়ার দণ্ড-ভোগ হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অনেক জাগতিক তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত এবং আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে ভক্তি, ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধে সভা-সমিতিতে ও সাহিত্যে এরূপ হাস্যাস্পদ উক্তি করিতে দেখা যায়; তাহা দেখিয়া শুনিয়া শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তের পরীক্ষক ও বিচারকগণ ঐ সকল উক্তিকে উক্ত গ্রাম্য লোকটির "ইয়েস, নো, ভেরি গুড"-এর মতই মনে করেন। ঐরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াও কার্যকালে ঐ সকল ব্যক্তিকে মায়ার জেলখানায় দণ্ডভোগ করিতে হয়।

পরিভাষা—বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা বা শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে যে-সকল তাৎপর্য নির্দেশ করা হয়।

উপলব্ধি—অনুভব।

ব্যাকরণের পণ্ডিত

এক সময় একজন সংস্কৃত ব্যাকরণের পণ্ডিত বনের পথ দিয়া সন্ধ্যার পূর্বে শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিলেন। কয়েকজন পথিক মহাশয়কে একাকী ঐরূপভাবে বনের পথে চলিতে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন—''পণ্ডিত মহাশয়! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এই জায়গায় বাঘের ভয় আছে; আপনি আর বনের পথে না চলিয়া নিকটবর্তী গ্রামে যাইয়া আজ রাত্রি বাস করুন।'' ইহা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন—''তোমরা ত' মূর্খ লোক, কখনও ব্যাকরণ পড় নাই; কিরূপেই বা 'ব্যাঘ্র' শব্দের অর্থ জানিবে। জান, 'ব্যাঘ্র' শব্দটি 'বি' পূর্বক, 'আ' পূর্বক 'ঘ্রা' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ড' প্রত্যয় (বি—আ—ঘ্রা + কর্ত্তৃবাচ্যে ড) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে বিশেষরূপে আঘ্রাণ করিয়া থাকে, তাহাকে 'ব্যাঘ্র' বলে। সুতরাং ব্যাঘ্র হইতে কোনো ভয়ের কারণ নাই। যদি আমার সহিত কোনও সময় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎকার হয়, তবে সে আমার এই পরম পুণ্যময় শরীরটি বিশেষরূপে ঘ্রাণ করিবে মাত্র। তাহাতে আপত্তি কী? পরোপকার করাই ত' ব্রাহ্মণের ধর্ম।''

পণ্ডিতের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই বনের ভিতর হইতে একটি বাঘ বাহির হইয়া পণ্ডিতের উপর লাফাইয়া পড়িল ও তাঁহার ঘাড়ের রক্ত পান করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাঘ্রের কবলে কবলিত ব্যাকরণের পণ্ডিত তখন ''ঘ্রা-ধাতুঃ ক্বচিত্তু খাদনেঽপি বর্ত্ততে''—অর্থাৎ কখনও কখনও 'ঘ্রা'-

ধাতু 'ভক্ষণ' অর্থেও যে ব্যবহৃত হয়, এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটা আজ লাভ করিলাম!''—ইহা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যাহারা কেবল জড় পাণ্ডিত্যের দ্বারা শাস্ত্র ও ধর্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার স্পর্ধা করে, তাহাদের অবস্থাও উক্ত ব্যাকরণের পণ্ডিতের ন্যায়ই হইয়া থাকে। জড়দেহে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই 'মায়াবদ্ধ জীব'। সেই বদ্ধজীব নিজেকে যতই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করুক বা জগতের লোক তাহাকে যতই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া জানুক, কিংবা সে বাহ্য-দর্শনে যতই ত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া থাকুক না কেন, শুদ্ধভাবে হরিভজন না করায় সে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। যাহাদের শ্রীকৃষ্ণের চরণে শুদ্ধভক্তি নাই, তাহারা বহু দেব-দেবীর পূজা বেদ-বেদান্ত উপনিষদ-মহাভারত-গীতা, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি বহুশাস্ত্র পাঠের অভিনয় করিয়াও সংসাররূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। তাহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য যে একমাত্র হরিভজন, তাহা কার্যক্ষেত্রে স্ব-স্ব জীবনে পালন করিতে পারে না। তাহারা যে পিতৃপুরুষের পূজা ও সন্ধ্যা-বন্ধনাদি করিয়া থাকে, এমনকি, ভগবানের নাম-গ্রহণের অভিনয় পর্যন্ত করে, তাহাও কেবল অন্ন-বস্ত্র বা ইহ-পরকালে ভোগ-সুখ-সংগ্রহ কিংবা জগতের ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে। যে-পর্যন্ত ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহার সেবা না করিব, সে-পর্যন্ত আমাদের আত্মমঙ্গললাভের উপায় নাই। এজন্য

শ্রীচৈতন্যদেব ব্যাকরণের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্র, বৃত্তি ও টীকার তাৎপর্য্য যে একমাত্র হরিনামপর, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম স্বয়ং 'কৃষ্ণ'; কৃষ্ণের সেবা করাতেই পাণ্ডিত্য, কৌলীন্য ও ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

''ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥''

—চর্পট পঞ্জরিকা-স্তোত্র

হে মূঢ়মতে! তুমি গোবিন্দের ভজনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ করণে'—ব্যাকরণের এই সূত্র অর্থাৎ পাণ্ডিত্য তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অসুরদিগকে মোহন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য এইসকল উপদেশ প্রদান করিলেও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কুতার্কিক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা 'গোবিন্দে' নিত্যাভক্তির অনুশীলন করিবার পরিবর্ত্তে 'গোবিন্দ'কে অনিত্য বস্তু ও 'ভক্তি'কে অনিত্য ব্যাপার বলিয়া তর্ক ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব 'কৃষ্ণনাম'কে সর্ব্বকালেই 'সত্য' বলিয়াছেন—

''আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম ॥
প্রভু বলে—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন ॥

হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তা'র অসত্য-বচনে ॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগৎ-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥
হেন কৃষ্ণনামে যা'র নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র, তাহার দুর্গতি ॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যা'র, সে-ই দুঃখ পায় ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥''

—শ্রীচৈতন্যভাগবত মঃ ১।১৪৬-১৫৯

ব্যাঙের আধুলি

কোন এক পুকুরে এক ব্যাঙ বাস করিত। সে একদিন দৈবাৎ একটি আধুলি (আট আনা মুদ্রা) কুড়াইয়া পাইয়াছিল। আধুলিটি পাইয়াই ব্যাঙটি অহঙ্কার করিয়া বলিল—''আমার মত ধনী আর কে? এবার রাজার হাতী জল পান করিতে আসিলে আমি উহাকে বাঁধিয়া রাখিব, কিছুতেই জল পান করিতে দিব না।'' ব্যাঙটি এই বলিয়া ঘাটে আধুলির উপর বসিয়া রহিল; এমন সময় রাজার মাহুত হাতী লইয়া পুকুরে নামিল। ইহা দেখিয়া ব্যাঙটি হাতিকে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য আধুলি ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি লাফ দিয়া হাতীর পায়ের নিকট গিয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ হাতীর পায়ের চাপে প্রাণ হারাইল।

জগতে যাঁহারা কর্মবীর বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহাদের সম্বলও ঐরূপ 'ব্যাঙের আধুলি'র ন্যায়ই অকিঞ্চিৎকর। কর্মীর কর্মবীরত্ব যে-কোন মুহূর্তে সংসারচক্রে পিষ্ট হইয়া যায়; কারণ, তাহা **প্রকৃতিজাত ঐশ্বর্য্যবিশেষ**। এইজন্যই গীতা বলিয়াছেন—

''প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥''

—গীতা ৩।২৭

প্রকৃতির গুণদ্বারা যে-সকল কার্য কৃত হয়, অহঙ্কার-বশতঃ

প্রকৃতিজাত—পৃথিবী বা জগতের স্বভাব হইতে উৎপন্ন।
ঐশ্বর্য—বিভূতি, প্রভুত্ব।

জীব সেই সমস্ত কার্য স্বকৃত মনে করিয়া 'আমি কর্তা'—এইরূপ অভিমান করে। এইরূপ অহঙ্কারী ব্যক্তি আপনাকে জগতের ভোগের মালিক কল্পনা করিয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে। ইহারা বুঝিতে পারে না যে, যে কোন মুহূর্তেই ইহাদের অহঙ্কারের বিপুল সৌধ প্রকৃতিদেবীই ভূমিস্যাৎ করিয়া দিতে পারেন। পৃথিবীর স্বাধীনতার ও অধীনতার অহঙ্কারের কোন মূল্য নাই। আজ যে রাজা, কাল সে পথের ভিখারি; আজ যে ভিখারি, কাল সে নশ্বর ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে অহঙ্কারী; এইজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন—

''রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম-ঈশ্বর সেই,
তাঁরে মন সদা কর ভয় ॥

—ঠাকুর শ্রীনরোত্তম

ব্যাঙ ফাটা

কোন ডোবায় একটি ধাড়ী ব্যাঙ বাস করিত। একদিন তাহার এক পুত্র কোনও জলাশয়ে গিয়া ''রাজার হাতী'' দেখিয়া আসিল। তখন শিশু ব্যাঙটি মাতার নিকট আসিয়া আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল—''মা, আমি আজ একটি খুব বড় জন্তু দেখিয়া আসিলাম।'' তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিল—''কত বড় জন্তু দেখিয়াছ!'' শিশু ব্যাঙটি বলিল—''তোমা অপেক্ষা অনেক বড়।

ধাড়ী ব্যাঙ (শরীর ফুলাইয়া)—এত বড়?

শিশু—ওঃ, আরও বড়।

ধাড়ী (আরও শরীর ফুলাইয়া)—এত বড়?

শিশু—ইহা অপেক্ষা আরও বড়।

এইরূপে ধাড়ী ব্যাঙ ক্রমশঃ শরীর ফুলাইতে লাগিল। শিশুটিও ''আরও বড়, আরও বড়'' বলিতে লাগিল। সীমার অতিরিক্তভাবে শরীর ফুলাইতে গিয়া ধাড়ী ব্যাঙটির উদর একটা বিকট শব্দ করিয়া ফাটিয়া গেল।

যাহারা ক্ষুদ্র জীব হইয়া আপনাদিগকে 'পরব্রহ্ম' ('পর'—শ্রেষ্ঠ, 'ব্রহ্ম'—বৃহৎ; অর্থাৎ যাঁহার সমান বা যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই) বলিয়া কল্পনা করে, কিংবা অনর্থযুক্ত ক্ষুদ্র সাধক জীব হইয়া সিদ্ধের সহিত আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করে, তাহারাও ভেকের ন্যায় দম্ভবশে স্ফীত হইতে হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

''জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

* * *

মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥

* * *

প্রভু কহে—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা ॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥

* * *

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥''

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ১৮।১১৩-১৫)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'ব্যাঙ-ফাটা'র গল্পটি উল্লেখ করিয়া শিক্ষা দিতেন যে, 'বড় আমি'

অনর্থ—চারি প্রকার। (১) আমরা যে নিত্যকালই কৃষ্ণের দাস, তাহা ভুলিয়া আমাদিগের দেহকে 'আমি' বুদ্ধি; (২) যে বস্তু চিরকাল থাকিবে না, তাহা লাভের জন্য পিপাসা; (৩) মানসিক নানাপ্রকার দুর্বলতা; (৪) ভগবান ও ভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধ অর্থাৎ তাঁহাদিগকে এই জগতের বস্তুর ন্যায় মনে করা।

হওয়া অপেক্ষা 'ভাল আমি' হওয়াই মঙ্গলজনক। 'আমি ব্রহ্ম', 'আমি সিদ্ধ', 'আমি বৈষ্ণব', 'আমি পণ্ডিত', 'আমি বুঝদার'—এইরূপ অহঙ্কারই জীবের পতনের মূল। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি কখনও আপনাকে এই প্রকৃতির বা বিশ্বের ভোক্তা কর্মবীর, ধর্মবীর প্রভৃতি কল্পনা করেন না; তিনি আপনাকে গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য-পদধূলিরূপেই উপলব্ধি করেন, তাঁহার হৃদয়ে সর্বদাই অকপট দৈন্য বিরাজিত থাকে। জীব কখনই পরব্রহ্ম, রাবণ কখনই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হইতে পারে না।

ဢ❀ಌ

মধু ও মূর্খ মৌমাছি

একটি মৌমাছি এক স্বচ্ছ বোতলের মধ্যে মধু দেখিতে পাইয়া ঐ মধু আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিল। মধু যে একটি কাচের আবরণে আবৃত আছে, মূর্খ মৌমাছি তাহা না জানিয়া মধু পান করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে বোতলের উপর বসিয়া মনে করিল, সে সত্য-সত্যই মধুর আস্বাদন লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ মৌমাছিটি মধুর মিষ্টতা আস্বাদন করা দূরে থাকুক; মধু স্পর্শও করিতে পারিল না, কেবল বঞ্চিতই হইল।

জগতের প্রত্যক্ষবাদী ব্যক্তি ও প্রাকৃত সহজিয়াগণ প্রেমরস

আস্বাদন করিয়াছে, মনে করে। বস্তুতঃ তাহারা অপ্রাকৃত রসের কোনো সন্ধানই পায় না। আধুনিক কালে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজনগণের গান শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার অভিনয় করিয়া মনে করে যে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করিতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বা অপ্রাকৃত রসের কোনো সন্ধানই পায় না। কালাপাহাড়ের ন্যায় কোন কোন বিধর্মী ও অত্যাচারী ব্যক্তি ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির বিনাশ (?) করিয়া ফেলিয়াছে মনে করিতে পারে, কিংবা কোনো কোনো আধ্যক্ষিক তথাকথিত ধর্মপ্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতাদি গ্রন্থের মধ্যে অনেক 'গলদ' বাহির করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন! রাবণও সীতাকে হরণ করিয়া ভোগ করিবে, মনে করিয়াছিল। বস্তুতঃ ইহারা ঐ সকল বস্তু স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করিতে পারে নাই। রাবণ ছায়া-সীতাকে হরণ করিয়াই 'শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মীকে হরণ করিয়াছি'—এইরূপ মনে করিয়া মনকলা খাইয়াছিল। কেহ যদি ঈর্ষায় ক্রোধভাবাপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের একটি মানচিত্রকে

প্রত্যক্ষবাদী—জাগতিক বস্তুর ন্যায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকেও মাপিয়া লওয়া যায়, যাহারা মনে করে!

প্রাকৃত সহজিয়া—যাহারা রক্ত-মাংসের ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের অতীত শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও তাঁহার ভক্তের বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়—এরূপ কল্পনা করে।

আধ্যক্ষিক—যাহারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ের অতীত ভগবানের বিষয় মাপিয়া লইতে সমর্থ বলিয়া অভিমান করে।

ছিঁড়িয়া ফেলে এবং মনে করে যে, সে সমগ্র ভারতবর্ষকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে উহা যেমন তাহার মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ যাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা প্রতারিত হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের চেষ্টাও মূর্খতার চরম সীমা। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদে-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥"

—শ্রীচৈনতন্যচরিতামৃত মঃ ৯।১৯৫

এই শিক্ষাটিই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মধুমক্ষিকার ঐ উদাহরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

দূর ছাই! ভক্তিতে ভোগ ও ত্যাগ কৈ

এক কর্দমাক্ত জলাশয়ের তীরে কতকগুলি বক বসিয়াছিল সেই স্থান দিয়া এক রাজহংস যাইতেছিল। একটি বক ঐ রাজহংসকে জিজ্ঞাসা করিল—

অপ্রাকৃত—যাহা ভগবানের ইন্দ্রিয় তর্পণ করে, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় যাহা মাপিয়া লইতে পারে না। যাহাতে গোলোকের বিচিত্রতা আছে।

তোমার চক্ষু, মুখ, পদদেশ প্রভৃতি লাল বর্ণের কেন? কে তুমি? রাজহংস বলিল—আমি রাজহংস।

বক—কোথা হইতে আসিতেছ?

হংস—মানস সরোবর হইতে।

বক—সেখানে কী আছে?

হংস—তথায় স্বর্ণের পদ্মবন আছে, অমৃতের ন্যায় জল আছে, উহার চতুর্দিকে রত্নবেদীতে বাঁধান নানাপ্রকার ফল-পুষ্পের বৃক্ষ শোভা পাইতেছে।

বক—উহাতে কি বড় বড় শামুক আছে?

রাজহংস—না।

এই কথা শুনিয়াই বকগুলি 'হি' 'হি' করিয়া হাসিয়া উঠিল, "আরে দূর ছাই! যখন শামুকই নাই, তখন উহা সরোবরের মধ্যেই গণ্য নহে। উহার ধারেও যাইতে নাই।"

অনেক সময় জগতের অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তি বা শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। যদি তাঁহারা শুনিতে পান যে, সে-স্থানে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের অনুশীলন বা হরিকথা-প্রচারের দ্বারা জীবের নিত্য-কল্যাণ বিধান করা হয়, তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন—"তথায় সেবা-ধর্ম (?) আছে কি?" সেবা-ধর্ম বলিতে তাঁহারা বুঝেন,—প্লেগ, বসন্ত বা কলেরা-রোগীর পরিচর্য্যা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা ভূমিকম্পে ক্লিষ্ট ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে অন্ন-দান, বস্ত্র-দান ইত্যাদি! যদি ভগবদ্ভক্ত বলেন যে, শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে সেই সকল কর্ম কিছুই নাই, তখন তাঁহারা 'হি' 'হি' করিয়া হাসিয়া উঠেন—অর্থাৎ বিদ্রূপ-

সহকারে বলেন—"যে স্থানে প্লেগ, বসন্ত, কলেরা রোগীর পরিচর্যা বা ক্ষুধার্তকে অন্ন-দান, পিপাসার্তকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, জাগতিক শিক্ষাহীনকে জাগতিক শিক্ষা দান প্রভৃতি ধর্ম-কর্ম নাই, তাহা কেবল অলস ও অকর্মণ্য পেটুকদের আলসেখানা—উহার ধারেও কোনো বিবেচকেরই যাওয়া উচিত নহে।"

যদি তাঁহাদিগকে বুঝান যায় যে, জীবের ক্লেশের মূলোচ্ছেদনে চেষ্টা না করিয়া কেবল উহার সাময়িক উপশমের চেষ্টার দ্বারা কেহ কখনও বহুরূপী ক্লেশের হস্ত হইতে নিত্য-পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না, তখন তাঁহারা ঐ সকল কথাকে আমলই দেন না।

জীব নিত্যকালই কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণকে ভুলিয়া তাহাকে অসংখ্য প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে করিতে যখন তাহার স্বরূপের ধর্ম জাগরূক হইবে, তখন অনায়াসে ও আনুষঙ্গিক ভাবেই সমস্ত ক্লেশের মূল উৎপাটিত হইবে, তজ্জন্য পৃথগ্‌ভাবে আর অনিত্য দৈহিক ক্লেশাদি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। ভগবানের শ্রীনাম-বিতরণ ও তাঁহার কৃপায় লোকের আত্মার জাগরণ-কার্যই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপহার; ইহার আভাসেই দুঃস্থ ও আর্ত্তের ক্লেশের মূল অনায়াসে উৎপাটিত হয়। তথাকথিত ধনী, নির্ধন—সকলেরই প্রকৃত নিত্য-মঙ্গল-লাভ ইহা দ্বারাই হইতে পারে। ইহার দ্বারা সার্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক পরোপকার এবং পরার্থপরতা নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব সম্মেলন সাধিত হইতে পারে। নিখিল চেতন

ও অচেতন বিশ্বসমূহের একমাত্র পতি ও পালক কৃষ্ণের সেবায় তথাকথিত বিশ্বপ্রেমের অভাব নাই—যেমন, এক কোটি টাকার মধ্যে এক পাই আছে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যেও প্রকৃত বিশ্বপ্রেম, প্রকৃত দেশপ্রেম প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় আছে। অতএব যাঁহারা ভগবানে ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই যথার্থ জীব-কল্যাণ ও পরোপকার সাধন করিয়া থাকেন। প্রকৃত ভক্তগণ অলস বা অপস্বার্থপর নহেন। তাঁহারা সর্বত্র দিবা-রাত্র অবিশ্রান্তভাবে শ্রদ্ধাবন্ত জনগণের নিকট শব্দব্রহ্মের প্রচারের আনুকূল্যে যাবতীয় চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ভক্তিতে কৃষ্ণেরই পরিপূর্ণ স্বার্থ বা কামপূরণের চেষ্টা আছে। তাহাতে জীবের ভোগ বা ত্যাগের কোনও অংশ নাই। যাঁহার কৃষ্ণভক্তি আছে, তাঁহাতে সমস্ত সদ্‌গুণই বিদ্যমান।

সার্বজনীন—সর্ব-সাধারণের হিতকর।

অসাম্প্রদায়িক—যাহা কোনো জাতি, দেশ, সমাজ, ব্যক্তি বা সঙ্কীর্ণমতে আবদ্ধ নহে।

পরার্থপরতা—পরের অর্থ বা প্রয়োজনের নিমিত্ত যে চেষ্টা বা ধর্ম।

নিঃস্বার্থপরতা—যাহা নিজের ভোগের নিমিত্ত চেষ্টা নহে।

স্বার্থপরতা—'স্ব' অর্থাৎ আত্মার, চেতনের অর্থ—প্রয়োজন যাহা, তদ্বিষয়ে রত ব্যক্তির ধর্ম।

শব্দব্রহ্ম—শব্দরূপী ব্রহ্ম, হরিকথা, হরিনাম।

আনুকূল্য—যাহা অনুকূলে কৃত হয়, সাহায্য, সেবা।

কান দিয়ে সাধু দেখ

যখন সবেমাত্র সাহেবেরা এ দেশে আগমন করিয়াছেন, তখন এ দেশের দ্রব্যাদির-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতা হয় নাই। সেই সময়ের আই-সি-এস পাশ করা এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের খুব লম্বা গোঁফ-দাড়ি ছিল। জ্যৈষ্ঠমাসে সাহেব একটি কাঁঠাল ভেট পাইয়াছিলেন। তিনি আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেটি একটি সুস্বাদু মিষ্ট ফল এবং তাহা ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। সাহেব তাঁহার অপরিচিত ফলটিকে তাঁহার খাস-কামরায় রাখিয়া আসিবার জন্য আর্দালিকে বলিলেন এবং অবসর সময়ে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কাঁঠালটি খাইতে আরম্ভ করিলেন। কাঁঠালটি ভাঙ্গিয়া কোয়াগুলি বাদ দিয়া খোসার উল্টা পিঠটি মুখে দিতেই সাহেব মিষ্ট রস পাইলেন এবং আনন্দের সহিত ভোতাটি চুষিতে লাগিলেন। এদিকে কাঁঠালের ভোঁতার সমস্ত আঠা তাঁহার গোঁফ-দাড়িতে জড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে কিম্ভূত-কিমাকার করিয়া দিল। তখন আর তিনি এ ব্যাপার গোপন রাখিতে পারিলেন না। আর্দালিকে ডাকিয়া তাহার উপর ভীষণ তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন—যেন সেই আর্দালি কাঁঠালের দ্বারা তামাসাচ্ছলে সাহেবকে বিপদে ফেলিবার দৌরাত্ম ও ধৃষ্টতা করিয়াছে।

সে বেচারা ত' ভয়েই অস্থির! কিছুক্ষণ পরে বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—''হুজুর, মেহেরবানি কর্‌কে পহিলে মুসে বাৎ শুনিয়ে, পিছে কসুর মালুম্ হোয়ত' আপকি য্যাছি মর্জ্জি হোয়, ঐছে কিজিয়ে। অর্থাৎ সাহেব! অনুগ্রহ করিয়া প্রথমে আমার নিকট বিষয়টি শুনুন, পরে যদি আমার কোনো ত্রুটি বুঝিতে পারেন, তবে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা করিবেন।''

সাহেব একটু ঠাণ্ডা হইলেন। আর্দালিটি পুনরায় বলিতে লাগিল—''হুজুর, ইছ্ চিজ্ খানেকী রীতি য়্যাছি নেহি; আপ্ জো খা চুকা, উয়োত' ফেক্ দেনে কী চীজ্ হ্যায়্। মগর উস্‌কো বিচ্‌মে যিছ্ আণ্ডা-মাফিক চিজ্, ইছ্ খানেকী চিজ্ হ্যায়। ইয়ে নোকর্‌কো কুছ কসুর নেহি; হুজুর মেরা রাখনেওয়ালা মারণেওয়ালা হ্যায়্। হুজুরকো য্যায়ছি মর্জ্জি, কিজিয়ে। অর্থাৎ সাহেব, ঐ জিনিস খাওয়ার প্রণালী পৃথক। আপনি যাহা খাইতেছিলেন, তাহা ফেলিয়া দিতে হয়; কিন্তু উহার মধ্যে যে ডিমের ন্যায় বস্তু আছে, উহাই খাইতে হয়। ইহাতে আমার কোনো ত্রুটি হয় নাই; এখন কৃপা করিয়া আপনি আমার প্রতি যাহা ইচ্ছা বিধান করিতে পারেন।'' সাহেব এবার নিজের বোকামি বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরভাবে হুকুম করিলেন—''হাজাম্ বোলাও। খবরদার, তুম্ আপ্‌নে হুঁসিয়ার রহো, উসকোভি হুঁসিয়ার কর্ দেও, ইছ্ বাৎ ঔর কিসিকো মৎ কহনা। অর্থাৎ একটি নাপিত ডাক। সাবধান! এ কথা তুমি কাহাকেও বলিও না, আর নাপিতকেও সাবধান করিয়া দিও, যেন সে ইহা কাহারও নিকট না বলে। এ কথা যেন অন্য কোনো লোকের কানে না যায়।''

আর্দালি ''যো হুকুম্'' বলিয়া একজন নাপিত ডাকিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। নাপিত সাহেবের গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া দিয়া গেল। পরদিন গোঁফ-দাড়ি কামানো সাহেবকে এজলাসে দেখিয়া

অনেকেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। সাহেব বিচারে মন দিয়াছেন, সাক্ষিগণের এজাহার হইতেছে। ক্রমে এক দাড়ি-গোঁফ-কামান বাঙ্গালি ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের সাক্ষ্য দিবার পালা আসিল। তাঁহাকে বাঙ্গালি ও গোঁফ-দাড়ি কামান দেখিয়াই সাহেব হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"হাঁ হাঁ, হামি সব্ বুঝেছে টুমি লোগ্ কাঠার খাইচে, কেমন?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কথার কোন মর্ম্মই বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া কেবল ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। সাহেব হুকুম দিলেন—ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যেন 'টিফিনে'র (জল খাবার) সময়ে ঐ সাহেবের খাস্ কামরায় লইয়া যাওয়া হয়। তখন আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাক্ষ্য দেওয়া হইল না। টিফিন খাইয়াই সাহেব ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া লইয়া, আবার সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্য ত' কাঁদিয়াই খুন! সাহেব সান্ত্বনা দিয়া ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন—"উহাটে কি ডোষ আচে? আপনি কেন ভীট হচ্ছে? হামি ভি আপনি মাফিক কাঠার খাইচে, আপনি ভি কাঠার খাইচে, ডাড়ি কামাইচে, গোঁপ কামাইচে। আপনার ডেশে ঐ কাঠার সুখাড্য নহে, অট্যণ্ট কষ্টকর আচে। হামার ডেশে কোনো জিনিষ খাইটে এট কষ্টকর নহে। আপনি খবরডার কভি কাঠার খাইবে না।"

সাহেবেরই ন্যায় কাঁঠাল খাইয়া এ দেশের একজন লোককেও বিপাকে পড়িয়া গোঁফ ও দাড়ি কামাইতে হইয়াছে মনে করিয়া অর্থাৎ তাঁহারই মত ভুক্তভোগী একজন লোককে পাইয়াছেন মনে করিয়া সাহেব বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং উক্ত ভট্টাচার্য্যকে

পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলেন। ভট্টাচার্য্য হাসিবেন, কী কাঁদিবেন, তাহা ঠিক করিতে না করিতেই চাপরাশি তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল এবং আরও চারি ব্যক্তি মিলিয়া বখসিস বলিয়া ঐ পাঁচটি টাকার গুরুভার হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অব্যাহতি দিল।

উক্ত সাহেবের মত বিচার পৃথিবীতে অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্বে ১৯১৯ সালে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তিধর্ম প্রচার করিবার জন্য শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথায় বৈষ্ণববেষধারী এক ব্যক্তি শুনিতে পাইল যে, বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাহাদের দেশে আসিয়াছেন। সেই বৈষ্ণববেষধারী ব্যক্তি ইহা শুনিয়া শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইল। সে মনে করিয়াছিল যে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরও বুঝি উক্ত বৈষ্ণববেষধারী ব্যক্তিরই ন্যায় জড়রসে ডগমগ কোনো ব্যক্তিবিশেষ হইবেন। ইহা মনে করিয়া উক্ত ব্যক্তি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট গোপনে আলাপ করিয়া রস আস্বাদন করিবে—এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তৎসম্বন্ধে অবিশ্রান্তভাবে সম্বন্ধ-তত্ত্বজ্ঞানের কথাই বলিতেছিলেন। কিন্তু সেই বৈষ্ণববেষধারী ব্যক্তিটি কিছুতেই তত্ত্ব-কথায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সে সকল শ্রোতাকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে বলিয়াছিল—"মহাশয়, আপনাদের এখনও অনেক দেরী আছে। যে ব্যক্তি এ জগতে নিজে কখনও পারকীয় রস-ভোগ (অর্থাৎ পরদারগমনরূপ ব্যভিচার) না করিল, সে

কিরূপে রাধাকৃষ্ণ-লীলা বুঝিবে? যিনি যতই গোপন করুন না কেন, এই শরীর দ্বারা পারকীয় রস আস্বাদন না করিয়া কেহই মধুর রসিক ভক্ত হইতে পারেন না! আপনারা কেবল জ্ঞানমার্গের কথাই বলিতেছেন। আপনাদের চিত্ত তর্ক যুক্তিতে ভরপুর দেখিয়া প্রভু আপনাদিগকে এখনও মধুর রসের (?) ভজনে অধিকার দেন নাই (?)। আপনারা 'না' বলিলেই কি আমি শুনি? এই দেহের দ্বারা ঐ রসের আস্বাদনই যদি না করা গেল, তবে লোকে কেন মধুর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবে? আহা! অমন রসিক ঠাকুর গৌরাঙ্গের ধর্মই সহজ-ধর্ম; তাহাতে কোন বিচার নাই, তর্ক নাই, আছে কেবল রস! আপনার সঙ্গে আমাকে একটু একাকী থাকিতে দিন, আপনাকে আমি দেখাইয়া দিব—আপনি কতটুকু পারকীয় রসের আস্বাদ পাইয়াছেন! আপনি, দেখিতেছি খবরই রাখেন না যে, প্রকৃতি সঙ্গে না থাকিলে কখনও রাধা-কৃষ্ণের ভজন হয় না!''

আর এক সময় যখন প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পশ্চিমদেশে (যুক্তপ্রদেশে) প্রচারে গিয়াছিলেন, তখন লক্ষ্ণৌর সংবাদ-পত্রে মহাপুরুষের আগমন-সংবাদ পাঠ করিয়া একজন যুক্তপ্রদেশবাসী ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দেহে ভস্ম বা

জড়রস—এই জগতের ভোগ বা সুখ।

সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞান—ভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, তদ্‌বিষয়ের বিচার ও জ্ঞান।

পারকীয় রস—পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়-ঘটিত আনন্দ।

মাথায় জটা-জুট ও সম্মুখে লোটা-কম্বল প্রভৃতি সাধুর সাজসরঞ্জাম কিছুই নাই, তিনি পথের ধারে ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানমগ্নাবস্থায় বসিয়া থাকেন নাই, কোনো গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, গৃহের সম্মুখে মোটরগাড়ি রহিয়াছে, তিনি উৎকৃষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন, সম্মুখে টেবিল ও বিলাতি ধরণের নানাপ্রকার আসবাবপত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ আগন্তুক ভদ্রলোক মহাপুরুষকে সম্মুখে দেখিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; কারণ তিনি তাঁহার ভোগের চশমা দিয়াই মহাপুরুষকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন! যাঁহাদের জটা ও লোটাকম্বল আছে বা যাঁহারা পথের ধারে গাছের তলায় ভস্মমাখাদেহে থাকিতে পারেন, তাঁহারাই তাঁহার চশ্‌মায় দেখা সাধু ও মহাপুরুষ। ''বুজরুকি জানে যেই, তব সাধুজন সেই।''

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিতেন—সাধুকে দেখিতে হইলে কখনও নিজের চশমা দিয়া দেখিতে পারিবে না; **সাধুর বাণীর দ্বারাই সাধুকে দেখিতে হয়**। কান দিয়া সাধুকে দেখিতে হয়, চোখ দিয়া সাধুকে দেখা যায় না। যে নীল রঙের চশম্‌া পরিয়াছে, সে যেমন সমস্তই নীল দেখে; যে লাল রঙের চশমা পরিয়াছে, সে যেমন সমস্তই লাল দেখে; তেমন যাহারা স্ত্রীলোক অর্থ ও সম্মানের আশায় লুব্ধ, তাহারা তাহাদের চশমার দ্বারা সাধুকে

মধুর রস—শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী রাধিকা-প্রমুখ অপ্রাকৃত ব্রজগোপীগণ যে রসে কৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, আর গোপীগণ কান্তা, সেই সম্বন্ধে যে রস।

প্রকৃতি—স্ত্রী; নায়িকা।

ঐরূপই দর্শন করিয়া থাকে। কথায় আছে—"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ।" অর্থাৎ কামুকগণ সমস্ত জগৎকেই কামিনীময় বলিয়া দর্শন করে। মাৎসর্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ কিরূপে নিজের চশমা দিয়া সাধুগণকে দর্শন করে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য-চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন! *** অনেকগুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্মমূর্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিকগণের মধ্যে গণনা করেন! নির্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা-স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।"

—সজ্জনতোষণী ৮৯

যোষিৎসঙ্গ—স্ত্রীসঙ্গ।

রাত্রিতে সূর্য দেখা

এক সৌখীন ও খামখেয়ালী জমিদার অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে সূর্য দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। জমিদারের মোসাহেবগণ বলিলেন—"যখন আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহা পূর্ণ হইবে। পৃথিবীতে আমরা এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যাইব, যাহাতে ভবিষ্যতে সকল লোক তাহার অনুসরণ করিয়া আপনার যশঃ কীর্ত্তন করিতে পারে।" ইহা বলিয়া মোসাহেবদের মধ্যে একজন একটি প্রকাণ্ড লণ্ঠন লইয়া আকাশের দিকে ধরিয়া বলিলেন—"হুজুর, আপনি সূর্য দেখিতে পাইতেছেন কি?" তখন আর দুইজন মোসাহেব বলিলেন—"লণ্ঠনের সামান্য আলোকে সূর্য দেখা যাইবে না। দশকোটি মোমবাতির শক্তিযুক্ত বৈদ্যুতিক আলোক-সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হউক?"

জমিদারবাবুর ইচ্ছাক্রমে তাহাই হইল। ঐরূপ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা জমিদারবাবুর কতিপয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বন্ধু জমিদারবাবুকে রাত্রিকালে সূর্য দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও উপস্থিত বৈজ্ঞানিকগণের সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

এই সময় তথায় এক বিজ্ঞ ব্যক্তি জমিদারবাবুকে বলিলেন যে, পৃথিবীর সকল বৈদ্যুতিক আলোক একত্র করিয়াও তিনি কিছুতেই রাত্রিকালে সূর্য দেখিতে পারিবেন না। উহাতে কেবল শক্তি, অর্থ ও সময়ের ক্ষয় ও অপব্যয় হইবে। অতএব যদি সূর্য

দর্শন করিতে হয়, তবে তাঁহাকে অরুণোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। **সূর্যের রশ্মিদ্বারাই সূর্যের দর্শনলাভ হইবে**। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কৃত্রিম আলোকের দ্বারা সূর্য দর্শন করা যাইতে পারে না।

যুক্তির সাহয্যে জড়বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, মায়াবাদি প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় ভগবানের নিত্যসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ দর্শন ও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা বঞ্চিতই হন। যেরূপ রাত্রিকালে শত শত কৃত্রিম আলোকের দ্বারাও সূর্য দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ জীবের শত শত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও চেষ্টার দ্বারাও শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ দর্শন ঘটে না। যেরূপ সূর্যের আলোকেই সূর্যের দর্শন লাভ সম্ভব হয়, তদ্রূপ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাতেই তাঁহাদের

প্রত্নতাত্ত্বিক—প্রত্ন অর্থাৎ পুরাতন তথ্য, প্রমাণাদি লইয়া যাহারা আলোচনা করেন।

মায়াবাদী—ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীবরূপে প্রতীত হন, ইহা যাঁহারা বলেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম চিরকালই মায়ার অতীত। মায়া ভগবানের ছায়া-শক্তি। ভগবান মায়ার ঈশ্বর।

অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের অতীত।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—ভগবান জীবের ন্যায় রক্তমাংসের শরীর-বিশিষ্ট বা জন্ম-মরণশীল বস্তু নহেন। তিনি 'সৎ' অর্থাৎ নিত্য, 'চিৎ' অর্থাৎ পূর্ণচেতন ও পূর্ণ 'আনন্দময়' বস্তু।

মায়াধীশ—মায়ার ঈশ্বর বা প্রভু, মায়া যাঁহার অধীন।

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ—কৃষ্ণের তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত ও মায়া কি বস্তু, তাহা তিনি জানেন।

যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি হয়। লঘু হইয়া কখনও গুরুদেবকে মাপা যায় না। মায়াবদ্ধ জীব কখনও মায়াধীশ কৃষ্ণকে ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধু বৈষ্ণবকে মাপিয়া লইতে পারে না।

আম খাওয়ার নকল

এক ব্যবসায়ী কোম্পানীর বড় সাহেবের খুব বড় দাড়ি ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া আঁশওয়ালা দেশি মিষ্ট আম খাইয়া গেলেন এবং ছুটি লইয়া বিলাতে গিয়া স্ত্রী-পুত্র-পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনের নিকট আমের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন—পৃথিবীতে আমের মত সুন্দর ফল আর নাই, ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে ইত্যাদি। এইরূপ অপূর্ব ফলের কথা শুনিয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য সাহেবের পুত্র-পৌত্রগণের অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। ছুটি ফুরাইলে সাহেব পরিবারবর্গকে লইয়া ভারতবর্ষে পুনরায় ফিরিলেন।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে গৃহে দেশি মিষ্ট আমের প্রশংসা করায় সাহেবের পৌত্রগণ তাহা আস্বাদন করিবার জন্য পিতামহের নিকট জেদ করিলে সাহেব অনেক চিন্তা করিয়া তাঁহার খানসামাকে কিছু পক্ক তেঁতুল ও কিছু গুড় সাহেবের লম্বা দাড়ির মধ্যে ভাল করিয়া মাখিয়া দিতে বলিলেন। সাহেব তখন ছোটো ছোটো ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা কে কে আম

খাইবে, আমার নিকট আইস।'' উহারা উপস্থিত হইলে সাহেব সকলকে তাঁহার দাড়ি চুষিতে বলিলেন এবং দেশী মিষ্ট আম এইরূপ অম্ল-মধুর ও আঁশ-সংযুক্ত—ইহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা সাহেবের দাড়িতে আমের আস্বাদ পাইয়া ভারতবর্ষের মিষ্ট আম-সম্বন্ধে ধারণা করিয়া রাখিল।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড়জগতের অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা, অপ্রাকৃত বস্তু ভগবানের, তাঁহার ভক্তের অর্থাৎ বৈষ্ণবের ও ভগবদ্ধামের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ঐ কার্য ও অবস্থা, সাহেবের শিশু-নাতিদের দাড়ি-চোষার মত ব্যাপার বিশেষ। প্রাকৃত সহজিয়াগণের অপ্রাকৃত-লীলার আস্বাদনের চেষ্টাও এইরূপ। বৈষ্ণব-বিরোধিগণও এইরূপভাবেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-গণকে মাপিতে গিয়া বঞ্চিত হয়। জড় সাহিত্যিক, জড় ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও নির্বিশেষবাদী দার্শনিক, প্রভৃতি জাগতিক লোক যত বড়ই পণ্ডিত হউন না কেন; শুদ্ধ ভক্ত, শুদ্ধা ভক্তি বা প্রেম ও ভগবানের সম্বন্ধে যে ধারণা করেন, তাহাও এই প্রকার, অর্থাৎ তাঁহারা প্রকৃত বস্তু আস্বাদন বা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ❑

অভিজ্ঞান—নিশ্চিত-জ্ঞান বা বিশেষ-জ্ঞান।

ভগবদ্ধাম—ভগবানের ধাম অর্থাৎ ভগবান্ যে-স্থানে অবতীর্ণ হন লীলা করেন।

জড় সাহিত্যিক—যাহারা ভোগের কথা পূর্ণ সাহিত্যের চর্চা করেন।

নির্বিশেষবাদী দার্শনিক—দর্শন-শাস্ত্রের যে-সকল আলোচনাকারী ব্যক্তি ভক্ত ও ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, তাঁহার ভক্তি, ধাম লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। যাঁহারা তাঁহাদের নিত্যবিলাস স্বীকার করেন না; মায়াবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ।

দুই গুলিখোর

কোনো এক বিস্তৃত নদীর এক পারে একটি নৌকায় বসিয়া দুইজন গুলিখোর গুলি খাইবার উদ্দেশ্যে টিকা ধরাইবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে আগুন বা দিয়াশলাই কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র কয়েকটি টিকা ছিল। তাহারা দেখিতে পাইল, নদীর অপর পারে একটি নৌকার মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। গুলির নেশায় মশগুল উক্ত গুলিখোর দুইজনের মধ্যে এক ব্যক্তি নদীর এ পারে বসিয়াই ওপারের নৌকার প্রদীপের আগুনে টিকা ধরাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া একটি টিকা ধরিয়া রাখিল। টিকায় আগুন ধরিতেছে না দেখিয়া অন্য গুলিখোরটি প্রথম গুলিখোরকে ধমকাইয়া বলিল—''তুই কী করিতেছিস! এখনও টিকা ধরা'তে পারিলি না! এদিকে যে গুলি খাওয়ার মৌতাত চলিয়া যাইতেছে!'' এই বলিয়া দ্বিতীয় গুলিখোরটি প্রথম গুলিখোরের হাত হইতে টিকাটি জোর করিয়া কাড়িয়া লইল এবং প্রথম গুলিখোর অপেক্ষা আরও অধিক দূরে হাত বাড়াইয়া টিকাটি ধরিয়া বলিল—''দ্যাখ এইরূপে টিকা ধরা'তে হয়, এখনই দেখিতে পাইবি কেমন সুন্দর টিকা ধরেছে? তুই কেবল বাতাসে বড় হয়েছিস?''

দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় গুলিখোরটিও টিকায় আগুন ধরাইবার স্বপ্নই দেখিতে লাগিল; টিকায় আর আগুন ধরিল না। মাঝে প্রায় এক মাইল বিস্তৃত নদী; একজনের হাত হইতে আর এক জনের

হাত কয়েক ইঞ্চি বেশি বাড়াইয়া ধরিলেই কি ও-পারের আগুনের স্পর্শ পাওয়া যাইবে?

প্রথম গুলিখোরটি—ফলভোগী কর্ম্মীর আদর্শ এবং দ্বিতীয় গুলিখোরটি—ফলত্যাগী নির্বিশেষ জ্ঞানীর আদর্শ। তাহারা যেস্থানে বসিয়া আছে, তাহা এই বিচিত্র জড়জগৎ। আর যেস্থানে আগুন জ্বলিতেছে, তাহা পরব্যোম, এই উভয়ের মধ্যে বিস্তৃত কারণ-সমুদ্র বা 'বিরজা'র ব্যবধান। নেশা—বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে (কর্ম্মীর) নেশা; (জ্ঞানীর) অসুরবঞ্চনাময় মায়াবাদ, অগ্নি—(কর্ম্মীর পক্ষে) যাগ-যজ্ঞাদির অগ্নি, (জ্ঞানীর পক্ষে) ব্রহ্মলোকের কল্পনাময় জ্যোতিঃ এবং (ভক্তের পক্ষে)

ফলভোগী—কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য যাহারা কর্ম্ম করে।

ফলত্যাগী—জ্ঞানিগণ নিজেরা কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে না চাহিলেও ফল কৃষ্ণের ভোগেও প্রদান করে না। তাহারা পরমেশ্বরকে ইন্দ্রিয়হীন ক্লীব-জাতীয় বস্তু মনে করে।

পরব্যোম—বৈকুণ্ঠ ও গোলোক ধাম।

কারণ-সমুদ্র—বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক তাহার বাহিরে কারণ সমুদ্র অবস্থিত।

বিরজা—যাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে, এইরূপ নদী-বিশেষ। মধুপুষ্পিত বাক্য—বেদের যে সকল বাক্যে কর্ম্মের বহু ফলের কথা, বহু ভোগের কথা বর্ণিত আছে।

সপ্তজিহ্বা—কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে (১) চিত্তরূপ দর্পণের পরিমার্জ্জন, (২) সংসার-দাবানলের নির্বাপণ, (৩) মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোৎস্না-বিতরণ, (৪) পরাবিদ্যার সেবা লাভ, (৫) আনন্দসাগরের উদ্বেলন, (৬) পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন, (৭) অপ্রাকৃত রসে সকল আত্মার অবগাহন হয়। এই সপ্ত প্রকার কার্য বা শক্তিকেই নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞের অগ্নির জিহ্বা বলা হইয়াছে।

সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীমান-সংকীর্ত্তনাগ্নি। কর্ম্মী ও জ্ঞানী, মায়িক জগতের বিচার সম্বল করিয়াই মায়াতীত তত্ত্ববস্তু-লাভের অর্থাৎ সিদ্ধির বা মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। একমাত্র ভগবৎ সেবনোন্মুখী হইয়া মায়াতীত নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনরূপ অগ্নির সংস্পর্শ পাইলেই মায়াতীত নিত্যতত্ত্বের সন্ধান লাভ হয়।

কাঠুরিয়ার বুদ্ধি

এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনে যাইবার উদ্যোগ করিল। সুন্দরবনে বহু হিংস্র জন্তুর বাস; অতএব সেখানে বিনা অস্ত্রে গেলে প্রাণ-সংশয় হইতে পারে—ইহা কোনো এক প্রাচীন ব্যক্তি কাঠুরিয়াকে জানাইলেন। কিন্তু কাঠুরিয়া বলিল—"বনে যাইতে হইলে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাইতে হয়, আমি লোকের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিব; আমি কয়লার খনিতে কয়লার বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইবার মূর্খতা প্রদর্শন করিব না। বনে অনেক বড় বড় গাছ আছে, উহাদের যে-কোন একটির একটি শাখা ভাঙ্গিয়া শক্ত লাঠি করিয়া লইলেই ব্যাঘ্র, ভল্লুক কোথায় পলাইবে, তাহার ঠিক নাই। যখনই কোনো হিংস্র জন্তুকে আসিতে দেখিব, তখনই আমি একটা গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া উহাকে এমন ভয় দেখাইব যে হিংস্র জন্তু আর আমার ত্রিসীমানায়ও আসিবে না; বড় বড় গাছের ডাল ভাঙ্গিতে দেখিলেই উহারা ভয়ে দূরে পলাইবে।"

কাঠুরিয়া নিজকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তাহার এই সাধারণ জ্ঞানটি ছিল না যে, গাছের ডাল ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই যদি বাঘ আসিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া রক্ত পান করে, তখন তাঁহার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হইবে; তাহার লাঠিও সংগ্রহ করা হইবে না, বাঘও মারা হইবে না; নিজেকেই বাঘের হাতে প্রাণ হারাইতে হইবে। ঘটনাও তাহাই হইল। ঐ কাঠুরিয়া বনে প্রবেশ করিবার কয়েকদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, একটি ছোটো বাঘ কাঠুরিয়ার ঘাড় ভাঙ্গিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার রক্ত পান করিয়াছে। কাঠুরিয়া ঐ ব্যাঘ্রকে দেখিয়াই একটি সুবৃহৎ বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিতেছিল; কিন্তু শাখাটি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিবার পূর্বেই ঐ ব্যাঘ্রটি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে।

এদিকে এই ঘটনার কয়েকদিন পরে তথায় এক সাধু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে সেই বনে প্রবেশ করিলেন। সাধুর বাহ্য জ্ঞান নাই, সর্বদা হরিকীর্ত্তনে রত, ভগবানের প্রেমে বিভোর। কতিপয় ব্যক্তি কৌতুহল-পরবশ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সাধুকে না জানাইয়াই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে গমন করিলেন। সাধুর হৃদয়ে কোনোপ্রকার হিংসা-বৃত্তি নাই দেখিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র-জন্তুগুলিও সাধুর প্রতি কোনো হিংসা করিল না, বরং সাধু যখন বীণাযন্ত্র-যোগে উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিতেন, তখন অনেক হিংস্র জন্তু কান পাতিয়া তাহা শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিত। সাধুর হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রূর হিংস্রস্বভাব জন্তুগণেরও হিংসা-ভাব দূরীভূত হইল; ইহা দেখিয়া

ঐ সকল অস্ত্র-শস্ত্রধারী ভদ্রলোক বড়ই মুগ্ধ হইয়া ভাবিলেন—কাঠুরিয়ার প্রতিই বা হিংস্র জন্তুগুলি ঐরূপ ব্যবহার করিল কেন, তাহারাই বা অস্ত্র দ্বারা হিংস্র জন্তুর হিংসা নিবারণ করিতে পারে না কেন, আর সাধুই বা কিরূপে বিনা অস্ত্রে হিংস্র জন্তুদিগকে বশ করিতে সমর্থ হইলেন।

এই স্থানে অষ্টাঙ্গ-যোগীর সহিত কাঠুরিয়ার, কর্মী ও ভোগী জীবের সহিত অস্ত্র-শস্ত্রধারী ব্যক্তির, ভক্তের সহিত হরিকীর্ত্তন-কারী সাধুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। **অষ্টাঙ্গ-যোগী** মনে করেন যে, তিনি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিবেন; কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করিবার পূর্বেই, কাঠুরিয়ার উদাহরণে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিবার পূর্বেই, যদি অকস্মাৎ এক লম্ফে রিপুরূপ (কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যরূপ) ব্যাঘ্র আসিয়া ঘাড় মটকাইয়া রক্ত পান করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য বশতঃ পতন অবশ্যম্ভাবী। 'ইন্দ্রিয় জয় করিবার পরে মঙ্গল লাভ করিব—এরূপ বিচার কিন্তু ভক্তের নহে; আর কর্মীর ন্যায় 'অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করিব'—এরূপ বিচারও ভগবদ্ভক্তের নহে। ভগবদ্ভক্ত কৃত্রিমপন্থী নহেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে নিজ-চেষ্টায় রিপু বা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবার কল্পনা ও অহমিকাকে প্রশ্রয় দেন না। পূর্বে রিপু-দমন,

অষ্টাঙ্গ যোগের আটটি অঙ্গ—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধ্যান, (৭) ধারণা ও (৮) সমাধি। যে যোগী এই আটপ্রকার অঙ্গ বা সাধনের দ্বারা যোগ অভ্যাস করেন।

পরে আত্ম-মঙ্গল-লাভ—এরূপ ভ্রান্ত চেষ্টা তাঁহার নহে। ভগবদ্ভক্তিযাজনের সংগে-সংগেই অনায়াসে ও আনুসঙ্গিকভাবে তাঁহার রিপু-দমন হয়; উহার জন্য তাঁহাকে আর পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। তিনি রিপুর উচ্ছেদ-সাধনের জন্য ব্যস্ত নহেন; বরং রিপুগুলি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তাঁহার ভজনের সহায়তাই করিয়া থাকে; রিপু তখন বন্ধু হয়, তাহাদের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া পড়ে; 'কাম'—তখন অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে; 'ক্রোধ'—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্ত-দ্বেষীর প্রতি প্রযুক্ত হয়; 'লোভ'—সাধুসঙ্গে হরিকথাশ্রবণে নিযুক্ত হয়; 'মোহ'—ইষ্টদেব ভগবানের সেবা লাভ হইল না—এইরূপ কাতরতায় এবং 'মদ' বা মত্ততা—ভগবানের গুণগানে নিযুক্ত হয়। মাৎসর্য কখনও নির্ম্মৎসর সাধুগণের নিকট স্থান পায় না; কারণ তাঁহারা প্রত্যেক জীবের প্রতিই দয়াময়, কাহারও উৎকর্ষ-দর্শনে তাঁহারা অসহিষ্ণু হন না। অতএব একমাত্র ভগবৎপ্রীতির দ্বারাই সকল অনর্থ অতি সহজে নিবৃত্ত হয় এবং শত্রুকেও মিত্ররূপে পরিণত করিয়া স্ব-পর মঙ্গল বিধান করিতে পারা যায়।

এজন্য অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-কবি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা-তথা ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভংগ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সংগ ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ,—এই ত' কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যা'বে, মহানন্দ-সুখ পা'বে,
যাঁর হয় একান্ত ভজন ॥"

মাঝির স্বপ্ন

নদী-তীরের কাঁটার উপর দিয়া নৌকার গুণ টানিতে টানিতে এক মাঝির পায়ের তলা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল; কিন্তু নৌকার গুণ-টানা-কার্য ছাড়িয়া অন্য কোনো কার্যের চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তিও তাহার হইল না। মাঝিটি কল্পনা করিতে লাগিল যে, যদি ঐরূপ গুণ টানিতে টানিতে তাহার কোন দিন অনেক টাকা হয়, তাহা হইলে সে নদীর তীরের উপর লেপ বিছাইয়া গুণ টানিয়া চলিবে, তাহা হইলে তাহার পায়ে আর কাঁটা ফুটিবে না, বরং সুকোমল বস্তুর স্পর্শে গুণ-টানা-কার্য আরও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইবে।

ঐ মাঝির ন্যায় চিত্তবৃত্তি অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা পরমেশ্বরে মানব-ধর্মের (মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ দোষ-গুণ-সমূহ) আরোপ (Anthropomorphism) বা পরমেশ্বরে প্রাণীর ধর্ম (ইতর প্রাণীর স্বাভাবিক দোষ-গুণ-সমূহ) আরোপ (Zoomorphism) করে, তাহাদের বিচারও ঐ মাঝির ন্যায়। ধনীই যদি হওয়া যায়, তাহা হইলে আর গুণ-টানার আবশ্যকতা কী? লেপ বিছাইয়া গুণ-টানা যেরূপ মূর্খতা-মাত্র, জাগতিক অভাব ও হেয়তা-সমূহ কল্পনা-প্রভাবে বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে আরোপ করাও তদ্রূপ মূর্খতা। ইহা "To carry (burnt) coal (or ashes) to New-castle"—এই ন্যায়ের মত। যাঁহাকে 'পরমেশ্বর',

হেয়তা—দোষ, অসুবিধা, তুচ্ছতা।

New castle—ইংলণ্ডে 'নিউ ক্যাসল' নামক প্রসিদ্ধ কয়লার খনি ও বাণিজ্য-স্থান।

'পরব্রহ্ম' বা 'সর্বশক্তিমান্' বলা হয়; তিনি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে মৎস্য-কূর্ম-বরাহাদি যে সকল নিত্যবৈকুণ্ঠরূপ বা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামাদি অবতার জগতে প্রকাশ করেন, তাহাতে মানব, জন্তু বা প্রাকৃত কোনো বস্তুর ধর্ম আরোপ বা কল্পনা করাও 'লেপ বিছাইয়া গুণ টানিবার' কল্পনার ন্যায় মূর্খতা। যে-স্থানে পরব্রহ্মত্ব, তথায় আর ক্ষুদ্রত্ব, হেয়ত্ব বা জাগতিক অভাব নাই। যিনি সর্বশক্তিমান, তাঁহাতে কোনও শক্তিরই অভাব নাই।

নোঙ্গর তোল

নিশ্চিন্তপুরের জমিদার বীরেন্দ্রবিজয় চৌধুরী মহাশয় একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য একটি উৎকৃষ্ট নৌকা সুসজ্জিত করিয়া কলিকাতার শোভাবাজারের ঘাট হইতে শান্তিপুরে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। শীতের রাত্রি। বরযাত্রীগণ নৌকায় আরোহণ-পূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। বীরেন্দ্রবিজয় বাবু মাঝিকে বলিয়া দিলেন—"খুব তাড়াতাড়ি নৌকা চালাইবে—যেন আমরা বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে উপযুক্ত সময়ে শান্তিপুরে পৌঁছিতে পারি। তোমাকে এজন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

মাঝি পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে সারা-রাত্রি জাগিয়া হাল ধরিয়া থাকিল এবং তাহার আদেশে দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল। পরদিন যখন অরুণরাগে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মাঝি ও দাঁড়িদের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদ ও কোলাহল শুনিয়া বরযাত্রিগণের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বীরেন্দ্রবিজয় বাবু দেখিতে পাইলেন যে, যেখানকার নৌকা, সেখানেই রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি মাঝির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। মাঝি উত্তরে বলিল—"হুজুর, আমার কোনো দোষ নাই; আমি সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্তও নিদ্রা যাই নাই। সারা-রাত্রি হাল ধরিয়াছিলাম; আর আট জন মাঝি অক্লান্তভাবে সারা-রাত্রি দাঁড় টানিয়াছে, তথাপি যেখানকার নৌকা সেখানেই রহিয়াছে দেখিয়া আমিও বিস্ময়ান্বিত হইতেছি।" বরযাত্রিগণের মধ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখত'; তুমি নৌকার নোঙ্গর তুলিয়াছ কিনা?" বৃদ্ধের কথায় মাঝির চৈতন্য হইল। সে যে একটা মস্ত বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল। সে যে নোঙ্গর উঠাইতেই ভুল করিয়াছে, তাহা এতক্ষণ পরে ধরা পড়িল। এদিকে নির্দিষ্ট দিবসে শুভলগ্নে বিবাহের আর আশা নাই, বহু অর্থ নষ্ট হইল। কন্যাপক্ষ বহু লোকের নিকট নিতান্ত অপ্রস্তুত হইলেন। সমস্ত কার্যই লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গেল জানিয়া বরের পিতা অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন—তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই উপাখ্যানটির দ্বারা শিক্ষা দিতেন যে, জড়-জগতের প্রতি কোনোপ্রকার আসক্তি থাকিলে শত শত সাধন-ভজনের অভিনয় করিয়াও ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না।

জলের নীচে মাটির সহিত সংলগ্ন নোঙ্গর—পার্থিব-বিষয়ে আসক্তি। ঐ বোকা মাঝি—বিষয়ে আসক্ত গুরু-নামধারী অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। বরের পিতা ও দাঁড়িগণ—ঐরূপ বিষয়ী গুরুনাম-ধারীতে বিশ্বাসী শিষ্য-সম্প্রদায়। বিবাহ—ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-স্থাপন। শুভলগ্ন—সুদুর্লভ অথচ অনিত্য মানবজীবন। দাঁড়টানা—সাধন-ভজনের চেষ্টা।

জড়ভোগে আসক্ত গুরু-নামধারীর শিষ্য-সম্প্রদায় দেহে-গেহে আসক্তি বজায় রাখিয়া অর্থাৎ ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা করিয়া যে প্রবলভাবে সাধন-ভজনের অভিনয় করে, তাহাতে কোনও কালে ভগবানের নিত্য-প্রেম-সেবা-লাভরূপ প্রয়োজন-প্রাপ্তি ঘটে না; কেবল সুদুর্লভ ও অনিত্য মানব-জীবনে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। দেহের ও গেহের আরাম-প্রিয়তা জড়জগতের প্রতি আসক্তি—এই সকলই নোঙ্গর। এই নোঙ্গরকে তুলিতে হইবে।

গেহ—গৃহ

প্রেম-সেবা—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন।

প্রয়োজন—কৃষ্ণের সুখ-উৎপাদনই জীবের প্রয়োজন বা প্রাপ্য ফল।

আরাম-প্রিয়তা—শরীরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আসক্তি। আরামকেই ভাল লাগা।

গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এই নোঙ্গর উঠাইয়া তাঁহাদিগের অনুগত হইয়া ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভবনদী পার হইয়া শান্তিপুরে অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবার রাজ্যে যাইতে হইবে। দেহ ও গৃহের আরাম-প্রিয়তা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনও দিন মঙ্গল লাভ করা যাইবে না।

গীতার সংসার

কোনো সন্ন্যাসী গুরু তাঁহার এক উদাসীন শিষ্যকে একখানা গীতা প্রদান করিয়া সর্বক্ষণ গীতা পাঠ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। শিষ্যটি বিন্ধ্যগিরির একটি গহ্বরে অবস্থান করিয়া গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। গহ্বরস্থ একটি মূষিক-শিশু প্রতিদিন আসিয়া ঐ গীতার পাতাগুলি কাটিতে আরম্ভ করিল। সাধকটি মূষিক-শিশুর অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া উহার প্রতিকারের জন্য নিকটবর্তী গ্রাম হইতে একটি বিড়াল-শাবক লইয়া আসিলেন। বিড়াল-শিশুটিকে প্রতিপালন করিবার জন্য দুগ্ধ আবশ্যক হইল। কিন্তু কোথায় দুগ্ধ পাওয়া যাইবে, কে-ই বা প্রতিদিন দুগ্ধ প্রদান করিবে—ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার একটি গাভী সংগ্রহ করিবার বাসনা বলবতী হইল। ভগবদিচ্ছা-

ক্রমে এক সদাশয় ব্যক্তি সাধুকে একটি গাভী দান করিলেন। এখন গাভীটির রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা সন্ন্যাসীর হৃদয় অধিকার করিল। গাভীটি যাহাতে শীত-গ্রীষ্মে ও বর্ষাপাতে নিরাপদে থাকিতে পারে তজ্জন্য সন্ন্যাসী বহু পরিশ্রম করিয়া একটি গোশালা নির্মাণ করিলেন। অতঃপর গরুটিকে কে পালন করিবে, কেই-বা তাহাকে তৃণ-জল দিবে, নিজের সাধন-ভজনের ক্ষতি করিয়া গাভীটিকে প্রতিপালন করিতে গেলেও পরকাল নষ্ট হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া উক্ত সন্ন্যাসী একটি গোরক্ষক নিযুক্ত করিলেন। গোরক্ষকটি গাভীটির যত্ন করিতে লাগিল। গোরক্ষকটিকেই বা কে খাওয়াইবে ও তাহার কাজ-কর্মই বা কে দেখাশুনা করিবে, এই চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী মহাশয় অবশেষে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে সংসার বৃদ্ধি হইল; অনেক জমি-জমা, লোক জন বৃদ্ধি পাইল, বিশাল অট্টালিকা উঠিল। সন্ন্যাসী তখন গীতার অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন।

বহুকাল অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার গুরুদেব শিষ্যের সন্ধান করিতে করিতে সন্ন্যাসীর অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর বিষয়-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন প্রভৃতি দর্শন করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞসা করিলেন—''এ সব কী?'' শিষ্য তখন গুরুদেবের নিকট করজোড়ে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন—''প্রভো, ইহা আপনার সেই গীতার (?) সংসার।''

হরিভজনকারী যুক্ত-বৈরাগ্যের ছলনা করিয়া অভাবের মাত্রা

বৃদ্ধি করিবেন না। সাধক বদ্ধজীব ও সিদ্ধ মহাভাগবত—এক শ্রেণির নহেন। সাধক জীব সন্ন্যাসী হউন, আর গৃহস্থই হউন, ''যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ'' অর্থাৎ হরিভজনের অনুকূল যতটুকু বিষয় স্বীকার করা প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই করিবেন—কমও করিবেন না, বেশিও করিবেন না; কম ও বেশি—উভয়ের দ্বারাই পরমার্থ হইতে বিচ্যুতি ঘটে। যাঁহারা হরিভজনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়া মঠাদিতে বাস বা ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যদি হরিভজনের অনুকূল গ্রহণ করিবার ছলনায় নিজের মনকে ফাঁকি দিয়া বা কপটতা করিয়া আজ এক জিনিষের অভাব, কাল আর এক জিনিষের অভাব—এইরূপ ভাবে বিষয়ে বা দ্রবিণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদিগেরও 'গীতার সংসার' (?) হইয়া পড়িবে। অতএব সাধু সাবধান! হরিভজনের অনুকূল বস্তু সংগ্রহের ছলনায় যেন সাধক জীব মায়ার কবলে কবলিত না হন। বিষয় গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বদাই সতৃষ্ণ হইয়া রহিয়াছে। **সিদ্ধ সাধু বা মুক্ত মহাপুরুষ মহাভাগবতের শত শত উপদেশ শ্রবণ করিবার ছলনা করিয়াও দুষ্ট-দুর্দান্ত বহির্ম্মুখে মন বা রুচি কপট-**

যুক্তবৈরাগ্য—যতটুকু বৈরাগ্য ও যতটুকু গ্রহণ করা প্রয়োজন, হরিভজনের জন্য ততটুকু স্বীকারকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বল; যে বৈরাগ্য হরিসেবার সহিত যুক্ত। বদ্ধজীব—মায়াতে বদ্ধ জীব।

মহাভাগবত—সর্বোত্তম বৈষ্ণব, পরমহংস।

দ্রবিণে—বিত্ত, অর্থ।

বহির্মুখ—বিমুখ, বাহ্য-বিষয়ে আসক্ত।

কুটিনাটিকে আশ্রয় করিয়া হরি-ভজনের আনুকূল্য করিবার ছলে ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করে। শাস্ত্র-অধ্যয়ন বা বিদ্যাভাস করিবার ছলনায় আমরা জড়বিদ্যার মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়ি! সংসারে থাকিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক হরিভজন করিবার ছলনায় দেহের আরাম-প্রিয়তা ও স্ত্রী পুত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্ত হই। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সদগৃহস্থ বা বনবাসী হইয়া হরিভজন করিবার ছলনায় লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আশায় মুগ্ধ বা প্রভুত্ব-কামনায় অভিভূত হইয়া থাকি! এই বিপদে সর্বক্ষণ একমাত্র প্রকৃত সাধুসঙ্গে অবস্থান পূর্বক তাঁহাদিগের পূর্ণ আনুগত্যে ও তাঁহাদিগের নিকট স্ব-স্ব অনর্থগুলি অকপটে নিবেদন করিয়া তৎ-প্রতীকারের জন্য সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, প্রচেষ্টা ও তাঁহাদের কৃপা যাচ্ঞা করা একান্ত কর্তব্য।

কুটিনাটি—''এই ভাল, এই মন্দ'—মনের এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প। মানসিক কপটতা বিশেষ।

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আশা—জাগতিক বস্তু-লাভ, ধর্ম, অর্থ, কাম বা শান্তিলাভের কামনা; লোকে পূজা করুক, শ্রদ্ধা করুক এইরূপ ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, যশঃ বা প্রশংসা-প্রাপ্তির অভিলাষ।

পূর্ণ আনুগত্য—সম্পূর্ণ শরণাগতি।

দেলায় দে রাম

কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে পথে-ঘাটে এক প্রকার সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কাহারও নিকট ব্যক্তিগতভাবে কিছু যাজ্ঞা না করিয়া এইরূপ চিৎকার করিয়া থাকে—‘‘সের ভর্ আটা দেলায় দে রাম, পোয়া ভর্ ঘিউ দেলায় দে রাম! অর্থাৎ হে রাম! তুমি কাহারও দ্বারা এক সের আটা ও এক পোয়া ঘি আমাকে দেওয়াইয়া দাও।’’ ইহারা অযাচক বৃত্তি অর্থাৎ ‘কাহারও নিকট কিছু চাহিব না—এইরূপ সম্মানপ্রার্থী সন্ন্যাসীর অভিনয় করিয়া কোনো লোকের নিকট কিছু চাহিতেছে না বটে, কিন্তু রামকে দিয়া তাহাদের কাম চরিতার্থ করাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা রামের সেবা করিবার পরিবর্তে কপটতা করিয়া রামের দ্বারাই নিজ ভোগের সেবা করাইবার দুর্বুদ্ধি বা কাম।

একদিন এইরূপ এক পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী পাহাড়ের নিকট বনের ধারে হাঁটিতে হাঁটিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া চিৎকার করিতেছিলেন—‘‘ঘোড়া দেলায় দে রাম!’’ কিছুক্ষণ পরেই এক ‘বেওয়ারিশ্’ ঘোড়ী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাইয়া উক্ত সন্ন্যাসী সম্মুখস্থ একটি কুঞ্জ হইতে একটি লতা ছিঁড়িয়া তাহা দিয়া ঘোড়ার লাগাম প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। যেই সন্ন্যাসীজী তাহার উপরে চড়িতে যাইবেন, অমনি ঘোড়ীটা একটি শাবক প্রসব করিয়া ফেলিল। ঘোড়ীটির প্রতি সন্ন্যাসীর আসক্তি হওয়ায় তিনি ঘোড়ীটিকে ছাড়িয়া যাইতে

পারিলেন না। ঘোড়ীটিও শাবকটিকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। নিরুপায় হইয়া সন্ন্যাসী ঘোড়ীর শাবকটিকে নিজের ক্রোড়ে স্থাপন করিলে ঘোড়ী চলিতে লাগিল। তখন সন্ন্যাসীজী ঐ শাবকটিকে ক্রোড়ে লইয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন—‘‘এ ক্যা দে দিয়া রাম, হাম্ চড়নেকো ওয়াস্তে ঘোড়া মাঙা, লেকিন্ ঘোড়া মেরে পর চড়া, অর্থাৎ হে রাম! তুমি এ কি দিয়া দিলে? আমি চড়িবার জন্য ঘোড়া চাহিয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি ঘোড়াই আমার উপর চড়িল!’’

মায়াবদ্ধ লোকেরও এইরূপই দুর্দশা হইয়া থাকে। যাহারা মনে করে, সংসারে প্রবেশ করিয়া সুখে-শান্তিতে অবস্থান করিবে, অভাব, অসুবিধা দূর করিবে, তাহাদের সুখের পরিবর্তে অবশেষে অশান্তিই লাভ হয়; তখন তাহারা দুঃখে এ-কূল ও-কূল—দুকূল হারাইয়া বলিতে থাকে—‘‘হায় হায়! এ কী হইল!’’

‘‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।’’

কোনো একটি প্রাচীন গীতিতে আছে—

‘‘(মন!) কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি,
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাঁহারে ভাবিলি বিষে ॥

সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি,
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি, কাঠ চুষিলি,
কেমনে পাইবি মিঠ ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি,
শমন-কিঙ্কর সাপ।
'শীতল' বলিয়া আগুন পোহালি,
পাইলি বরজ-তাপ ॥
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি'
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি,
খাইলি আপন মাথা ॥''

বিমুখ জীব অভাব-অসুবিধা দূর করিবার ইচ্ছায় কিংবা মাতাপিতা-পরিজনের ভরণপোষণাদি কর্তব্য-পালনের ভাণ করিয়া স্ব-স্ব ভোগবাঞ্ছাদি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য মায়ার সংসারে প্রবেশ করিতে চাহে, রামের নিকট 'ঘোড়া' প্রার্থনা করে; কিন্তু তাহার আর ঘোড়ায় চড়া হয় না, অর্থাৎ মায়াকে ভোগ করা সম্ভব হয় না, ঘোড়ীর শাবককে অর্থাৎ মায়া হইতে প্রসূত সংসারের বোঝাকে বহন করিতে করিতেই জীবন কাটিয়া যায়। এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি রামের নিকট জাগতিক বস্তু প্রার্থনা না করিয়া বা ভোগের সংসারে প্রবেশ না করিয়া

প্রসূত—উৎপন্ন।

কৃষ্ণের সংসারে সাধু ও গুরুর সহিত অবস্থান-পূর্বক নিত্য-তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ স্ব-রচিত ''কল্যাণকল্পতরু''তে জীবের দুঃখে কাতর হইয়া গাহিয়াছেন—

''সংসার সংসার করি' মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি'—না ঘুচিল ভ্রম ॥
দেহ, গেহ, কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত ॥
হায়! হায়! নাহি ভাবি—অনিত্য এ সব।
জীবন-বিগতে কোথা রহিবে বৈভব?
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥''

নিত্যতত্ত্ব—যে বস্তু বা বিষয় চিরকাল থাকিবে, কোনও দিনই যাহা নষ্ট হইবে না।

কল্যাণকল্পতরু—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গীতি-গ্রন্থ।

ন্যাংটা পেঁচো

কোনো গ্রামে পঞ্চানন নামে এক বালক ছিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বালকেরা বাল্যকালে স্বভাবতঃই উলঙ্গ থাকে। বালক পঞ্চানন পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিয়াও উলঙ্গ থাকিতেই ভালবাসিত। এইজন্য প্রতিবেশীগণ পঞ্চাননকে ''ন্যাংটা পেঁচো'' বলিয়া ডাকিত। পঞ্চানন লেখাপড়ায় ও স্বভাব-চরিত্রে খুবই ভাল ছেলে ছিল। সে গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিল ও সকলের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল।

পঞ্চাননের পিতার সহিত কয়েকজন প্রতিবেশীর বিরোধ ছিল। কেবল তাহারাই পঞ্চাননের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইত ও বলিত—''আরে রাখিয়া দাও 'ন্যাংটা পেঁচোর' কথা, তাহার আবার লেখা-পড়া।'' কয়েক বৎসরের মধ্যেই পঞ্চানন বি-এল ও ডি-এল পাশ করিয়া উকিল হইল। যখন এই কথা পঞ্চাননের পিতার শত্রুদিগের কর্ণে পৌঁছিল, তখন তাহারা বলিল—''পেঁচো নকল করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে।''

পঞ্চানন বাবু কয়েক বৎসরের মধ্যেই জেলা-জজ হইলেন। তাঁহার যশোরাশি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন উক্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে হিংসানল চতুর্গুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা মাৎসর্যে অধীর হইয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিল—''আরে রাখিয়া দাও তোমার গাঁজাখুরি কথা? সেদিনকার ছোঁড়া ন্যাংটা পেঁচো, সে নাকি আবার জেলার জজ

সাহেব?'' যখন পঞ্চানন বাবু জজ-সাহেবের নাম উহাদিগকে কাগজ-কলমে দেখাইয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা বলিয়া উঠিল—''ন্যাংটা পেঁচো জজ হইলেও মাহিনা পায় না।''

ভগবানে শরণাগত বৈষ্ণবে সাধারণ মনুষ্য বা জাতি-বুদ্ধি, বা সদ্গুরুর নিকট **পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা**-মন্ত্র-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি জাতি-বুদ্ধি করিতে নাই—এই গল্পটির দ্বারা ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চানন বাবু বাল্যকালে উলঙ্গ ছিলেন বলিয়া তিনি যখন জজ হইয়াছেন, তখনও ''ন্যাংটা পেঁচো'' অর্থাৎ উলঙ্গ পঞ্চাননই রহিয়াছেন এবং পঞ্চাননের পিতার সহিত বা পঞ্চাননের সহিত কাহার সামাজিক বিরোধ আছে বলিয়া তাহাদের কথায় পঞ্চানন জজ হইতে পারিলেন না, বা জজ হইলেও মাহিনা পাইবেন না—এইরূপ বিচার মাৎসর্য হইতেই উদিত হয়। বৈষ্ণব নীচকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি নীচ নহেন। যেমন কোটি টাকার মধ্যে এক টাকাও আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবতার মধ্যে ব্রাহ্মণতাও আছে। সুতরাং বৈষ্ণবকে 'অব্রাহ্মণ' বলা অযৌক্তিক ও অপরাধ।

উত্তম অধিকারী বৈষ্ণবই পরমহংস। যাঁহারা সেইরূপ পরমহংস বৈষ্ণবের দাসের অভিমান করেন, তাঁহারাই **দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম** স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা—পঞ্চরাত্র সাত্বত-শাস্ত্র-বিশেষ; তাহার শাসন অনুসারে যে দীক্ষা তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকার—(১) বৈদিক, (২) পৌরাণিক ও (৩) পাঞ্চরাত্রিক। সদ্গুরুর নিকট হইতে পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির পূর্বের জাতি বিচার করিলে অপরাধ হয়।

দৈব-বর্ণাশ্রম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি প্রকার বর্ণ এবং

আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া আত্মম্ভরিতা করেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে পরমহংসের—বৈষ্ণব দাস বলিয়াই বিচার করেন। ইঁহারা যদি বৈষ্ণবের চরণে শরণাগত হইবার পূর্বে শূদ্র, অন্ত্যজ বা সামাজিক ব্রাহ্মণাদি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগকে পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া শূদ্র, **অন্ত্যজ** বা **লৌকিক** ব্রাহ্মণাদি বলা বা পরিচয় দেওয়া অন্যায় ও অপরাধজনক। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-মন্ত্র-লাভের পর আচার্য পিতা ও গায়ত্রী মাতার নিকট হইতে যাঁহার দ্বিতীয় জন্ম হয়, তাহাকে '**পারমার্থিক** (সামাজিক নহে) ব্রাহ্মণ' বলা হয়।

এই সকল পারমার্থিক ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ হরিসেবার জন্য যাঁহারা **দ্বিজত্ব** লাভ করিয়াছেন) শাস্ত্রের বিধান-অনুসারে উপবীত মালাতিলকাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ দীক্ষার দ্বারা দ্বিজ

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি প্রকার আশ্রম। যখন এই সকল বর্ণ ও আশ্রমে একমাত্র বিষ্ণুর সেবা হয়, তখনই তাহাকে দৈব-বর্ণাশ্রম বলে, আর যখন কোন ভোগ বা ত্যাগের কার্য হয়, তখন তাহা অদৈব-বর্ণাশ্রম। স্মার্তগণ ও মায়াবাদী ব্যক্তিগণ অদৈব-বর্ণাশ্রমী; আর শুদ্ধভক্ত দৈব-বর্ণাশ্রমী। যিনি শুদ্ধভক্তগণের গুরুদেব, তিনি পরমহংস। তিনি বর্ণ ও আশ্রমের অতীত।

অন্ত্যজ—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের বহির্ভূত।

লৌকিক—ব্যবহারক।

পারমার্থিক—পরমার্থ (পরম-শ্রেষ্ঠ; অর্থ—প্রয়োজন) বা ভক্তিসম্বন্ধীয়। উপবীত—পৈতা।

দ্বিজত্ব—একবার মাতার গর্ভ হইতে সাধারণ জন্ম, আর একবার দীক্ষার দ্বারা পারমার্থিক জন্ম।

হইলেও তাঁহাদিগকে 'শূদ্র' বা কোনো জাতি বিশেষই বলা হইবে, তাঁহারা দ্বিজত্ব লাভ করিলেও উপবীতাদি ধারণ করিতে পারিবেন না, গায়ত্রী জপ বা প্রণব উচ্চারণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের বিচার জজ সাহেব পঞ্চানন বাবুকে ''ন্যাংটা পেঁচো' বলার ন্যায়। অথবা ''ন্যাংটা পেঁচো'' জজ হইয়া থাকিলেও মাহিনা পাইবে না—এইরূপ মাৎসর্য্যপূর্ণ চিত্তবৃত্তির ন্যায়ই জানিতে হইবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই জাতীয় এক 'নগ্ন-মাতৃক-ন্যায়ে'র কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিতে সকল নিত্যকল্যাণার্থীকেই নিষেধ করিয়াছেন। অতি বাল্যকালে প্রত্যেক বালিকাই নগ্না থাকে; কিন্তু সেই বালিকাই যখন আবার সন্তানের জননী হন, তখন সন্তান যদি লোকের কথায় জননীর পূর্ব-ইতিহাস স্মরণ করিয়া গর্ভধারিণীকে 'নগ্না' বলে, দীক্ষা বা শরণাগতির পূর্বের ইতিহাস স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবকে পূর্বের বিচারে দর্শন ততোঽধিক অপরাধ ও পাষণ্ডতা।

ট্রেনের যাত্রী

একদিন কতকগুলি যাত্রী ট্রেনে চড়িয়া শিয়ালদহ হইতে কৃষ্ণনগর যাইতেছিল। প্রত্যেকেই সমান মূল্য দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়াছে; সুতরাং সকলেরই কৃষ্ণনগর যাইবার সমান যোগ্যতা ও অধিকার রহিয়াছে। কতকগুলি যাত্রী পূর্ব হইতেই গাড়িতে আসিয়া কম্বল বিছাইয়া রাখিয়াছিল, কেহ কেহ বা বেঞ্চের উপরে লম্বা হইয়া পড়িয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিল; সকলেই যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া গাড়িতে আর কাহাকেও উঠিতে দিবে না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময় কতকগুলি নূতন যাত্রী আসিয়া গাড়িতে উঠিবার চেষ্টা করিল। পূর্ববর্তী যাত্রীগণ "এ গাড়িতে স্থান হইবে না, অন্য গাড়ি দেখ। এখানে অনেক লোক হইয়াছে, এই সকল ভদ্রলোকের মধ্যে তোমরা কোথায় বসিবে"—প্রভৃতি বলিয়া সেই যাত্রীগণকে হাঁকাইয়া দিল। কিন্তু পরবর্তী যাত্রীগণের মধ্যে কয়েকজন চতুর ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি জোর করিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল। পূর্ববর্তী যাত্রীগণের বাধাপ্রদান-সত্ত্বেও কোনো প্রকারে স্থান করিয়া লইল।

ট্রেন যখন নৈহাটী পৌঁছিল, তখন আবার কতকগুলি কৃষ্ণনগরের যাত্রী ট্রেনে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে যে-সকল যাত্রী বাধা পাইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাই পূর্বের আরূঢ় ব্যক্তিগণের সহিত একযোগে নৈহাটি স্টেশনের যাত্রীগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। তাহা সত্ত্বেও নৈহাটি স্টেশনের যাত্রিগণ কোনো প্রকারে ট্রেনে স্থান করিয়া লইল। ট্রেন

আবার রাণাঘাট পৌঁছিলে ইহারাই অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত একযোগে রানাঘাটের যাত্রিগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল।

বর্তমান গতানুগতিক তথাকথিত বর্ণাশ্রমের বিচারও ঠিক ট্রেনের যাত্রিগণের মত। যিনি একবার কোনোপ্রকার কোনো উচ্চ বর্ণে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, তিনি নিজেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সেই বর্ণের প্রাকোষ্ঠের মালিক মনে করিয়া অপর সমযোগ্যতা সম্পন্ন বা অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকেও সেই বর্ণে প্রবেশে প্রবল বাধা প্রদান করেন। যদি ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি কোনোপ্রকারে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনিও আবার সেই দলে মিশিয়া অন্য যোগ্য ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করেন। এইরূপ **গতানুগতিক** বর্ণাশ্রমের পদ্ধতি আদৌ **সনাতন** বর্ণাশ্রমের বিচার-সম্মত নহে; বস্তুতঃ বৃত্তের বা স্বভাবের যোগ্যতার উপরই বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"যস্য যল্লক্ষণাং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বলা হইয়াছে। সেই সেই লক্ষণ যাহাতে দেখা যাইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না।

গতানুগতিক—প্রচলিত প্রথার অনুবর্তী।
সনাতন—নিত্য।

চলন্ত ট্রেনের আরোহী

চলন্ত ট্রেনের অজ্ঞ আরোহী দূরে অবস্থিত গ্রাম ও বন দেখিয়া মনে করে যে, ঐ গ্রাম ও বনগুলি দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছে আর সে এক স্থানেই স্থির হইয়া বসিয়া আছে। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিই যে দ্রুতবেগে স্থানান্তরে নীত হইতেছে, গ্রাম ও বনগুলিই যে স্থির আছে, ইহা তাহার ন্যায় অজ্ঞ আরোহী বুঝিতে পারে না।

পৃথিবীর অজ্ঞ সাধারণ লোক ও হরিভক্তিহীন ব্যক্তিগণ মনে করে যে তাহারাই ঠিক আছে, আর ভগবানের সেবকগণই ভুল পথে চলিয়াছে! অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধুর নানাপ্রকার ভ্রম দেখাইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে ভক্তগণের চেষ্টা জগতের প্রচলিত রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। দেহ, গৃহ ও জাগতিক কর্ত্তব্য-পালনে ভক্তের উদাসীনতা; মাতা-পিতা, ভাই, বন্ধু, দেশ, সমাজ, দুঃখী, দরিদ্রের সেবা (?) করিবার পরিবর্ত্তে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা; গুরু-গৃহ বা কৃষ্ণের সংসারের প্রতি আসক্তি; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রিয় আচরণ; বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দ্বারা শ্রীহরিনাম প্রচারের আনুকূল্য প্রভৃতি কার্য-সমূহকে সাধারণ রীতি-নীতির বিপরীত, এমনকি, বিষয়ীর ন্যায় কার্য বলিয়াই সাধারণের ভ্রম হয়। তাহারা মনে করে, ভগবদ্ভক্তগণ যখন অট্টালিকায় বাস করেন, মাধুকরী ভিক্ষা করেন, যানে আরোহণ করেন, প্রসাদ সেবন করেন, তখন তাঁহারাও জাগতিক ব্যক্তিগণের ন্যায়ই বিষয়ী ও ভোগী! ইহাই চলন্ত ট্রেনের আরোহীর দূরের গ্রাম ও বনকে 'চলন্ত' মনে

করিবার ন্যায় ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুতঃ ভগবানের ভক্ত সকল বস্তুর দ্বারাই ভগবানের সেবা করিয়া অর্থাৎ ভগবানের নাম-গুণ-প্রচারের সহায়তা করিয়া, সেই সকল বস্তুর প্রকৃত সদ্ব্যবহার করেন। ভগবানের সেবক কোনো বস্তুই নিজে ভোগ বা ত্যাগ করেন না। ভোগ ও ত্যাগ কোনোটির মধ্যেই মঙ্গল নাই। কেবল ত্যাগ করিলেও বস্তুর সদ্ব্যবহার বা সার্থকতা হয় না, আর ভোগের চেষ্টা করিলেও উহাতে বদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। এ জগতে 'নাম'-রূপে কৃষ্ণের অবতার। তাঁহার সেই নামপ্রচারের, বাণী-প্রচারের আনুকূল্যে সমস্ত বস্তু নিয়োগ করা, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত আত্মা নিয়োগ করাই নিজের মঙ্গল ও বিশ্ব মঙ্গলের কার্য অতএব ভগবানের শুদ্ধভক্তগণ বিষয়ীর ন্যায় যে-সকল কার্য করিয়া থাকেন, সাধারণ লোক চলন্ত ট্রেনের অজ্ঞ আরোহীর ন্যায় উহাকে অন্যরূপে দর্শন করিলেও তাঁহাদের সেই ভুবন মঙ্গলময় কার্য ভগবানের সন্তোষ বিধান করে।

এই 'চলন্ত ট্রেনের আরোহী'র দৃষ্টান্তের সঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অতি প্রাচীনকালে জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া সূর্যকে যে গতিশীল বিচার করিতেন, সেই দৃষ্টান্তটিও উল্লেখ করিয়াছেন। 'পৃথিবী স্থির ও সূর্য গতিশীল'—এই ভ্রান্ত ধারণা পরে বিদূরিত হয় এবং 'পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে'—এই সত্য আবিষ্কৃত হয়। যাহারা বিজ্ঞানের এই সত্য স্বীকার না করিয়া, বাহ্য-চক্ষে সূর্যের প্রাত্যহিক উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করিয়া সূর্যকেই গতিশীল ও পৃথিবীকে স্থির মনে করে, তাহারা সংখ্যায়

গরিষ্ঠ হইলেও ভ্রান্ত। ভক্ত-বৈজ্ঞানিকগণের সেবা-বিজ্ঞানের সত্যধারণা করিতে না পারিয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনসাধারণ যে শুদ্ধ ভক্তগণের কার্যকে বিষয়-ভোগ বলিয়া মনে করে, তাহা কখনই প্রকৃত সত্য নহে। প্রকৃত সত্য এই—ভগবানের সেবক ভগবানের অকপট ও অহৈতুকী সেবার জন্য যাহা করেন, তাহাই ঠিক।

ঐ চোর

এক গ্রামে চোরের বড়ই উৎপাত হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও চোর ধরিতে পারিল না। গৃহস্থ সজাগ হইলেই চোর পলায়ন করে, আর গৃহস্থের চিৎকারে গ্রামের লোকেরা আসিয়া অনেক করিয়াও চোরের কোনো নিদর্শন পায় না। তখন গ্রামের এক প্রধান ব্যক্তি, যাহার যাহার বাড়িতে চুরি হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে পৃথগ্‌ভাবে ডাকাইয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশেষ অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, একটি লোককে প্রত্যেক স্থানেই উপস্থিত থাকিয়া চোরের সন্ধানে ব্যস্ত দেখা যাইত। ইহাতে উক্ত গ্রামের মোড়ল ব্যক্তিটির মনে কিছু সন্দেহ জাগিল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রামের চৌকিদারকে সেই লোকটির বাড়ির নিকট থাকিয়া রাত্রি

১২ টার পর হইতে প্রত্যহ তাহার গতি-বিধি লক্ষ্য করিতে বলিলেন এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া চৌকিদার তাহার কর্তব্য পালন করে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে থাকিলেন।

একদিন রাত্রিতে চৌকিদার দেখিতে পাইল, উক্ত লোকটি রাত্রি প্রায় ২টার সময় একটি সিঁধকাঠি চাদরের ভিতর লুকাইয়া বাহির হইতেছে। চৌকিদার দূর হইতে ঐ লোকটির অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে, ঐ লোকটি একটি গৃহের প্রাচীরে সিঁধকাটি দিয়া ধীরে ধীরে ছিদ্র করিতেছে। চৌকিদার নিজেকে লুকাইয়া রাখিল—এমন জায়গায় দাঁড়াইল, যেন সে সিঁধকাটি ও গৃহের দরজা—দুইটিই লক্ষ্য করিতে পারে। কিছুক্ষণ পরই বাড়ির মধ্য হইতে 'চোর' 'চোর' বলিয়া চিৎকার আরম্ভ হইল। চৌকিদার দূর হইতে দেখিতে পাইল, ঐ লোকটি চুরি করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া নিকটবর্তী এক জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ততক্ষণে গৃহস্বামী আলোক জ্বালিয়া গ্রামবাসিগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। চোরটি সেই অবসরে জঙ্গলের অন্যদিক হইতে পথে আসিয়া দেখিল, বহু লোক একত্রিত হইয়াছে। সেও তখন 'কী হইয়াছে?' 'কী হইয়াছে?' বলিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তৎপর তাহাদের সহিত 'চোর' 'চোর' বলিয়া চারি দিকে ছুটাছুটি ও চোরের অনুসন্ধান করিবার অভিনয় করিতে লাগিল। পথে চৌকিদারকে দেখিয়া তাহাকেই ধরিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—'চোর ধরিয়াছি, চোর ধরিয়াছি।' তাহার চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য লোকেরাও আসিল এবং চৌকিদারকে

দেখিয়া তাহাকেই 'চোর' সাব্যস্ত করিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল; এমন কি, সেই চৌকিদারকে প্রহার করিতেও উদ্যত হইল। এমন সময় গ্রামের সেই মোড়লটি উপস্থিত হইয়া সকলকে নিবারণ করিলেন এবং চৌকিদারকে নির্জন ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন। পথে আরও চারি জনের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে তদন্তসময় ঐ লোকটির (অর্থাৎ যে প্রকৃত চুরি করিয়াছে, সেই ব্যক্তিটির) মুখেরভাব লক্ষ্য করিতে বলিলেন। পরে সকলকে লইয়া চৌকিদারের প্রদর্শিত জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন সেই লোকটি কেবল বলিতে লাগিল—"আপনারা কেন এতটা পাগল হইয়াছেন? অন্ধকার জঙ্গলে চোরের অনুসন্ধান করিতে যাইতেছেন? ওখানে সাপের বড় ভয় আছে, ওখানে চোর কখনও লুকাইয়া থাকিতে পারে না।"

লোকটির এই কথা সত্ত্বেও যখন সকলে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সেই লোকটি (চোরটি) ক্রমে ক্রমে পশ্চাদগামী হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। পরে গৃহস্থের যে অলঙ্কারের বাক্সটি এ লোকটি চুরি করিয়াছিল, তাহা জঙ্গল হইতে আবিষ্কৃত হইল এবং উহার সঙ্গে সিঁধকাঠিটিও পাওয়া গেল। ইহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ ঐ লোকটিই যে চুরি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল এবং ঐ লোকটিকে পলাইতে দেখিয়া 'ঐ চোর যায়' 'ঐ চোর যায়', বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। চোরটিও 'ঐ চোর যায়', 'ঐ চোর যায়' বলিয়া

চিৎকার করিতে করিতে পথে ভাল মানুষ যাহাকে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই বিভ্রান্ত করিয়া সরিয়া পড়িল।

সংসারে এই জাতীয় ব্যক্তির অভাব নাই। যাহারা সমাজের চৌকিদার অর্থাৎ রক্ষক, যাহারা সমাজের প্রকৃত নিঃস্বার্থ-হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই সকল মহাপুরুষকে হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ প্রকৃত চোরের ন্যায় 'ঐ চোর' বলিয়া লোক-চক্ষে হেয় ও ঘৃণ্যরূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্যস্ত! বেদ, গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, এই বিশ্ব ভগবানের সম্পত্তি, ভগবানই সমস্ত বস্তুর মালিক, তাঁহার বস্তু তাঁহার সেবায় অর্থাৎ তাঁহার নামগুণ-প্রচারে যাহারা নিযুক্ত করিয়া বিশ্বের মঙ্গল বিধান না করে, তাহারাই ভগবানের দ্রব্য আত্মসাৎ করে; অতএব তাহারাই চোর। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি যাঁহারা ভগবানের কথা প্রচার করেন, জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করেন, তাঁহাদিগকেই অকর্মণ্য, অলস ও সমাজের বিত্তাপহারক বলিয়া দেখাইয়া দেয়। ইহা চোরের সাধুকে, 'ঐ চোর যায়' বলিয়া চিৎকার করিয়া দেখাইয়া দিবার ন্যায় অসৎ প্রবৃত্তিবিশেষ। কলির ধারাই এই যে, চোর সাধুকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেয়। কবি তুলসীদাস অনেকদিন পূর্বে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—

"চোরকো ছোড়ে, সাধ্‌কো বাঁধে,
পথিক্‌কো লাগাও এ ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা
দুঃখ্‌ লাগে আওর হাসি ॥"

যাহারা **ধর্ম-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী** তাহারা অপস্বার্থহীন হরিনাম-প্রচারকারী প্রকৃত সাধুগণের হরিনাম-প্রচারের আনুকূল্য-স্বরূপ **মাধুকরী ভিক্ষাকেও** ব্যবসায়ীর **অবৈধ** অর্থ-পিপাসার সহিত সমান বলিয়া লোকের নিকট প্রতিপাদন করিতে চাহে! তাহারা অনেক সময় বলিয়া থাকে যে—সাধু-সন্ন্যাসীরও যখন অর্থের প্রয়োজন, তখন সংসারী লোকের আর দোষ কী? বস্তুতঃ ইহা চৌকিদারকে 'চোর' প্রতিপাদন করিবার ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশেষ। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য—হরিনাম-প্রচারের আনুকূল্যের জন্য সাধুগণ যে অর্থাদি সংগ্রহ করেন, তাহা ধর্ম-ব্যবসায়ীর ন্যায় স্ত্রী-পুত্র-ভরণপোষণের, অবৈধ লাম্পট্যের প্রশয় দানের, নিজের কোনো সুখসুবিধার বা ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশ্যে নহে। প্রকৃত সাধুগণ যে অর্থাদি সংগ্রহ করেন, উহার দ্বারাই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার হয়; কেন না, ঐ

ধর্ম-ব্যবসায়ী—যাহারা ধর্ম লইয়া ব্যবসায় করে।

মন্ত্র-ব্যবসায়ী—যাহারা মন্ত্র দান (?) করিয়া অর্থাদি গ্রহণ করে এবং তদ্দ্বারা নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করে।

ভাগবত-ব্যবসায়ী—যাহারা ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা বা কথকতা করিয়া অর্থ বা সম্মান সংগ্রহ করে।

বিগ্রহ-ব্যবসায়ী—যাহারা ঠাকুর দেখাইয়া টাকা রোজগার করে।

মাধুকরী ভিক্ষা—মধুকর বা ভ্রমর যেরূপ বহু পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ ভক্তগণ কোনও এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে ভিক্ষা বা বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের সেবা করেন।

অবৈধ—যাহা বিধি বা শাস্ত্র নিয়মের অনুমোদিত নহে।

অর্থ যিনি অর্থের মূল মালিক, সেই লক্ষ্মীপতির নাম-গুণ-কীর্তন-প্রচার জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ নিত্য কল্যাণ, ভগবদ্-বহির্মুখ, বদ্ধ, তপ্ত জীবজগতের বা জীব সমাজের নিত্য-মঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। যাহারা লক্ষ্মীপতির অর্থ আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই সমাজের চৌকিদার সাধুগণকে 'ঐ চোর' 'ঐ চোর' বলিয়া মিথ্যা তুমুল কোলাহল তুলিয়া **গণগড্ডলিকাকে** বঞ্চনা করে। মাৎসর্যপরায়ণ কামুক ও নির্বিশেষবাদিগণ প্রকৃত সাধুকে ''লোভী'' বলিয়া নিজেদের অসৎ চরিত্রকে গোপন করিবার চেষ্টা করে।

চার আনার ভাব*

কুষ্টিয়া-সহরের কোনো পল্লীতে এক হরিসভা ছিল। কোনো কারণ-বশতঃ ঐ সভার সভ্যগণের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং তাহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তখন দুই দল শহরে দুইটি হরিসভা স্থাপন করে। একদিন কোনো পর্বোপলক্ষে

গণগড্ডলিকাকা—যে লোক-সমাজ অন্ধভাবে অপরের দেখাদেখি কার্য করিয়া থাকে।

* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯১৯ সালে কুষ্টিয়া শহরে প্রচারকালে এই সত্য ঘটনাটি স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলেন।

প্রথম সভার সভ্যগণ এক গায়ককে হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য ডাকিয়া আনিল। কীর্ত্তন করিতে করিতে গায়কটির কৃত্রিম ভাবের উদয় হইল। সে প্রায় একঘণ্টাকাল কৃত্রিমভাবে মূর্চ্ছিত থাকিয়া সর্বসাধারণকে তার কৃত্রিমভাব দেখাইয়া ''পরম ভক্ত'' বলিয়া সম্মান লাভ করিল। জনসাধারণের নিকট প্রথম হরিসভার (?) এত সম্মান হইয়াছে দেখিয়া উহার বিরোধী সভার সভ্যগণের হিংসার উদয় হইল। তখন তাহারা পরস্পর বলিতে থাকিল— ''আমরা উহাদের হরিসভার (?) গায়ক অপেক্ষা আরো বেশিক্ষণ ভাব-কেলি দেখাইতে পারে, এরূপ একজন গায়ক আনিয়া কীর্ত্তন করাইব।'' এই বলিয়া অন্য গ্রাম হইতে চারি আনার গাঁজা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহারা একজন ভেকধারী স্থূলকায় ভাবুক গায়ককে লইয়া আসিল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার পূর্বেই দলপতি মহাশয় গায়কটিকে বলিয়া দিলেন—''উহাদের কীর্ত্তনীয়া অপেক্ষা আপনাকে আরো দুইঘণ্টা বেশি ভাব দেখাইতে হইবে। বেশি ভাব দেখাইতে পারিলে আপনার বকশিশ সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করা যাইবে।''

এই কথা শুনিয়া গায়কটি পরমোৎসাহে নৃত্য-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। যিনি (করতালি) বাজিতে না বাজিতেই অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি কৃত্রিমভাব প্রকাশ করিতে থাকিল এবং পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই মূর্চ্ছিতের ন্যায় দেখাইয়া বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। রৌদ্রের তাপ বেশিক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেই ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়ার কল্পিত মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন সে ঘর্মাক্ত-

কলেবরে দলপতির নিকট গিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। দলপতি মহাশয় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া বিরক্তি-সহকারে বলিলেন— ''আপনাকে যাহার জন্য আনা হইল, তাহার ত' কিছুই করিলেন না!—আমাদের মুখে চুন-কালি পড়িল।'' ভেকধারী মহাশয় তখন বলিয়া উঠিল—''দেখুন, 'চার আনার ভাব' আর কতক্ষণ থাকে?''

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত গল্পটি বলিয়া কৃত্রিম ভাবুকদিগের কপটতা ও 'লোক-দেখান' পাল্লা-দেওয়া ভক্তির (?) নামে ভণ্ডামির কথা জানাইয়া সাধক জীবকে সতর্ক করিতেন। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি লোক দেখাইবার জিনিস নহে। যাঁহাদের বহু ভাগ্য-ফলে অনর্থ-নিবৃত্তির পর ভগবানে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও তৎপরে স্থায়ী ভাব-ভক্তির উদয় হয়, তাঁহারা কখনও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক হইয়া লোকরঞ্জনে ব্রতী হন না। প্রকৃত ভাব-ভক্তগণের হৃদয় কৃষ্ণের নাম-গুণ-শ্রবণে, কীর্ত্তনে বা স্মরণে বিগলিত হইলে যদি তাঁহাদের বাহ্য দেহে সাত্ত্বিক বিকারাদিও প্রকাশিত হয়, তথাপি তাঁহারা নিজ-ভাব গোপন করেন। শ্রীল মহাপ্রভুও বহিরঙ্গ বা বিজাতীয় লোক দেখিলে নিজ-ভাব গোপন করিতেন। এই গল্পটির প্রসঙ্গে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই গানটিও কীর্ত্তন করিতেন—

''কি আর বলিব তোরে মন?
মুখে বল 'প্রেম, প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিত রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ-অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি,'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন ॥
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা-মাত্র, হও আগে যোগ্য-পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব বা বিকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভেদ, (৫) কম্প, (৬) বৈবর্ণ, (৭) পুলকাশ্রু ও (৮) প্রলয়। এই সকল অপ্রাকৃত ভাবের বিকার প্রকৃত প্রেমিক ভক্তগণের দেহে দৃষ্ট হয়।

কৈতব—কপটতা।

মৎসরাপন্ন—পরশ্রীকাতরতাযুক্ত বা অপরের সম্মান দেখিয়া যাহার হিংসা হয়।

তুমি ত' করিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়? ॥''

—কল্যাণকল্পতরু, উপদেশ ১৮

ভাড়াটিয়া গায়ক, কীর্ত্তনীয়া বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের ভণ্ডামি—'ভক্তি' নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মৎসরাপন্ন এক ঢঙ্গবিপ্রের কথা* প্রায়ই উল্লেখ করিতেন।

ধান গাছ ও শ্যামা ঘাস

''একভূরুভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শালি-শ্যামাকয়োর্ভেদঃ **ফলেন পরিচীয়তে** ॥''

একই ক্ষেত্রে শালি-ধান ও শ্যামা-ঘাস জন্মে, ইহাদের উভয়েরই দল (পত্র), কাণ্ড প্রভৃতি দেখিতে এক রূপ, তাই কেবল আকার দেখিয়া সাধারণ লোক ইহার পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারে না; ফলের দ্বারাই উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়।

ধান হইতে চাউল হয়, চাউল বিষ্ণু-**নৈবেদ্যে** ব্যবহৃত হয়!

* 'উপাখ্যানে উপদেশ', ২য় ভাগে এই আখ্যায়িকাটি দ্রষ্টব্য।

নৈবেদ্য—ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য।

সেই নৈবেদ্য-প্রসাদ ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরীরকে পুষ্ট করিয়া তাহার হরিভজনে সহায়তা করে।

শ্যামা-ঘাস ধান-গাছের সহিত একত্র জন্মিলেও ধান-গাছের উপকারের জন্য ঐগুলিকে প্রথম-মুখে অপসারিত করিতে হয়। শ্যামা-ঘাসের উচ্ছেদ সাধন না করিলে ধান্য-ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধিত হয় না। সেইজন্য উপযুক্ত সময় শ্যামা ঘাসগুলিকে নিড়াইয়া না দিলে ধান্য-রোপণকারী কৃষকের অভীষ্ট-লাভে ব্যাঘাত ঘটে। যে কৃষক ধান্য লাভের আশা করে, ধান্য রোপণ করিবার পরেই তাহার শ্যামা-ঘাসগুলিকে উৎপাটিত করা উচিত; তাহা না করিলে শ্যামা বীজ ভূমিতে পড়িয়া প্রচুর শ্যামা-ঘাস উৎপন্ন হইবে, কৃষকের পরিশ্রম ও খরচ বাড়িয়া যাইবে। ধান-গাছগুলিও বৃদ্ধি না পাইয়া ভালরূপে ফলবন্ত হইবে না। অনভিজ্ঞ কৃষক শ্যামাঘাসকে ধান-গাছ বলিয়া মনে করে, শ্যামার পরিবর্তে ধানগাছ উৎপাটন করে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের জীবন কেবল বিষ্ণুর সেবার জন্য। বিষ্ণুসেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনো কার্য নাই। ভক্ত এবং তথাকথিত ধার্মিক, যথা—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, মায়াবাদী, ছলভক্ত প্রভৃতিকে বাহ্য-দৃষ্টিতে দেখিতে প্রায় একরূপ। সাধারণ লোক উভয় শ্রেণিকেই ধার্মিক ও সাধু মনে করে। কিন্তু ফলের দ্বারা উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের ফলে ভগবানের অহৈতুকী সেবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আর কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও মিছাভক্তের সঙ্গে থাকিলে অন্যাভিলাষ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম অথবা সিদ্ধি ও মোক্ষ-কামনা হৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ তথা-কথিত ধার্মিক ও প্রকৃত পারমার্থিক শুদ্ধভক্তের স্বরূপ ভাবে জানিয়া অসৎসঙ্গকে সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিয়া সাধুসংগ করিবেন। নতুবা 'সাধুসংগও করিব, অসৎসংগও রাখিব'—এইরূপ বিচার থাকিলে সাধুসংগের ফল পাওয়া যাইবে না। শ্যামা-ঘাসগুলিকে উৎপাটিত না করিলে ধান-গাছ বাড়িতে পারে না।

ভগবদ্ভক্তগণকে কোনো প্রকার **বিবর্ত্ত** প্রতারিত করিতে পারে না। তাঁহারা অসাধুকে 'সাধু' বা সাধুকে 'অসাধু' বলিয়া গ্রহণ করেন না। যাহারা **মহাজনগণের** বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অধিকতর আস্থা স্থাপন করে, তাহারাই শ্রীগুরুদেবকে অন্যান্য সাধারণ মানুষের ন্যায় ভ্রান্ত মনে করিয়া তাঁহাকে সংশোধন বা শাসন করিবার চিন্তা পোষণ করে।

ভণ্ডকে ও ভক্তকে—অসাধুকে ও সাধুকে কেবল বাহ্য-বেশ দেখিয়া বুঝা যায় না। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেও বুঝিতে পারেন না। এজন্য **ভ্রমাদি** চারিটি দোষে দুষ্ট বদ্ধজীব 'সাধু' ও 'অসাধু', 'ধান্য' ও 'শ্যামা' বুঝিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়।

বিবর্ত—এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞান, অসত্যে সত্য ভ্রম, সত্যে অসত্যবুদ্ধি।

মহাজন—মহাপুরুষ, ভগবানের জন, পার্ষদ ভক্ত।

ভ্রমাদি—(১) ভ্রম, (২) প্রমাদ, (৩) বিপ্রলিপ্সা ও (৪) করণাপাটব এই চারি প্রকার দোষ। ভ্রম—ভ্রান্তি; প্রমাদ—অনবধানতা; বিপ্রলিপ্সা—অপরকে ও নিজেকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা, অপটুতা।

সাধু ও অসাধু চিনিতে হইলে মহাভাগবতের সম্পূর্ণ আনুগত্য ও নির্দেশানুসারে জীবন-যাপন করিতে হইবে; নতুবা শ্যামার উচ্ছেদ করিতে গিয়া ধান্যের উচ্ছেদ করিবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। ফলে সর্বনাশ হইতে পারে।

ন্যাকাবোকার গুরুসেবা

এক শিষ্য গুরুদেবের খুব সেবা করেন বলিয়া অভিমান করিতেন। একদিন গুরুদেব ভোজনের পর সেই শিষ্যকে কিছু 'মুখ-শুদ্ধি' মশলা আনিয়া দিতে বলিলেন। শিষ্য গুরুদেবকে একটি হরিতকী প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলে গুরু শিষ্যকে হরিতকীটি ছাড়াইয়া দিবার আদেশ করিলেন। সেবাপরায়ণ শিষ্য হরিতকীর উপরের অংশটিকে 'খোসা' মনে করিয়া 'খোসাটি কী প্রকারে গুরুদেবকে দিব?' এইরূপ ভাবিয়া খোসা ফেলিয়া হরিতকীর আঁটিটি গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিল। গুরুদেব হরিতকী সেবনে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ-সহকারে বলিলেন—"হরিতকীর খোসাটিকেই গ্রহণ করিতে হয়।"

পরদিন আবার গুরুদেব আহার-সমাপ্তির পর শিষ্যকে পুনরায় **মুখশুদ্ধি** মশলা আনিবার জন্য বলিলে গুরুভক্ত (?)

মুখশুদ্ধি—ভোজনের পর মুখকে শুদ্ধ বা দুর্গন্ধহীন করিবার জন্য হরিতকী, এলাচ প্রভৃতি দ্রব্য।

শিষ্য মহাশয় একটি বড় এলাচ লইয়া এলাচের দানাগুলি ফেলিয়া দিয়া খোসাটি গুরুদেবের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। শিষ্যের বিচার হইল—"গত কল্য হরিতকীর আঁটি দেওয়ায় গুরু-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, গুরুদেবও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আজ আবার কি প্রকারে এলাচের ভিতরের দানাগুলি গুরুদেবকে দিব?—এইরূপ বিচার করিয়া সেই শিষ্য খোসাটিই গুরুদেবকে দিল।

গল্পটির দ্বারা গুরুসেবা ও গুরুর উপদেশের তাৎপর্যের উপলব্ধিতে **মনোধর্মী** জীবের কিরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সাধু, শাস্ত্র ও গুরুদেব যে সকল উপদেশ করেন, সেই সকল নিত্য-মঙ্গলকর উপদেশ, গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিকী সেবা-বুদ্ধি ও অকপট আনুগত্য থাকিলেই তাঁহার কৃপায়, হৃদয়ঙ্গম করা যায়। **সেবোন্মুখতাই বুদ্ধিযোগ** প্রদান করে। জাগতিক দক্ষতা, চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা **আত্ম-মঙ্গলের** উপদেশ হৃদয়ংগম করা যায় না; তথায় **প্রচ্ছন্নভাবে** মায়ার যবনিকা আসিয়া বিপরীত বুদ্ধির উদয় করাইয়া দেয়।

মনোধর্মী—যাহারা নিজ-নিজ মনের বিচারে বা খেয়ালে ভাল-মন্দ স্থির করিয়া থাকে কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনের বাণীর অনুসরণ করে না।

সেবোন্মুখতা—সেবায় উন্মুখতা বা প্রবৃত্তি।

বুদ্ধিযোগ—কী ভাবে ভগবানের সেবা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত বুদ্ধি।

আত্মমঙ্গল—আত্মার বা চেতনের মঙ্গল।

প্রচ্ছন্নভাবে—গুপ্ত বা লুক্কায়িত ভাবে।

সাধু, শাস্ত্র ও গুরু উপদেশ করেন—

''অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত'—আর ॥''

অর্থাৎ (১) স্ত্রীসঙ্গী ও (২) কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহীন—এই দুই প্রকার অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করাই প্রকৃত বৈষ্ণবের আচার। এই উপদেশের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া 'রূপ-কবিরাজ' নামক এক শিষ্য-নামধারী ব্যক্তি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুকে 'স্ত্রীসঙ্গী' মনে করিয়াছিল! পরমহংসশ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর আচরণ বুঝিবার সামর্থ্য রূপকবিরাজের ছিল না। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে রূপ-কবিরাজ **আধ্যক্ষিক** জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া, গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল এবং প্রচার করিতে থাকিল যে, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ স্ত্রীসঙ্গীকে 'অসৎ' বলিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন কোনো গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণবাচার্য হইতে পারেন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত উপাখ্যানটির দ্বারা সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ বুঝিতে গিয়া প্রত্যক্ষবাদিগণের কিরূপে বিষম ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। সেবার প্রতি অকপট উন্মুখতা না থাকিলে অথবা হৃদয়ে কোনোপ্রকার অন্যাভিলাষ থাকিলে সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের আপাত-প্রতীয়মান পরস্পর-বিরুদ্ধ উপদেশের মধ্যে কিরূপ

আধ্যক্ষিক—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান আরহণ করা যায়; প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

সুসমন্বয়ের সৌন্দর্য আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। একক্ষেত্রে যাহা 'খোসা' বলিয়া বলিয়া পরিত্যাজ্য, অন্যক্ষেত্রে তাহাই আবার 'শষ্য' বলিয়া গ্রহণীয়। অতএব যাহাদিগের অধিকার ও যোগ্যতা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা একই অস্ত্র সকল স্থানে প্রয়োগ করিয়া কেবল আত্মবঞ্চিতই হয়। হরিতকী ও বড় এলাচ এই উভয়ের নিকট হইতে উপকার লাভ করিতে হইলে উভয়কে একই দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। এলাচের বাহ্য খোসা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের শস্য গ্রহণ করিতে হইবে, আর হরিতকীর বাহ্য ত্বকটিকে সার বস্তু জানিয়া অন্তরের বীজটিকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সাধুর দর্শন ও সাধুর সেবায় জীবের এইরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধক জীবকে এই সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

"ধন্য বালাম চাউল আর গাওয়া ঘি!"

কোনো এক জমিদারের বাড়িতে কোনো প্রকারেই চাকর টিকিত না। জমিদারবাবু নূতন নূতন চাকর নিযুক্ত করিতেন, আর দুই চারিদিন পরেই তাহারা চলিয়া যাইত। জমিদার বাবু ইহাতে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকর না থাকিলে গৃহের কাজকর্মও চালান অসম্ভব।

সুসমন্বয়—সুন্দররূপে মিলন, অবিরোধ বা সামঞ্জস্য।

একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট খেদ করিয়া বলিলেন, —''আমার কি কপাল! একটি চাকরও টিকিতেছে না! ইহার উপায় কী?'' তখন বন্ধুটি জমিদার বাবুকে বলিলেন—''আপনি যদি আমার উপদেশ-মত কার্য করেন, তাহা হইলে আপনি চাকরকে তাড়াইয়া দিলেও সে আর আপনাকে ছাড়িতে চাহিবে না। আপনি যে-কোনো চাকর নিযুক্ত করিয়া তাহাকে গাওয়া ঘিয়ের সহিত ভাল বালাম চাউলের অন্ন দুই বেলা খাইতে দিবেন। এইরূপে ছয়মাস-কাল ভোজন করাইবার পর তাহাকে আপনার ইচ্ছামত কার্যে নিযুক্ত করিবেন।'' বন্ধুর এই উপদেশানুসারে জমিদার বাবু সেইরূপ কার্য করিলেন। ছয়মাস-কাল বালাম-চাউলের অন্ন ঘৃত সহযোগে ভোজন করিয়া চাকরের জিহ্বায় আর অন্য চাউলের অন্ন রুচিকর হইত না। প্রায় ছয়মাস পর যখন জমিদার বাবু চাকরের উপর কার্যের খুব চাপ দিলেন, তখন চাকর জমিদার বাবুর গোমস্তা প্রভৃতিকে বলিতে লাগিল—''আমার উপর এত কাজের চাপ পড়িলে আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব।'' এইরূপ যেদিনই কিছু অধিক কাজের চাপ পড়িত, সেই দিনই চাকরটি বলিত—''আর আমি এখানে থাকিব না।'' জমিদার বাবু একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—''যাও তোমার যেখানে ইচ্ছা, চলিয়া যাও।'' চাকরটি অন্যান্য জায়গায় চাকুরীর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও সেই প্রকার বালাম চাউল ও গাওয়া ঘি খাইতে পাইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া পুনরায় ঐ জমিদার বাবুর বাড়িতেই আসিয়া রহিল। তারপরও অধিক কাজের চাপ পড়িলেই চাকরটি মাঝে মাঝে নানা স্থানে চলিয়া

যাইত; কিন্তু যখনই বালাম চাউল ও গাওয়া ঘিয়ের কথা মনে পড়িত, তখনই, জমিদার বাবুর বাড়িতে চলিয়া আসিত এবং বলিত যে, জমিদার বাবুর প্রতি তাহার একটা মমতা জন্মিয়া গিয়াছে, অন্যত্র গিয়া আর মন টিকিতেছে না। কয়েক বৎসর পর বন্ধুর সহিত জমিদার বাবুর একদিন সাক্ষাৎকার হইলে জমিদার বাবু বলিলেন—''ধন্য বালাম চাউল, আর গাওয়া ঘি!''

এই গল্পটির দ্বারা কামিনী, কাঞ্চন ও যশো-কামনার প্রভাবের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া **অহৈতুক—ভাবে** হরিভজন করিবার গ্রাহক পৃথিবীতে একজনও পালয়া দুর্ঘট। কৃষ্ণের সংসার-স্বরূপ ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি লোকও টিকিতে চাহে না—কেহই গুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের **অশুল্ক দাসত্ব** করিতে চাহে না। দুই চারিদিন অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণের সংসারে সেবা করিবার অভিনয় করিয়াই আবার ভোগের রাজ্যে বা যেখানে অন্যাভিলাষ, ধর্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তির পিপাসা চরিতার্থ হয়, সেখানে চলিয়া যাইতে চাহে! ইহাদিগকে কৃষ্ণের সংসারে ছলে-বলে-কৌশলে টানিয়া রাখিয়া ইহাদের **অজ্ঞাত সুকৃতি** উৎপাদন করিবার জন্য পরদুঃখ-দুঃখী

অহৈতুক ভাবে—কোনো হেতু বা নিজের লাভালাভের দিকে না তাকাইয়া একমাত্র ভগবানের সুখের জন্য।

অশুল্ক দাসত্ব—কোনওরূপ বেতন বা পারিতোষিক গ্রহণ না করিয়া যে সেবা।

অজ্ঞাত-সুকৃতি—কাহারও অজ্ঞাতসারে যে কৃষ্ণভক্তির যোগ্যতা লাভের জন্য সৌভাগ্যের উদয় হয়।

গুরুদেব অনেক ব্যক্তিকেই বালাম চাউল ও ঘৃত ভোজন করাইয়া থাকেন। অর্থাৎ নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠাদি দিয়া কৃষ্ণের সংসারে রাখিবার চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ ইঁহারা কৃষ্ণের সংসার হইতে ছুটিয়া ছুটিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেও যখন কেহ কেহ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ বালাম চাউল ও ঘৃত প্রাপ্ত হন, তখন ইঁহাদের কেহ কেহ জমিদার বাবুর প্রতি অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রতি মমতা জন্মিয়া গিয়াছে—এইরূপ 'দরদ' দেখাইয়া থাকেন। তখন তাড়াইয়া দিলেও তাঁহারা যাইতে প্রস্তুত হন না। ধন্য প্রতিষ্ঠারূপী বালাম চাউল, আর গাওয়া ঘি!

জমিদার বাবুর স্বকার্য-সাধন—আচার্যের স্বভজন অর্থাৎ শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-সেবা সম্পাদন; চাকর—যাহারা অন্যাভিলাষী হইয়া গুরুসেবকের অভিনয়; বালাম চাউল ও গাওয়া ঘি—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-কামনা।

বৃদ্ধ বানরের কথা

কোনো নগরে ইন্দ্র নামে এক রাজা বাস করিতেন। পুত্রগণ বানরের সহিত ক্রীড়ায় আমোদ পাইত বলিয়া রাজা প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য-দ্বারা একদল বানর পুষিতেন। এই সকল বানরের দলপতি শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি ও চাণক্যের নীতি-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল; সে অন্য বানরগুলিকে তাহা শিক্ষা দিত।

রাজ-গৃহে শিশু রাজকুমারগণকে বহন করিবার জন্য একপাল মেষও ছিল। মেষ-পালের মধ্যে একটি উদর-পরায়ণ মেষ প্রত্যহই নির্ভয়ে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিত এবং যাহা কিছু দেখিত, তাহাই ভক্ষণ করিত। পাচকগণও হস্তের নিকটে যাহা কিছু পাইত, তাহা দ্বারাই মেষটিকে প্রহার করিত।

বানর-দলপতি ঐ ব্যাপার দেখিয়া চিন্তা করিল,—"অহো,—মেষ ও পাচকগণের এই কলহ বানরগণের বিনাশের কারণ হইবে। এই মেষটি বড়ই উদর-পরায়ণ, আর পাচকেরাও হস্তের সন্নিকটে যাহা পায়, তাহা দ্বারাই উহাকে প্রহার করে। যদি অন্য বস্তুর অভাবে পাচকেরা জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারাই ইহাকে প্রহার করে, তবে অল্পমাত্র অগ্নি-সংযোগেই প্রচুর পশমযুক্ত ঐ মেষের শরীর জ্বলিতে থাকিবে। সেই অবস্থায় মেষটি যখন সমীপবর্তী অশ্বশালায় যাইবে, তখন চারিদিকেই তৃণময় বলিয়া অশ্ব-শালাটিও জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতে অশ্বগুলিও অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবে। পশু-চিকিৎসা-শাস্ত্রের লেখক শালিহোত্র বলিয়াছেন—'বানরের চর্বি দ্বারাই অশ্বের অগ্নি-দহন-জনিত ক্ষত নষ্ট হয়।' অশ্বগুলির জন্য রাজা নিশ্চয়ই বানর বধ করাইবেন। মনে মনে এইরূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বৃদ্ধ বানরটি বানরগণকে নির্জনে ডাকিয়া বলিল—"যে-স্থানে মেষ ও পাচকগণের কলহ, সে-স্থানে বানরগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সবংশে ধ্বংস হইবার পূর্বেই চল, আমরা বনে যাই।"

বৃদ্ধ বানরের এই কথায় মদ-গর্বিত বানরগণের কিন্তু শ্রদ্ধা হইল না। তাহারা বৃদ্ধ বানরকে উপহাস করিয়া বলিল—

''বার্দ্ধক্য-বশতঃ তোমার মতিভ্রম হইয়াছে, তজ্জন্যই এরূপ বলিতেছ! আমরা রাজ-পুত্রগণের স্বহস্তে-প্রদত্ত অমৃততুল্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া কটু, কষায়, ক্ষার, তিক্ত ও রুক্ষ ফল-সমূহ ভক্ষণ করিব না।''

বৃদ্ধ বানরটি গর্বিত বানরগণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অশ্রু-পূর্ণ-নেত্রে তাহাদিগের প্রতি বলিতে লাগিল—''রে মূর্খগণ, তোরা এই সুখের পরিণাম জানিস না। এই নানাপ্রকার পাক রসাস্বাদনযুক্ত সুখ কি পরিণামে বিষতুল্য হইবে না? অতএব আমি নিজে আর কুল-ক্ষয় দর্শন করিব না—সম্প্রতি আমিই বনে যাইতেছি।'' এইরূপ বলিতে বলিতে বানরদলপতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল।

বৃদ্ধ বানরটি চলিয়া গেলে একদিন সেই মেষ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। তখন হাতের নিকটে অন্য কিছুই না পাইয়া পাচক নিকটবর্তী অর্দ্ধজ্বলিত কাষ্ঠের দ্বারাই সেই মেষটিকে প্রহার করিল। মেষটি তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিতে করিতে নিকটবর্তী অশ্ব-শালায় প্রবেশ করিয়া তথায় তৃণময় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে থাকিলে অশ্বশালাটি এরূপভাবে জ্বলিয়া উঠিল যে, কতকগুলি অশ্ব অগ্নি-দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কতকগুলি অশ্ব রজ্জুর বন্ধনাদি ছিন্ন করিয়া শব্দ করিতে করিতে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল—তাহাতে সকলের ত্রাসের সঞ্চার হইল।

এই সকল দেখিয়া রাজা পশু-চিকিৎসকগণকে ডাকাইয়া ঐ অশ্বগুলিকে আরোগ্য লাভ করাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা শাস্ত্র দেখিয়া বলিল—''মহারাজ! এই বিষয়ে মহর্ষি

শালিহোত্রের এরূপ ব্যবস্থা—

''কপীনাং মেদসা দোষো বহ্নিদাহ-সমুদ্ভবঃ।
অশ্বানাং নাশমভ্যেতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥''

সূর্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার নাশ পায়, সেরূপ অশ্ব-সকলের অগ্নিদাহজাত দোষ বানরগণের মেদঃ (চর্বি) দ্বারা নষ্ট হয়।

রাজা সেই বৈদ্যগণকে আদেশ করিলেন—''যাহাতে এই অশ্বগুলি দাহ-দোষে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপ ভাবে শীঘ্র ইহাদের চিকিৎসা করুন।''

রাজাও বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে বানরগুলিকে বধ করিতে আদেশ দিলেন। বিবিধ অস্ত্র, লগুড় ও প্রস্তরাদি-দ্বারা সেই বানরগুলিকে বধ করা হইল। বানর-দলপতি পুত্র-পৌত্র-ভ্রাতৃগণের বিনাশের কথা জানিয়া পরম বিষাদগ্রস্ত হইল।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বৃদ্ধ বানরের এই গল্পটির দ্বারা শিক্ষা দিতেন যে, যাঁহারা সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে অসৎস ও অসৎ পিপাসা পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহার অনুগমনে সময় থাকিতে হরিভজন করিবেন, তাঁহাদেরই মঙ্গল হইবে; আর যাহারা, ''আমরা অধিক বুঝি, মতিভ্রষ্ট বৃদ্ধ উপদেষ্টা (শ্রীগুরুদেব) কী আর আমাদিগের অপেক্ষা বেশি বুঝেন?'' এইরূপ মনে করিয়া বহুরূপী অসৎসঙ্গের লোভ পরিত্যাগ করিবে না, তাহারা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এই স্বজন-বিনাশ স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারিবেন না বলিয়া শ্রীগুরুদেব অন্যত্র সরিয়া পড়েন অর্থাৎ **অন্তর্ধান-লীলা** প্রকাশ

অন্তর্ধান-লীলা—মহাপুরুষগণের অপ্রকট-লীলা; এই জগত হইতে

করেন। অতএব গুরুদেবের উপদেশ সময় থাকিতে শ্রবণ করিয়া দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক হরিভজনই পরম মঙ্গলকর।

৯০❀০৫

"ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি, এখন কি দিবি ত' বল?"

সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—"অশক্তোঽহং গৃহারম্ভে শক্তোঽহং গৃহভঞ্জনে" অর্থাৎ আমি এতই অসমর্থ যে, একটি গৃহেরও নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করিতে পারি না, কিন্তু একটি অট্টালিকাকেও ধূলিসাৎ করিতে বিশেষ দক্ষ।

খল ও ক্রূর ব্যক্তিগণের চরিত্রই এইরূপ। ঐ নীচ-স্বভাব ব্যক্তিরা পরের কার্য কেবল নষ্টই করিতে পারে, কিন্তু পরের কোনো উপকার করিতে পারে না। মূষিক বহু মূল্যবান গ্রন্থ, বস্ত্র কিংবা শস্যের গোলা নষ্ট ও ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু উহা প্রস্তুত করিতে পারে না।

বহু ভাগ্যফলে জীবের হৃদয়ে ভক্তের ও ভগবানের প্রতি অকপট শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হয়। শত শত জন্ম ব্যাপিয়া

গোলোকে আরোহণ; আত্ম-সংগোপন। সাধারণ জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় শুদ্ধবৈষ্ণব বা গুরুদেবের জন্ম-মৃত্যু নাই; তাঁহারা ভগবানের ইচ্ছায় মঙ্গলের জন্য জগতে আসেন ও তাঁহারই ইচ্ছায় অন্যত্র গমন করেন।

বৈরাগ্য, তপস্যাদি আচরণ করিয়াও শ্রদ্ধার একটু কণিকা পাওয়া যায় না, কিন্তু ভক্তের শুভ-ইচ্ছায় সেই শ্রদ্ধা অনেক সময়ে জীবের হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। খল ও ক্রূর ব্যক্তিগণ গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধার অঙ্কুরকে যে কোনো মুহূর্তে উৎপাটিত করিয়া দিতে পারে, অথচ তাহারা গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধার আভাসও কাহারও হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারে না। যাহারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, কুযুক্তি, কুতর্ক প্রভৃতি দ্বারা ভক্তের ও ভগবানের চরিত্র সমালোচনা করে, সেই **তামস**-প্রকৃতির ব্যক্তিরাই এই শ্রেণির, অর্থাৎ তাহারাই দৌরাত্ম্য, দুর্বলতা বা **পৈশুন্য** আচরণ করিয়া পাকে-প্রকারে বলে—"ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি, এখন কি দিবি ত' বল?" যদি তাহারা কেবল ভাল না করিয়া নিরপেক্ষও থাকিতে পারিত, তাহা হইলে অন্ততঃ ক্ষতিকর কিছু হইত না। কিন্তু মায়ার এমনই চক্রান্ত যে, এই জগতে কেহ প্রকৃত নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। হয় সে ভাল করিবে, না হয়, সে মন্দ করিবে। যে ভাল করিতে পারে না, তাহাকে মন্দ করিতেই হইবে। উহারা লোকের অমঙ্গল করিয়া ও মঙ্গলময় বস্তুকে ধ্বংস (?) করিয়া আবার তজ্জন্য পারিতোষিক দাবী করে!

৯০❀০৫

বৈরাগ্য—সংসার বা বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা।

তামস—খল; তমোগুণসম্পন্ন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই তিনটি গুণ। তন্মধ্যে তমোগুণের দ্বারা নিদ্রা, আলস্য, খলতা, কপটতা, ব্যভিচার,—এই সকল বৃত্তির উদয় হয়।

পৈশুন্য—খলতা।

শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা!

কোনো জমিদার তাঁহার গৃহ-দেবতা শ্রীশালগ্রামের পূজা-কার্য কোনো **ভাড়াটিয়া** পূজারীর দ্বারা সম্পাদন করাইতেন। উক্ত জমিদারের একটি নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রত্যহই কিছু বাদাম শ্রীনারায়ণের ভোগের জন্য প্রদান করিতেন। পূজারী প্রত্যহই বাদামগুলি লইয়া ঠাকুরের ভোগের উদ্দেশ্যে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিত। ঐ ব্যক্তি শ্রীশালগ্রামে সামান্য-শিলা-বুদ্ধি করিয়া একটি চন্দন-পাটার উপরে বাদাম রাখিয়া শালগ্রামটির দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিত এবং বাদামগুলির শস্য গ্রহণ করিয়া নিজের দগ্ধোদর পূর্ণ করিত। পূজারীর এইরূপ আচরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন ঐ জমিদার পূজারীকে **অর্দ্ধচন্দ্র** দিয়া চিরতরে বিদায় দিলেন।

যাহারা শ্রীহরি, গুরু বা বৈষ্ণবের দ্বারা নিজের কোনোপ্রকার ভোগ বা মোক্ষ-কামনা চরিতার্থ করাইয়া লইবার কিংবা কামিনী-কাঞ্চন ও সম্মানাদি সংগ্রহ করাইয়া লইবার অভিলাষ পোষণ করে, তাহাদের বিচার 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' বিচারের ন্যায়। যাহারা শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ, কথকতা, ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা, ধর্ম-গ্রন্থ-সমূহ রচনা, কীর্ত্তন, কিংবা মন্ত্রাদি

ভাড়াটিয়া—যে ভাড়া খাটে, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কামিনী, কাঞ্চন-প্রাপ্তির বিনিময়ে কোনো কার্য করে।

অর্দ্ধচন্দ্র—গলা-ধাক্কা।

প্রদান করিয়া উহাদের বিনিময়ে টাকা-পয়সা, যশোলাভ এবং অপরের বা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টাই 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' চেষ্টা। ভাড়াটিয়া পাঠক, কথক, মন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী—ইহারা সকলেই 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' চেষ্টা করিতেছে—অর্থাৎ ভগবানের সেবার বস্তু নিজেদের ভোগে লাগাইতেছে অথবা ভগবানে ভোগবুদ্ধি করিতেছে। যাহারা গুরু-বৈষ্ণবের সেবার ছলনা বা মঠবাসের ছলনা করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা নিজেদের সুখ-সুবিধা করাইয়া লইতে চাহে, মঠ-সেবার পরিবর্তে মঠভোগ, কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে কৃষ্ণের সম্পত্তি ভোগ বা কৃষ্ণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টা ভক্তির মত মনে হইলেও উহা উক্ত ভাড়াটিয়া পূজারীর 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার' চেষ্টার ন্যায় মিছা-ভক্তি।

ভগবানের নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম, শান্তি বা মুক্তি প্রার্থনা করাও 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' চেষ্টা।

৯০❀০৫

লালু ও কালু

এক মুদির লালু ও কালু নামে দুই পুত্র ছিল। পুত্র দুইটি যাহাতে কোনোপ্রকারে দাঁড়ি-পাল্লার হিসাব-নিকাশমাত্র রাখিতে পারে—এই সঙ্কল্প করিয়া উক্ত মুদি পুত্র দুইটিকে এক শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিল। বালক দুইটি এত দুরন্ত ছিল যে, ক্রমাগত বহু শিক্ষক আসিয়াও তাহাদিগকে ঐ সামান্য শিক্ষাটুকুও দিতে পারিলেন না। অবশেষে উক্ত মুদি ঘোষণা করিল যে, যিনি তাহার পুত্র দুইজনকে 'শট্‌কে' পর্যন্ত শিখাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ব্যবসায়ের অর্দ্ধেক লভ্যাংশ দেওয়া হইবে।

ঐ মুদির গুণধর (!) পুত্র দুইটি ঐরূপ অল্প বয়সেই গোপনে তামাক খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিল। মুদির বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হইয়া এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লালু ও কালুর শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। লালু ও কালুকে সর্বদাই শিক্ষকের নিকটে থাকিতে হইবে—তাহাদের পিতা এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একদিন লালু ও কালু শিক্ষকের সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছে, এমন সময়ে পথে একটি গরু দেখিতে পাইলে শিক্ষক মহাশয় লালুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল ত' এই গরুটির কয়টি পা?" লালু তখন 'এক', 'ডুই, টিন,—এইরূপ বলিয়া গুরুটির পা-গুলি গণিতে লাগিল। এমন সময়ে কালু দাদার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল,—"ওরে ডাডা! গুণিস নারে গুণিস না, ফাঁকি দিয়া 'শট্‌কে' শিখাইয়া দিবে!" এই কথায় পণ্ডিতের চালাকি বুঝিতে পারিয়া লালু নিবৃত্ত হইল।

আর একদিন লালু ও কালু শিক্ষকের সহিত এক ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল। উহারা উভয়েই প্রথমে নিদ্রার ভান করিয়া নাসিকার ধ্বনি করিতে লাগিল—যেন শিক্ষক মহাশয় বুঝিতে পারেন যে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এদিকে শিক্ষক মহাশয় লালু ও কালুকে নিদ্রিত মনে করিয়া নিজেও নিদ্রাগত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই লালু ও কালু মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিয়া শিক্ষক মহাশয়কে দেখিতে লাগিল। যখন তাহারা বুঝিল যে, শিক্ষক মহাশয় নিদ্রিত হইয়াছেন, তখন তাহারা উঠিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমন করিল এবং যথেচ্ছভাবে তামাক সেবন করিয়া পূর্ববৎ নিদ্রার ছল করিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুকাল পরে যখন শিক্ষক মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তিনি গৃহের অভ্যন্তরে তামাকের তীব্র গন্ধ পাইলেন। শিক্ষক মহাশয় লালু ও কালুকে উঠাইয়া ঐরূপ তীব্র গন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উভয়ের হস্তের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন। উহাদের দুইজনের হস্তেই তামাকের তীব্র গন্ধ পাওয়া গেল। তখন লালু ও কালু চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—"পণ্ডিত মহাশয়! আমরা এ সকল বিষয়ের কিছুই জানি না।" শিক্ষক মহাশয় বালকদ্বয়কে তিরস্কার করিয়া বলিলেন— "তোমাদের হাতে তামাকের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে কেন?" লালু ও কালু ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিল—"পণ্ডিত মহাশয়, আপনার পূর্বেই আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম এবং এইমাত্র জাগিলাম। আমরা কোন্ সময়ে তামাক খাইব? তবে কি জানি, কোনো দুষ্ট লোক হয় ত' আমাদিগকে দোষী করিবার জন্য আমরা ঘুমাইয়া পড়িলে

আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হাতে তামাক খাইয়া চলিয়া গিয়াছে!''

যাহারা কিছুতেই আত্মমঙ্গল বরণ করিবে না, তাহাদের আদর্শ লালু ও কালুর চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাছে অজ্ঞাতসারেও সাধু ও গুরু আমাদিগের মঙ্গল করিয়া ফেলেন, আমাদিগকে ভুলাইয়া ছলে, বলে ও কৌশলে 'শট্‌কে' শিখাইয়া দেন, অর্থাৎ মঙ্গলের পথে চালিত করেন—এই আশঙ্কায় আমরা সাধুগণের বাণী বা উপদেশ শ্রবণ কিংবা তাঁহাদের বিচার-আচারের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হই না! লালু ও কালুর ন্যায় কিছুতেই আত্মমঙ্গল বরণ করিব না—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া সাধুর সঙ্গে চিরকাল থাকিবার অভিনয় করিয়াও কপটতা-পূর্বক তামাক' সেবন করি, অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মাদকতায়ই লুব্ধ হই! সাধুগণ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগকে **বাস্তব**-সত্যের পথে চালিত করিতে পারেন না; কারণ আমরা **স্বতন্ত্রবুদ্ধি** ও কপটতাকে কিছুতেই পরিহার করি না। গুরুদেব আমাদিগের কপটতা ও অসদ্বিষয়ে **অভিনিবেশ** হাতে-কলমে ধরিয়া দিলেও আমরা তখন বলিয়া থাকি—উহাতে আমাদিগের কোনো প্রবৃত্তি নাই, আমরা নির্দোষ, গুরু-বৈষ্ণবগণই দোষী, তাঁহারাই

বাস্তব—প্রকৃত; যথার্থ; যাহার নিত্য সত্তা আছে; যাহা নিত্যকালই সত্য, তাৎকালিক বা ব্যবহারিক সত্যমাত্র নহে।

স্বতন্ত্রবুদ্ধি—গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত বা শরণাগত না হইয়া স্বাধীনভাবে চলিবার দুর্বুদ্ধি।

অভিনিবেশ—আসক্তি, অতিশয় মনোযোগ।

আমাদিগকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদিগের হস্তে তামাক সেবন করিয়া গিয়াছেন!'' কপট ও দুষ্ট ব্যক্তিগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা নিজের দোষ গোপন করিবার জন্য অপরকে দোষী করে। নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার পিপাসাকে গুরু-বৈষ্ণবগণের স্কন্ধে আরোপ করিবার চেষ্টা করে! জগতের লোভী-**সম্প্রদায়** বৈষ্ণবগণকে লোভী, কামুক-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-গণকে **কামুক** ও **জড়-প্রতিষ্ঠাকামি**-সম্প্রদায় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রতিষ্ঠাকামী মনে করে।

৺৵❀৵

'নিমকহারাম' ও 'নিমকহালাল'

হরিশপুরের জমিদার-মহাশয়ের কামদাস-নামে একটি গোমস্তা ছিল। কামদাসকে তাহার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—''ওহে কামদাস তোমার মনিব তোমাকে কেমন ভালবাসেন?'' কামদাস উত্তর করিল—''ওহে ভায়া ভাল কী এমনি বাসেন? ভালবাসা পাওয়ার কায়দা আছে। কেমন ভালবাসেন, দেখিতে পাইতেছ না? পরণে মিহি ধুতি, পায়ে ফ্যান্সি চটি, গায়ে ফুলদার পাঞ্জাবী, খাওয়া-দাওয়া বাবুর নিজ

সম্প্রদায়—সমাজ; গোষ্ঠী।

কামুক—কামরিপুর বশবর্তী; নানা কামনার দাস।

জড়-প্রতিষ্ঠাকামী—যাহারা জাগতিক সম্মান কামনা করে।

বন্দোবস্তেরই মধ্যে, আমার বউ-বোনের গায়ে গয়না ধরে না, ছেলে-পিলেকে বেয়ারা স্কুলে লইয়া যায়, আমাকে ডাকিতে বাবু গাড়ি পাঠা'ন—ইহা দেখিয়াও তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, বাবু আমাকে কেমন ভালবাসেন! এ, এক তাজ্জব ব্যাপার বটে!'' বন্ধুটি পুনর্বার প্রশ্ন করিল—''আচ্ছা ভাই, ভাল যে খুবই বাসেন তাহা ত' দেখিতেই পাইতেছি; কিন্তু তোমাকে বাবু এত সুনজরে দেখেন কেন? অন্য গোমস্তাগুলি ত' এত সুবিধা করিতে পারে নাই।'' উত্তরে কামদাস বলিল ''আরে ভাই, তাই ত' বলিতেছিলাম, ইহার 'কায়দা' আছে। আমি বাবুকে 'রাজা সাহেব' ছাড়া ডাকি না, আর এমন ভাব দেখাই,—যেন আমি জানি তিনিই দুনিয়ার একচেটিয়া মালিক, আর সব জায়গায়ই তাঁহার এক্তিয়ার, আমি যেন তাঁহাকে ঈশ্বরের মতই দেখি; ইহাতেই তাঁহার এত 'পেয়ারে'র গোমস্তা হইয়াছি। সত্য বলিতে কি, এজন্য লোকে আমাকে 'প্রভুপেষ্ঠ' বলে। এমন-ধারা কী সবাই পারে রে ভাই, না, সবাই এ সকল 'কায়দা জানে?''

এমন সময় মুক্তিচরণ-নামে বাবুর আর এক গোমস্তা সেই স্থান দিয়া এত দ্রুতপদে যাইতেছিল যে—বাবু যেন তাহাকে রাস্তার ধূলি উড়াইবার ভারই দিয়াছেন! কামদাস তাহাকে ডাকিয়া বলিল—''ওহে মুক্তি দাদা, খবর কী? আহা, তোমার কষ্ট দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। তুমি কিছুতেই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহ না কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেই মজবুত। আমিও বাবুর চাকর, তুমিও বাবুর চাকর। দেখ দেখি, আমি কেমন সুখে আছি, আর চিরকালই সুখেই থাকিব।''

মুক্তিচরণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—''ভাই, আমি তোমার সুখকে 'সুখ' বলিয়াই মনে করিতে পারি না। তুমি আজ বাবুকে নানারকমে তোষামোদ করিতেছ, কাল একটু এদিক ওদিক হইলেই তিনি চটিয়া যাইবেন, তখন তোমার এই সুখ কোথায় থাকিবে, ভাই? যে-সুখের শেষে দুঃখ আছে, তাহা দুঃখেরই আর একটি রূপ, বই ত' নয়? যতক্ষণ না নিজে 'বাবু' হইতে পারা যায়, ততক্ষণ আমি যেন কিছুতেই শান্তি পাই না। বাবুর গদিতে যখন বসিতে পারিব, তখনই আমার সাধ মিটিবে, তাহার আগে নয়। আমি তোমার মত ঐ বাজে সুখের রং চং-এ ভুলিতে রাজী নই। ও সুখে যতই মত্ত হওয়া যায়, ততই আমার বাবু হওয়ার পথে কাঁটা! ভাই, তাই ওরকম সুখকে আমি বড় একটা গ্রাহ্যই করি না।''

পথে যাইতে যাইতে হরিদাস-নামক এক ব্যক্তি এই সকল শুনিতে পাইয়া অন্য একজন পথিককে বলিলেন—''ওঃ, কি ভয়ানক! বাহিরে দেখিতে এই লোকটি সাধুর মত ভোগ ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অন্তরটা একেবারে বিষে ভরা—চাকর হইয়া নিজেই প্রভুর আসন অধিকার করিতে চাহে! এরূপ কৃতঘ্ন লোকের সঙ্গ কখনও করিতে নাই। প্রভু—আমাদের সেব্য, এইমাত্র জানিয়াই প্রভুর সেবা করি, অন্য কারণে নহে! প্রভু আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবেন—এজন্য প্রভুর তোষামোদ করা কখনও 'প্রভুভক্তি' নহে, ইহা প্রভুর প্রতি বিরোধ ও প্রভুকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা। আর সাধারণ সুখভোগ ত্যাগ করিয়া নিজে 'প্রভু' হইবার যে যত্ন, তাহা আরও ভয়ানক! আমি কিন্তু,

ভাই, ওরূপ কোন ভোগের বা ঐ ভোগের সঙ্গে যে দুঃখ আছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 'স্বয়ং প্রভু' হইবার বাসনা করি না। আমি চিরকালই আমার মনিবের চাকর—উহাই আমার নিজের পরিচয়। সুতরাং মনিবের বাড়ির লোকজনের, আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিতেই যেন আমি ভালবাসি; তাহার বিনিময়ে আমি যেন এক কানাকড়িও না চাই। তাই, আমার মনিব, আর তাঁহার প্রিয়জনেরা বড়ই দয়ালু ও উদার; তাঁহারা এ দীনহীনের সামান্য অযোগ্য সেবাটুকু যদি প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে তাঁহাদিগের সেবা হইতে কখনও বঞ্চিত না করেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব—আমার জীবন সার্থক হইবে! উহারা দুইজনই সুখ চাহিতেছে বটে, কিন্তু খাঁটি সুখ অর্থাৎ প্রভুর প্রীতিটুকুও পায় নাই, কেননা উহারা দুইজনেই "আমার দাড়ে ছোলা" নীতির পক্ষপাতী।—ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর উদারতা ও নিজের দীনতার কথা স্মরণ করিয়া হরিদাসের গৌরব স্ফীত বক্ষস্থলের উপর এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

পাঠক! প্রথমোক্ত চাকরটি প্রকৃতপক্ষে খাঁটি চাকর নহে,—সে একজন 'বণিক'। সে যাহা কিছু করে তাহারই বিনিময়ে কিছু চায়। এরূপ লোকেরাই ফলভোগকামী কর্মকাণ্ডীর দল। বস্তুতঃ ইহারা কখনই ভগবানের সেবা বা জগতের প্রকৃত উপকার করে না। বাহিরের দিক হইতে দেখা যায় যে, ইহারা ধর্ম কর্মে বা ভগবানের সেবাতেই ব্যস্ত, আর বোকা লোকেরাও ইহাদিগের বাহিরের কর্মঠতা দেখিয়া ইহাদিগকে ভক্ত বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহারা 'ফেল কড়ি, মাখ তেল' নীতির উপাসক। দ্বিতীয়

গোমস্তাটি যদিও বাহিরের দিকে বিলাসী বা ভোগী নহে, তথাপি সে এমন নিমকহারাম বা কৃতঘ্ন যে সে মনিবের আসনেই বসিতে চায়! সে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখায় বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে 'মনিব হইব'—এই কালকূটবুদ্ধি। এই কালকূট আকণ্ঠ পান করিয়া তাহারা একবারে স্মৃতি-বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ, শেষে আত্ম-বিনাশ লাভ করে। এরূপ লোকেরাও মায়াবাদী বা **নির্বিশেষবাদীর** দল। তাহারা যতই বৈরাগ্য প্রদর্শন করুক না কেন, প্রথমে পাঁচটি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদের পূজার ঘটা ও ভক্তি দেখাইবার চেষ্টা করেন, শেষে সেই পাঁচটি দেবতারই (সূর্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও কল্পিত বিষ্ণুর) বিসর্জন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভাঙ্গিয়া (?) ফেলিয়া নিজেদের ব্রহ্মাভিমান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। তাহারা সংসারও ভোগ করিতে পারে না, 'ব্রহ্ম'ও হইতে পারে না! এই দুই প্রকার জীবের কোনোটিই কিন্তু শ্রীভগবানের প্রকৃত শুদ্ধ সেবক নহে, অর্থাৎ উহারা উভয়েই অভক্ত। আর শেষোক্ত হরিদাসের মত ভগবদভক্তই নিজের যথা-সর্বস্ব নিঃশেষে নিত্য-আরাধ্য-প্রভু ভগবান শ্রীহরির ও তাঁহার নিজ-জনগণের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া নিরন্তর অনবদ্য সেবানন্দ-সুখের স্রোতে ভাসিতে থাকেন। নিত্য-প্রভু নিত্য ভৃত্যের সেবা গ্রহণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি লাভ করেন, তাহাতেই ভৃত্যের সুখ—ইহাই সেবানন্দ। এই পৃথিবীতে

নির্বিশেষবাদী—যাহারা ভগবানের বিলাস বা লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করে না; পরিণামে সবই বিচিত্রতাহীন বা একাকার হইয়া পড়ে—যাহারা এইরূপ কল্পনা করে।

ক্রীতদাস-প্রথার ন্যায় চেতনময় জগতের অশুল্ক দাসত্বও কিছু স্বার্থপরতা, ক্লেশ ও অভাব-অভিযোগময় ব্যাপার নহে, জড়-জগতের অভাব ও অসম্পূর্ণতা চেতন-জগতে নাই।

দুধ ও চূণ-গোলা

এক জমিদার ঘন-জ্বাল-দেওয়া সর-তোলা দুধ খাইতে খুব ভালবাসিতেন। প্রত্যহই দুই বেলা উৎকৃষ্ট কলার সহিত ঘন দুধ বা ক্ষীর ভোজন না করিলে তাঁহার আর কিছুতেই তৃপ্তি হইত না।

জমিদার বাবু দুধের জন্য বাড়িতে অনেকগুলি গরু পুষিয়াছিলেন। এক গোয়ালা প্রতিদিনই দুগ্ধ দোহন করিয়া তাহা পাচকের হাতে দিয়া যাইত। কিন্তু জমিদারবাবু প্রত্যহই বলিতেন যে, গোয়ালা ও পাচক উভয়েই দুগ্ধে জল মিশাইয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে; নতুবা দুধ এত পাতলা হইবার কারণ কী?

একদিন জমিদারবাবু গোয়ালাকে দুগ্ধ দোহন করিয়া উহা তাহার নিকট লইয়া আসিতে বলিলেন এবং পাচককেও নিকটে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিলেন। গোয়ালা একটি পাত্রে খাঁটি গরুর দুধ ও আর একটি পাত্রে কিছু চূর্ন-গোলা লইয়া জমিদার-বাবুর নিকট উপস্থিত হইল ও তাঁহাকে বলিল—"প্রথম

পাত্রটিতে হুজুরের বাড়ির গরুর দুধ (খাঁটি দুধ) আর দ্বিতীয় পাত্রটিতে আমার বাড়ির গরুর দুধ (চূণ গোলা) রহিয়াছে।"

জমিদারবাবু প্রথম পাত্রটির দুধ অত্যন্ত পাতলা দেখিয়া পাচককে বলিলেন—"আজ খাওয়ার সময় আমাকে গোয়ালার বাড়ির ঘন দুগ্ধ দিবে এবং উহার সহিত শালি-ধানের অন্ন ও অমৃত সাগর কলা দিবে।" পাচক মধ্যাহ্নে জমিদারবাবুর ভোজনের সময় তাহাই করিল। ঘন দুগ্ধ মনে করিয়া চূর্ন গোলা পান করাতে জমিদারবাবু মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এদিকে গোয়ালা ও পাচককে পুলিশে আসিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। তখন তাহারা উভয়েই বলিতে লাগিল যে, তাহাদিগের কোনোই দোষ নাই, জমিদারবাবু নিজের ইচ্ছায় খাঁটি দুধ ছাড়িয়া চূণ গোলা পান করিয়াছেন। পুলিশ উহাদিগের কথা শুনিয়াও উহাদিগকে কারাগৃহে লইয়া গেল।

সদ্গুরু ও তথা-কথিত গুরু, শুদ্ধভক্তি ও ছল-ভক্তি, প্রেম ও কাম, ভক্তি ও ভোগ, হরিভজন ও কপটতা বাহিরে দেখিতে অনেক সময় দুধ ও চূণ-গোলার মত—এক বলিয়া মনে হয়; এমন কি, নকল ও কৃত্রিম দ্রব্যগুলি প্রকৃত দ্রব্য অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। খাঁটি দুধ অপেক্ষা চূণ গোলা অধিক ঘন, আসল সোনা অপেক্ষা মেকি সোনা অধিক উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

যাহারা আত্মবঞ্চিত ও যাহারা লোক-বঞ্চক, তাহারাই কেবল দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া চূণ-গোলা গ্রহণ করে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধা বা ছলভক্তি, প্রকৃত সাধু পরিত্যাগ

করিয়া বুজরুককে ভক্ত ও সাধু মনে করিয়া থাকে। ইহাতে উভয় শ্রেণির ব্যক্তিরই প্রাণ-বিনাশ বা প্রাণদণ্ড-লাভ হয়। অতএব বাহিরে দেখিতে এক মনে হইলেও প্রকৃত বস্তু অনুসন্ধান করিয়া বরণ করাই কর্তব্য। নিজে সরল ও অকপট এবং সেবার প্রতি উন্মুখ থাকিলে কৃষ্ণই তাঁহাকে প্রকৃত সন্ধান প্রদান করেন; আর কপট ব্যক্তি ভগবানের মায়ার দ্বারা বঞ্চিত হয়।

কাক ও কোকিল

কাক বহু পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নের সহিত তাহার বাসা নির্মাণ করে। কোকিল সেই কাকের বাসায় আশ্রয় করিয়া বড় হয়। তাহারা নিজেরা বাসা নির্মাণের জন্য পরিশ্রম করে না; ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় ও পঞ্চম স্বরে গান করে।

শুদ্ধভক্তগণও কোকিলের মত জড় কর্মী ও বৈজ্ঞানিকগণের রচিত ও আবিষ্কৃত নানা দ্রব্য ভগবানের সেবার জন্য ব্যবহার করেন। যেমন, বৈদ্যুতিক আলোক, বীজন যন্ত্র, যান-বাহন ট্রেন, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, ষ্টীমার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, লিথোগ্রাফ, সিনেমেটোগ্রাফ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু ও যন্ত্র শুদ্ধভক্তগণ নিজেরা সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়া নির্মাণ বা

আবিষ্কার করেন নাই; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যকে ভগবানের নামপ্রচারের বাহনরূপে নিয়োগ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া জাগতিক ভোগী-সম্প্রদায় ক্ষুণ্ণ হন। তাঁহারা মনে করেন, আমরা পরিশ্রম করিয়া সব করিলাম, আর ভক্তেরা তাহার ফল ভোগ করিতেছে! বস্তুতঃ ইহাতে তাঁহাদের ক্ষোভ করা উচিত নহে; বরং সর্বতোভাবে আনন্দিত হওয়াই উচিত কারণ, শুদ্ধভক্তগণ যদি তাঁহাদের ঐ পরিশ্রমের ফল-কে নামরূপী ভগবানের সেবায় অর্থাৎ ভগবানের বাণী-প্রচারে নিযুক্ত না করিতেন, তবে তাঁহাদের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ ও নিরর্থক হইত; ঐ সকল দ্রব্য কেবল ভোগীর ভোগের যজ্ঞের ইন্ধনরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদের কামাগ্নিকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিত এবং উহার নির্মাণকারিগণকেও ন্যূনাধিক সেই ফলের ভাগীদার হইতে হইত। ইহাতে কেবল জগতের জঞ্জাল বৃদ্ধি ও বিনাশের পথই প্রশস্ত হইত কিন্তু পরদুঃখদুখী সেবা-বৈজ্ঞানিক শুদ্ধভক্তগণ ঐ সকল দ্রব্যকে হরিনাম প্রচারে নিযুক্ত করিয়া উহার সর্বোৎকৃষ্টফল-অর্জনে ঐ সকল দ্রব্যের আবিষ্কারক, নির্মাতা, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক সকলকেই ন্যূনাধিক সাহায্য করিয়াছেন। শুদ্ধ ভক্তগণের কৃপায় তাঁহারাও অক্ষয় ফলের অংশীদার হইয়াছেন। ভক্তগণ শিল্প ও বিজ্ঞানকে এইরূপে হরিনাম-প্রচারে নিযুক্ত না করিলে এইরূপ সার্বজনীন ভুবন-মঙ্গল ও প্রত্যেক বস্তুর সার্থকতা-সম্পাদন বা সদ্ব্যবহার হইত না।

পূর্বদিক সূর্যের জননী নহে

যাহা হইতে প্রাণীর উৎপত্তি বা জন্ম হয়, তাহাকেই 'জননী' বা 'মাতা' বলা যায়। যে-সময়ে সেই উৎপত্তি বা জন্ম লক্ষ্য করা হয়, সেই সময় হইতেই জাত প্রাণীর বয়স গণনা করা হয়; আর যখন প্রাণী এই জগৎ হইতে চলিয়া যায়, তখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ বলা হয়।

সূর্য প্রত্যহ প্রাতে পূর্বদিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এক বালক তাহার পাঠ্য পুস্তকে 'জননী' শব্দের সংজ্ঞা পাঠ করিয়াছিল। একদিন প্রত্যূষে সে তাহার পিতার সহিত নদীর তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল—পূর্বদিকে সূর্য উদিত হইতেছে। বালকটি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—''বাবা, আমি সাহিত্য-মুকুলে পাঠ করিয়াছি—যাহা হইতে আমাদিগের জন্ম হয়, তিনিই আমাদিগের 'মাতা'। পূর্বদিক হইতে সূর্যের উৎপত্তি হইল, সেই হেতু পূর্বদিক কি সূর্যের জননী?''

বালকের পিতা পুত্রের প্রশ্নটি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন—''হরিদাস! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যে-বস্তু হইতে যাহার জন্ম হয়, সেই বস্তু তাহার 'মাতা' বটে; যেমন, তুমি তোমার মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু পূর্বদিক সূর্যদেবের 'জননী' নহেন। আমাদিগের এই চক্ষু দিয়া দেখিলে মনে হয়, সূর্য কোন বিশেষ দিক হইতে এই মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইহা তুমি বড় হইলে বুঝিতে পারিবে। আজ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, ভোর ৬।৪৫

মিনিটের সময় সূর্যের জন্ম হয় নাই, বা সন্ধ্যা ৫।৩০ মিনিটের সময় সূর্যের মৃত্যু হইবে না। সূর্য অনাদিকাল হইতে এইরূপে আলোক বিতরণ করিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকালই তাহা করিতে থাকিবে। পৃথিবীর গতির সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ দিকে তাহার উদয় ও অস্ত প্রত্যহই লক্ষিত হইতেছে। ইহা হইতে তুমি একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ লাভ করিতে পার। যাহারা ধর্মরাজ্যে বালকসদৃশ অর্থাৎ অনভিজ্ঞ তাহারা মনে করে যে, সাধারণ প্রাণিগণের মত হরি, গুরু ও বৈষ্ণবগণও কোনো বিশেষ জাতি বা কুলে, কোন বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ তাহা নহে। সূর্যের উৎপত্তি পূর্বদিকে দেখা গেলেও পূর্বদিক্‌ যেরূপ সূর্যের 'জননী' নহে, সেইরূপ কোনো বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ (চণ্ডালাদি নীচজাতি), হিন্দু, অহিন্দু প্রভৃতি কোনো জাতি বা সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া বৈষ্ণবকে সেই জাতির অন্তর্গত মনে করাও মূর্খতা। ভগবান মৎস, কূর্ম (কাছিম), বরাহ (শূকর), নৃসিংহ বা মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি মৎস্য প্রভৃতি প্রাণী বা মনুষ্য—এইরূপ মনে করাও অত্যন্ত মুর্খতা ও অপরাধ। হিরণ্যকশিপুর রাজসভার স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাই বলিয়া ঐ রাজসভার স্তম্ভটি নৃসিংহদেবের মাতা নহেন। অতএব কখনও শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে কোনো জাতিবিশেষের অন্তর্গত মনে করিও না, কিংবা ভগবানকে মনুষ্য বা প্রাণিবিশেষ বলিয়া ভাবিও না। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ঠাকুর শ্রীল হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'যবন'

নহেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি কায়স্থ নহেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মণ বংশে বা হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'সামাজিক ব্রাহ্মণ' বা 'হিন্দু' বলিলেও অত্যন্ত ভুল ও অপরাধ করা হইবে। বড় বড় জাগতিক পণ্ডিতগণও এই সকল ভুল করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি এইরূপ ভুল করিও না, এখন হইতেই প্রকৃত বিষয়টি বিচার করিতে শিক্ষা কর।''

বালকের পিতা বালককে আরও বলিলেন—''সূর্যের যেরূপ জন্ম-মৃত্যু নাই, সেইরূপ ভগবান ও তাঁহার ভক্তগণেরও জন্ম-মৃত্যু নাই। এই জন্য সূর্যের ন্যায় ভগবান্ ও ভক্তগণের উদয়কে 'আর্বিভাব' বা 'প্রকট' এবং অন্তর্ধানকে 'তিরোভাব' বা 'অপ্রকট-লীলা' বলা হইয়া থাকে।

আজ, ১৯৪০ সনের ১লা জানুয়ারী, ৬-৪৫ মিনিটের সময় সূর্যের উদয় দেখা গেলেও তখনই তাহার জন্ম হয় নাই। বৈষ্ণব ও ভগবানের সম্বন্ধেও কোনো বিশেষ তারিখে আবির্ভূত হইবার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে সূর্যের ন্যায়ই কোনো কালবিশেষে লোকলোচনে প্রকাশিত জানিতে হইবে। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করে—শ্রীচৈতন্যদেব একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা মানুষমাত্র ছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে! তিনি কোনো বিশেষ তারিখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার অনাদি কাল পূর্বেও তিনি ছিলেন, নিত্যকাল আছেন ও অনন্তকাল থাকিবেন। ভগবান ও তাঁহার ভক্তগণ ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন; কিন্তু কৃপাপূর্বক কোনো ঐতিহাসিক কালে উদিত হইয়া

ইতিহাসকে ধন্য করেন। এই কথাগুলি তুমি এখন হইতেই হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও এবং বিশ্বাস করিও। যখন তুমি ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিবে, তখন ইহা যে পরম সত্য, তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।''

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়সওয়ার

বড়দিনের সময় একটি পাঁচ বৎসরের বালক তাহার পিতার সহিত কলিকাতায় গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিল। বালকের পিতা একটি বক্সসিট ভাড়া করিয়া একটি জানালার সম্মুখে বসিয়া পুত্রের সঙ্গে ঘোড়দৌড় দেখিতেছিলেন। ১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর করিয়া কখনও যুগপৎ, কখনও বা ক্রমে ক্রমে ঘোড়সওয়ারের সহিত ঘোড়াগুলি দৌড়াইতে লাগিল। যখনই জানালার সম্মুখে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারগুলি আসিয়া পড়িত, তখনই বালক পিতাকে বলিত—''দেখ বাবা, একটা লাল ঘোড়ার জন্ম হয়েছে।'' এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘোড়াটি গবাক্ষপথ পরিত্যাগ করিলে বালকটি বলিত—''এবার লাল ঘোড়াটি মরিয়া গেল, একটা কাল ঘোড়ার জন্ম হইল।'' পরমুহূর্তেই আবার বলিত—''এবার কাল ঘোড়াটি মরিয়া গেল, একটা সাদা ঘোড়ার জন্ম হইল। আহা! সাদা ঘোড়াটি মরিয়া গেল!''

বালকের পিতা উচ্চহাস্য করিয়া বালককে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—''দূর বোকা, ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারগুলি কেহই এখন

জন্মে নাই বা মরে নাই, উহারা ঐ মাঠে অনবরত কেবল দৌড়াইতেছে। যখনই তোমার ছোটো জানালার সম্মুখে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার আসিয়া পড়িতেছে, তখনই তুমি উহাদের জন্ম হইল বলিয়া মনে করিতেছ, আর যেই মুহূর্তে উহারা ছোটো জানালাটির সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল, তখনই তুমি 'উহারা মরিয়া গেল' বলিয়া মনে করিতেছ। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার বহুপূর্ব হইতেই মাঠে আসিয়া দৌড়খেলা দেখাইতেছে।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গল্পটি বলিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন যে, যেরূপ অজ্ঞ বালক গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া একটা jockey (সওয়ার) ও ঘোড়াকে হঠাৎ দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়া মনে করে যে, সেই মুহূর্তেই ঘোড়ার জন্ম বা মৃত্যু হইল অথবা ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী প্রাতে সূর্যের উদয় ও সেইদিন সন্ধ্যায় উহার অস্ত দর্শন করিয়া মনে করে যে, ঐদিনই বুঝি সূর্যের জন্ম-মৃত্যু ঘটিল, তদ্রূপ যাঁহারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে সম্বল করিয়া ভগবান ও ভক্তাবতারের প্রকট ও অপ্রকট-সম্বন্ধে সমালোচনা করেন, তাঁহারাও তাঁহাদিগকে জন্ম-মৃত্যুরই অধীন কল্পনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বেদ, ভাগবত, পুরাণ, ভক্ত ও ভগবান—কৃপা করিয়া স্বেচ্ছায় জগতে আসেন ও জগত হইতে চলিয়া যান। নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদের অধীন ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষুদ্র গবাক্ষের মধ্য দিয়া অনবরত ভ্রমণলীলা-শীল বস্তুর দর্শনের ন্যায় তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-সম্বন্ধে বদ্ধজীব সহজে ধারণা করিতে পারে না। বেদ,

ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান নিত্যকালই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। তাঁহারা যখন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হন নাই, তখনও অন্য স্থানে প্রকটিত থাকিয়া লীলা করিয়াছেন; আবার কিছুকাল এই জগতে প্রকট থাকিয়া তাঁহাদের লীলা সংগোপনপূর্বক অন্য ব্রহ্মাণ্ডে যাইয়া লীলা করিতে থাকিবেন।

যখন যেদিকে বাতাস বয়

কোনো জমিদারের এক মোসাহেব ছিল। জমিদারের তোষামোদ করিয়া নিজে কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লওয়াই মোসাহেবটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। একদিন জমিদার মহাশয় মোসাহেবটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''আলু কী প্রকার জিনিষ বল তো?'' মোসাহেবটি অত্যন্ত আঁকুপাঁকু-ভাবে করজোড়ে জমিদার মহাশয়কে বলিল—''হুজুর, আপনিই বলুন আলু কিপ্রকার বস্তু, আমরা আপনারই মুখে শ্রবণ করি।'' তখন জমিদার মহাশয় বলিলেন—''আলু বর্তমান যুগের অতি উপাদেয় সামগ্রী।'' জমিদার মহাশয়ের এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মোসাহেবটি বলিতে লগিল—''আজ্ঞে হুজুর! উপাদেয় ব'লে উপাদেয়? অতি উপাদেয়, অতি মহান উপাদেয়, অতি সুমহান উপাদেয়! কথায় বলে—'গোল আলু'—ভাতে দিন, সিদ্ধ করুন, ভাজুন, চচ্চড়িতে দিন, রসা করুন, ঝোলে ঝালে, টকে, দমে-ডাল্নায়, কালিয়া-কোপ্তায়—সবেতেই গোল আলু চলে।

পৃথিবীতে এমন বস্তু কী আর আছে! অদ্বিতীয়,—অপ্রতিদ্বন্দ্বী!!'' তখন জমিদার মহাশয় মোসাহেবের প্রত্যুত্তরে বলিলেন—''তুমি যাহাই বল, আলু খাইতে ভাল হইলেও উহা গরম জিনিস।'' তখন মোসাহেবটি সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে লাগিল—''আজ্ঞে হাঁ হুজুর! গরম বলে গরম?—মহাগরম, ভীষণ গরম, অতি-মহা ভীষণ গরম! হুজুর! এই যে আজকাল নূতন নূতন রোগ হইতেছে, হুজুর! সে—কেবল ঐ এক গোল আলুর জন্য। পেটফাঁপা, কলেরা, ডায়রিয়া, ডায়বেটিস, থাইসিস প্রভৃতি ব্যাধিগুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? সকল রোগের মূলে জানিবেন—ঐ এক গোল আলু।''

জমিদার—আচ্ছা, বেগুন সম্বন্ধে তোমার অভিমত কী?

মোসাহেব—আজ্ঞে, আপনিই বলুন না হুজুর, বেগুন কী প্রকার?

জমিদার—বেগুন মন্দ কী? বেগুন ত' ভাল তরকারি বলিয়াই জানি।

মোসাহেব—আজ্ঞে! দেখুন দেখি, হুজুর! বেগুনের মত কি আর জিনিস আছে? দুইটা বেগুনের-ভাজা পাইলে আর চাই কি? মাখন কোথায় লাগে! ঘরে যদি আর কিছুই না থাকে, কেবল এক বেগুন থাকিলেই ভদ্রলোকের সম্মান রক্ষা হয়—পোড়ান, ভাজুন, তরকারি রাঁধুন, টকে দিন—যা খুসি তাই করুন—সকল তরকারির মধ্যেই বেগুন। তা'র মধ্যে আবার লাফা বেগুন—ভগবানের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

জমিদার—যাহাই হউক, বেগুনের মধ্যে পুষ্টিকর বস্তু নাই।

মোসাহেব—আরে রাম রাম! হুজুর! কথায় বলে—বে-গুন; ওর কোনোই গুণ নাই! গুণ থাকিলে কী আর 'বেগুন' নাম হয় হুজুর? একেবারে গোবর, গোবর! গোবরেরও তেজ আছে, বেগুন তাহার চেয়েও অধম। তারপর বুনো ওল ও কচু অপেক্ষাও বেগুনে মুখ বেশি চুলকায়! বেগুন—সমস্ত দোষেরই আকর! বেগুন বলিয়াই ত' তাহার কপালে আগুন! উহাকে পোড়াইয়া তাহার পর খাওয়া হয়!

জমিদার—তুমি ত' দেখিতেছি বেশ অদ্ভুত লোক হে! আমি যখন বলিতেছি—'আলু ভাল', তখন তুমিও বলিতেছ—'আলু খুব ভাল'; আর যখনই আমি বলিতেছি 'খারাপ', তখন তুমিও তাহাকে সবচেয়ে খারাপ তরকারি বলিতেছ। যখনই বলিলাম—'বেগুন ভাল' তখনই তোমার মুখে বেগুনের গুণের প্রশংসা আর ধরিল না; আর যখনই বলিলাম বেগুন খারাপ তখনই তুমি বেগুনকে আর কোনো সবজি-পদার্থের মধ্যেই গণ্য করিলে না। তোমার কী নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব নাই?

মোসাহেব (করজোড়ে)—আজ্ঞে, আজ্ঞে হুজুর! কৃপা করুন, মার্জ্জনা করুন, অপরাধ ক্ষমা করুন, হুজুর! তবে সত্য কথা বলিব কী? ''হুজুর! আমি আলুরও চাকর নই, বেগুনেরও চাকর নই, আমি হুজুরেরই চাকর। হুজুর যাহা বলিবেন, আমিও তাহাই বলিব হুজুর। আলুও আমাকে চাকুরি দিবে না, বেগুনও আমাকে চাকুরি দিবে না। আমি হুজুরের চাকর, হুজুরের মতেই আমার মত।''

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গল্পটি বলিয়া

Time-server (সময়-সেবক) সমন্বয়বাদিগণের চিত্তবৃত্তির কথা শিক্ষা দিতেন। কতকগুলি লোক 'যখন যেদিকে বাতাস হয়', তখন সেই দিকেই নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে নিজের মত দিয়া থাকেন। লোকের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বাহবা' পাইবার জন্য বা অর্থাদিলাভের উদ্দেশ্যে তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ কখনও মহাপ্রভুর মৌখিক ভক্ত হইয়া পড়েন, কখনও বা স্বদেশ-প্রেমিক, কখনও বারোয়ারীর পাণ্ডা, কখনও উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক,—এইরূপ বহুরূপী সাজিয়া থাকেন। ইঁহারা মূলে নির্বিশেষবাদী অর্থাৎ ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পার্ষদ ও লীলায় বিশ্বাস স্থাপন করেন না। ইঁহারা যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশংসা করেন তাহা কেবল মৌখিক অর্থাৎ অপরের নিকট নিজেকে 'ভক্ত' (?) বলিয়া জাহির করিবার জন্য। বহু লোক শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করেন, যদি শ্রীচৈতন্যের প্রশংসা না করা যায়, তবে ঐরূপ ''একশ্রেণির বহুর'' নিকট হইতে তাহাদের প্রদেয় প্রতিষ্ঠাটুকু লাভ হয় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে-সকল মতকে **গর্হণ** করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—যেমন বৌদ্ধ-মত, শঙ্করাচার্যের মত, কর্ম-জ্ঞান-যোগের মতবাদ; একমাত্র সর্বেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত **স্বতন্ত্রভাবে** অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা; ধর্ম, অর্থ,

গর্হণ—নিন্দা।

স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা—সকল দেবতাই কৃষ্ণের দাস—ইহাই গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন। দেব-দেবীগণকে কৃষ্ণের দাস-দাসী বিচার না করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের ন্যায়ই স্বতন্ত্র বা স্বয়ং ভগবান অথবা কৃষ্ণ ও অন্য

কাম ও মোক্ষ-বাসনার সাধন-সমূহ ইত্যাদি,—শ্রীচৈতন্যদেবের সে শিক্ষামৃত তাঁহারা কিছুতেই অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন না; কারণ, যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান বহু ব্যক্তি আছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য, নিরীশ্বর কপিল, বুদ্ধ, মহাবীর (জিন), কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অভক্তি-মতবাদের প্রচারকগণের তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যক স্তাবক রহিয়াছেন। যদি কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত আচার ও প্রচার করা যায়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত-সম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যায় বহুতর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে অসুবিধা ঘটে। আন্তরিকভাবে বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান এবং তাহা গ্রহণ ও অনুশীলন করিবার জন্য যাহাদের শরণাগতির অভাব, তাহারা সকল-মতেই 'হাঁ জী', 'হাঁ জী' করিয়া বাস্তব-সত্যের উপর ধামাচাপা দিয়া থাকে। এই সকল **তথাকথিত সমন্বয়বাদী** 'আলুরও চাকর নহেন, বেগুনেরও চাকর নহেন', অর্থাৎ ইহারা শ্রীচৈতন্যদেবেরও ভক্ত নহেন, শ্রীশঙ্করাচার্যরও ভক্ত নহেন, তাঁহারা একমাত্র নিজেদের ইন্দ্রিয়েরই সেবক বা সুবিধাবাদী।

এইরূপ সুবিধাবাদী সমন্বয়বাদিগণ প্রথমে মুখে বলেন—''সকল মতই ভাল'', কিন্তু শুদ্ধভক্তি-মত ভাল হইলে অন্য

দেবতাগণ একই বস্তু, কেবল নামে-মাত্র ভেদ—এইরূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করাই স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা।

তথাকথিত সমন্বয়বাদী—যাহারা প্রকৃত সমন্বয়বাদী নহে, কেবলমাত্র মুখে নিজদিগকে 'সমন্বয়বাদী' বলিয়া দাবী করে; যাহারা সৎ ও অসৎ, চেতন ও অচেতন, মায়া ও ভগবান—সব একাকার করিয়া থাকে।

মতগুলিকে যখন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের সহিত পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকে সমান আসন দেওয়া যায় না—ইহা প্রমাণিত হয়, তখন ইহারা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলেন। তখনই প্রমাণিত হয় যে, ইহারা 'আলুরও চাকর নহেন, বেগুনেরও চাকর নহেন', কেবল সুবিধাবাদ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের 'খিদমদগার'। ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের কামনারূপ চতুর্বর্গে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা আছে, কিন্তু ভগবৎপ্রেমে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-ভক্ত শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করিয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদের মধ্যে যে-সকল কপটতা আছে, তাহা জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ''আলুরও চাকর নহি, বেগুনেরও চাকর নহি'' গল্পটি উল্লেখ করিয়া অনেক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ শিক্ষা দিতেন—

''প্রভু বলে,—''ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায় ॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি', দন্তে ॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায় ॥
'ভক্তি হৈতে বড় আছে,—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে ॥''

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৮-১৯১

ভাড়াটিয়া কথক, পাঠক, বক্তা, লেখক, সাহিত্যিক প্রভৃতি সুবিধাবাদি-ব্যক্তিগণের হরিবিমুখ জনগণের মনোরঞ্জন করিয়া নিজ নিজ সুখ-সুবিধা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা যে ভগবদ্‌ভক্তি নহে, তাহাও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্বোক্ত গল্পটির দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়ান

এক নির্বোধ বালক মনের সুখে ন্যাড়া ছাদের উপর ঘুড়ি উড়াইতেছিল। ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে বালকটি এতদূর প্রমত্ত হইয়াছিল যে, তাহার আর দিক-বিদিক-জ্ঞান ছিল না। তাহার সমবয়স্ক বালকগণও ঐ বালকটিকে খুব উৎসাহিত করিতেছিল। ইহাতে ঐ বালক এতটা বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে যে তাহার একটি পা ছাদের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। পর মুহূর্তেই সে ছাদ হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইবে,—ইহাও কেহই তাহাকে বুঝাইল না। অন্যান্য বালকগুলি ঘুড়ি উড়াইবার মজা দেখিয়া হাততালি দিয়া বালকটিকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল; কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে সতর্ক করিল না।

এমন সময়ে ভাগ্যক্রমে সেই পথ দিয়া একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, বালকটি ঘুড়ি

উড়াইতে উড়াইতে এক একবার ন্যাড়া ছাদের বাহিরে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, আর একটুকু বাহিরে আসিলেই তৎক্ষণাৎ উহার মৃত্যু ঘটিবে। ভদ্রলোকটি তখনই কাহারও কথা না শুনিয়া ছাদের উপরে চলিয়া গেলেন এবং বালকের ও তাহার বন্ধুবর্গের নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বালকটির হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া আনিলেন, নাটাই কাড়িয়া লইলেন এবং ঘুড়ির সূতা কাটিয়া দিলেন। ভদ্রলোকটিকে উক্ত বালক ও তাহার সঙ্গিগণ অশ্রাব্য ও অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। তাঁহাকে 'চোর' 'দস্যু', 'গুণ্ডা', 'বদমাইস' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া কত কী বলিল! আদুরে পিতা-মাতাকে বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবে—এই বলিয়াও শাসাইতে লাগিল, এমনকি, তাঁহাকে প্রহার করিতে পর্যন্ত উদ্যত হইল। এই সকল সহ্য করিয়াও সেই সদাশয় ব্যক্তি বালককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন।

জগতের লোক প্রেয়ঃ অর্থাৎ যাহা আপাতত ভাল লাগে তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করে। আপাত তিক্ত হইলেও যাহা শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরিণামে মধুর, তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। জগতের বন্ধুবর্গও আমাদিগকে মৃত্যুর পথের পথিক করিবার জন্য আপাত-প্রীতিপ্রদ কার্যেই আমাদিগকে উৎসাহিত ও প্রমত্ত করিয়া তোলে। এই সময়ে যদি ভাগ্যক্রমে প্রকৃত পরদুঃখে দুঃখী কোনো সাধুর সাক্ষাৎকার হয় তবে তিনি কৃপা-পূর্বক আমাদিগকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জোর করিয়া আমাদিগকে তিক্ত ঔষধ সেবন অর্থাৎ অপ্রিয় কঠোর অথচ বাস্তব

সত্যকথা শ্রবণ করাইয়া থাকেন। অতএব সাধুগণের উপদেশ আপাত-অপ্রিয় তিক্ত মর্মভেদী হইলেও তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের নিত্য-মঙ্গল বরণ করা উচিত।

'আমাকে মারতে পারলে না!'

এক জমিদারের এক চাকর ছিল। চাকরটি প্রত্যহই প্রত্যেক কার্যে নানাপ্রকার ত্রুটি করিত। কেহ ত্রুটি দেখাইয়া দিলে কিছুতেই নিজের ভুল বা অন্যায় স্বীকার করিত না বরং এতটা একগুঁয়েমি করিত যে, তাহার কার্যই ঠিক হইয়াছে এবং যিনি ত্রুটি দেখাইতেছেন, তিনিই কার্য করিতে জানেন না—এইরূপ মত প্রকাশ করিত! কোনো দিনই চাকরটি নিজের ভুল স্বীকার করে না দেখিয়া একদিন স্বয়ং মনিব চাকরটিকে তাঁহার কার্যে ত্রুটি দেখাইয়া দিলেন। তথাপি চাকরটি ত্রুটি স্বীকার করিল না। তখন জমিদারবাবু চাকরটিকে একটি চপেটাঘাত করিলেন। চাকরটি মার খাইয়াও বলিল,—''আমাকে মারুন ত' দেখি, আপনার কত শক্তি!'' যত মার খাইতে লাগিল, ততই আরও বলিতে লাগিল,—''আমার গায়ে হাত তুলুন ত' দেখি।'' এই-রূপে পুনঃপুনঃ মার খাইতে খাইতে যখন ভূপতিত হইল, তখনও বলিতে লাগিল,—''আমাকে মারুন ত' দেখি।'' দর্শকগণ সকলে বলিতে লাগিলেন—'তুমি এত মার খাইতেছ, তথাপি তুমি

এখনও বলিতেছ—'আমাকে মারুন ত' দেখি!' চাকরটি তখন বলিয়া উঠিল—''আচ্ছা, আমার ছেলেকে মারুন ত' দেখি!'' মণিব চাকরের ছেলেটিকেও একবার কোমলভাবে প্রহার করিয়া চাকরের একগুঁয়েমি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন। তখন আবার চাকরটি বলিল—''আচ্ছা আমার স্ত্রীকে মারুন ত' দেখি।'' মনিব স্ত্রীলোকের মর্যাদা নষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া ভৃত্য বলিয়া উঠিল—'দুয়ো, মারতে পারলে না!'

কুতার্কিক, নাস্তিক, **পাষণ্ড**, **কর্মজড়**, মায়াবাদী, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণের কুমত-সমূহকে কৃষ্ণতত্ত্ববিদগণ পুনঃপুনঃ **খণ্ডন** করিলেও উহারা তাহাদের একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করে না। তাঁহাদের কুসিদ্ধান্তের অস্থিরতা ও ভ্রম হাতে-কলমে দেখাইয়া দিলেও কিছুতেই নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিতে চাহে না। মায়াবাদ, কর্মজড়-স্মার্তমত প্রভৃতিকে জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচার্য্যগণ অসংখ্যভাবে খণ্ডন করিলেও ঐ সকল মতবাদিগণ বলিয়া থাকে—''আচার্যগণ ঐ সকল মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই।''

৯০❀৩

পাষণ্ড—যাহারা নারায়ণের সহিত ব্রহ্মা, রুদ্র বা শক্তি প্রভৃতি দেবদেবীগণকে সমান মনে করে; তাহারা ভক্তি, ভগবান ও ভক্তকে নিত্যবস্তু জ্ঞান করে না।

কর্মজড়—কর্মের দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি জড়তা লাভ করিয়াছে। যাহারা কর্মকে পরমেশ্বর মনে করে।

খণ্ডন—যুক্তির দ্বারা বিরুদ্ধ মত নিরসন।

ডাক্তারের ছুরি

কোনো গ্রামে অমর নামে একটি বালক ছিল। অমরের পিঠে একটি ফোঁড়া হওয়ায় সে নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইল। বালকটির ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার মাতা, পিতামহী, মাতামহী, মাসিমাতা, পিসিমাতা প্রভৃতি আত্মীয়াগণ বালকের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ফোঁড়ার উপর তালপাতার পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, কখনও বা ফুঁ দিয়া যন্ত্রণার আপাত উপশম করিবার চেষ্টা করিলেন। একজন প্রতিবেশী পরামর্শ দিলেন যে, বালককে এরূপ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিবার ঔষধ ব্যবহার করাই সমীচীন। আর একজন পরামর্শ দিলেন—ঐরূপ সাময়িকভাবে অজ্ঞান করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার চিরনিবৃত্তি হইবে না। অতএব বালককে আর বেশি কষ্ট পাইতে না দিয়া অতি শীঘ্র তাহার প্রাণ বিনাশ করিবার ব্যবস্থা করা হউক। প্রাণ আছে বলিয়াই যন্ত্রণার অনুভূতি হইতেছে, জীবন না থাকিলে কে আর যন্ত্রণা অনুভব করিবে?—রোগ ও রোগী উভয়েই শান্তি পাইবে।

বালকের বুদ্ধিমান পিতা ঐ-সকল তথাকথিত দরদিগণের কাহারও কোনও পরামর্শ না শুনিয়া একজন বিজ্ঞ চিকিৎসককে ডাকাইলেন। চিকিৎসক অস্ত্রোপ্রচারের পরামর্শ দিলে, বালকের মাতা, মাতামহী প্রভৃতি বালকের সহিত একযোগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অশিক্ষিত বালক চিকিৎসককে অশ্রাব্য ভাষায় গালি

দিতে দিতে বলিল,—“তুমি আমাকে খুন করিতে আসিয়াছ! এখনই আমাদের বাড়ি হইতে চলিয়া যাও। এখনই তোমাকে পুলিশে ধরাইয়া দিব! আগে নিজের পিঠে ছুরিটি বসাও না কেন? যাও, তোমার নিজের ছেলের গায়ে গিয়ে ছুরি বসাও, বরং আমি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিব, তথাপি তোমার হাতে মরিব না।”

চিকিৎসক বালকের এইপ্রকার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার বাহুদেশে অস্ত্রোপচার করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বালকের সমস্ত যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইল। ক্রমশঃ কয়েক দিনের মধ্যেই বালক সুস্থ হইয়া উঠিল।

সদবৈদ্যের ন্যায় সদ্‌গুরু ও সাধুগণও এইরূপেই জীবের অনর্থের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে দুষ্ট মনের গ্রন্থিকে তীব্র উক্তি—উপদেশের দ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন, কিন্তু রোগী তাহা কিছুতেই চাহে না—চিকিৎসককে জল্লাদের ন্যায় ‘শত্রু’ মনে করিয়া সাধুর প্রতি যথেচ্ছ কটুবাক্য প্রয়োগ করে। যাহারা অস্ত্রোপচারের আপাত-ক্লেশে ভীত হইয়া ব্যাধি পোষণ করিয়া রাখিবার জন্য দরদ দেখায়, তাহাদিগকেই আত্মীয় ও বন্ধু বলিয়া মনে করে। কেহ কেহ আবার বন্ধুর নামে নির্বিশেষবাদের আশ্রয় লইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এই বালকের উদাহরণে তাহার মাতা, মাতামহী প্রভৃতি আত্মীয়াগণ বালকের শান্তি-কামনায় প্রেয়ঃ বা ভোগের পক্ষ সমর্থন করেন। আর সাময়িকভাবে অজ্ঞান করিয়া রাখিবার বা আত্মহত্যা করাইবার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ নির্বিশেষবাদের পক্ষ সমর্থন

করেন। বস্তুতঃ ইহাদের কোনোটিতেই জীবের নিত্যমঙ্গল-লাভ হয় না। সাধুগণের উক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ও অসদ্‌-বিষয়ে আসক্তিসমূহ ছিন্ন হইলেই জীবের স্বরূপের উপলব্ধি হয়। তখনই জীব ভগবদ্‌-সেবায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন,—ইহাই নিত্য **পরম শান্তি**-লাভের একমাত্র উপায়।

“তুম্ ভি চুপ্ হাম্‌ভি চুপ্”

কোনো গ্রামের এক চৌকিদারের চুরি করিবার স্বভাব ছিল। চুরি করিলে সাধারণ লোকেরই শাস্তি হইয়া থাকে, চৌকিদারের ত’ কথাই নাই। চৌকিদারী কাজটি যাহাতে বজায় থাকে, অথচ চুরিবিদ্যা-দ্বারা কিছু উপরি রোজগারও হয়—এই লোভে চৌকিদার-রাত্রিতে খুব হাঁক-ডাক করিত এবং নিজে চুরি করিয়া খাজা-বোকা লোকগুলিকে ‘চোর’ বলিয়া ধরাইয়া দিত।

এক গভীর অমাবস্যা-রাত্রিতে চৌকিদার কিছু বড় রকমের চুরি করিবে সঙ্কল্প করিয়া কোনও ধনী লোকের বাড়িতে গিয়াছে। এমন সময় আর একটি চোরও চুরি করিবার উদ্দেশ্যে সেই বাড়িতেই প্রবেশ করিয়াছে। চৌকিদারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় চতুর চোর চৌকিদারকে চুপে চুপে বলিল,—“তুম্‌ভি চুপ্, হাম্‌ভি

পরম শান্তি—নিত্যধামে ভগবানের নিত্য সেবানন্দ, সাময়িক ক্লেশের নিবৃত্তিমাত্র নহে। ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজাত যে আনন্দ, তাহাই পরাশান্তি।

চুপ্, অর্থাৎ তুমিও চুপ কর, আমিও চুপ করিয়া থাকিব। উভয়েই চুপ থাকিলে গৃহস্থ আর জাগিতে পারিবে না, আমরা স্বচ্ছন্দে চুরি করিতে পারিব। চোরাই মালগুলি আমরা দুজনেই ভাগ করিয়া লইব। আর যদি তুমি আমাকে 'চোর' বলিয়া ধরাইয়া দাও, তাহা হইলে আমিও লোকের নিকট বলিয়া দিব যে চৌকিদারও চুরিতে গিয়াছিল। আমি ধরা পড়িলে ক্ষতি কী? কিন্তু তুমি ধরা পড়িলে চিরকালের জন্য তোমার চাকরিটি যাইবে, আর অপমানের সীমা থাকিবে না। চুরি করাই আমার ব্যবসায়; সুতরাং আমি কিছুদিন জেল খাঁটিয়া আবার সেই কার্য করিতে পারিব, কিন্তু একবার তোমার চাকরি গেলে তুমি আর ফিরিয়া পাইবে না।'' এই বলিয়া চতুর চোরটি গৃহস্থের বাড়ি হইতে অনেক জিনিস চুরি করিয়া আনিল এবং চৌকিদারকে সামান্য জিনিষ দিয়া বেশির ভাগ জিনিস নিজে লইয়া সরিয়া পড়িল। উভয়ের মধ্যে এইরূপ চুক্তিতে গৃহস্বামীই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

ধর্মজগতে প্রায়ই এইরূপ ''তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপ'' নীতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা নিষ্কপটভাবে শুদ্ধভক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহারা **ধর্মকামী হইয়া সূর্যদেবতার, অর্থকামী হইয়া গণদেবতার** (গণেশের), **কামকামী হইয়া শক্তি দেবীর** (কালী, দুর্গা প্রভৃতির) **মোক্ষকামী হইয়া রুদ্র-দেবতার** (শিবের) ও **কর্মফলকামী হইয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর** পূজার অভিনয় করে। ইহারা বলিয়া থাকে, যে-কোনো একটি দেবতার পূজা করিলেই অভীষ্ট লাভ হইতে পারে, এমনকি, তেত্রিশকোটি দেবতার যে-কোনো একজনের, কর্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি যে-

কোনো একটি পথের, অধিক কী নাস্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও পূর্ণতা লাভ হইতে পারে। কোনও ধর্মেরই সমালোচনা করা উচিত নহে। কোনো ধর্মবিশেষ বা দেবতাবিশেষকে শ্রেষ্ঠ বলিলে গোঁড়ামি হইয়া যায়। সব দেবতাই সমান, সকল মতই এক। তুমি অন্য ধর্মের সমালোচনা করিও না, অপরেও তোমার ধর্মের সমালোচনা করিবে না। ''কর্ম, জ্ঞান বা যোগ হইতে ভক্তি বড়—এ কথা বলিও না। অন্য দেবতা হইতে বিষ্ণু বড়, বা বিষ্ণুই সকলের ঈশ্বর,—এ কথা বলিও না, আমরাও ভক্ত ও বৈষ্ণবের সমালোচনা করিব না'' ধর্মরাজ্যে পরস্পর এইরূপ চুক্তি করিয়া অনেকে শান্তি কামনা করে। যদিও গীতায় ''সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ''—(১৮-৬৬) অর্থাৎ সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ''সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ''—(১৮-৬৪) অর্থাৎ তোমাকে সর্বাপেক্ষা গোপনীয় উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, তুমি আমার ভক্ত হও, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; যদিও বেদে 'অগ্নিঃ—অধমঃ, বিষ্ণুঃ—পরমস্তদন্তরা অন্যদেবতাঃ'' অর্থাৎ অগ্নি নিকৃষ্ট, বিষ্ণু সর্বোৎকৃষ্ট ও তাঁহার মধ্যবর্তী অন্য দেবতা, ইত্যাদি উক্তি সমূহে বিষ্ণুর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে, তথাপি ''অপরের সমালোচনা করিও না। তুমিও চুপ থাক, আমিও চুপ থাকিব।''—এইরূপ চুক্তি হইতেই আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফল এই হইতেছে যে, গৃহস্থগণ অর্থাৎ যাহারা ধর্মের সংসার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ধনে-প্রাণে মারা যাইতেছে, প্রকৃত সত্য জানিতে পারিতেছে না এবং প্রেম-ধন

হইতে চিরবঞ্চিত হইতেছে। যাহারা এইরূপ ''তুম্ভি চুপ্ হাম্ভি চুপ্'' নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা চিরকাল বঞ্চিত হইয়াছে ও হইবে, কিন্তু যাহারা হরিভজন করিতে পারিতেন, তাঁহারাও বঞ্চিত হইতেছেন।

''তুম্ভি চুপ্, হাম্ভি চুপ্'',—এই পরামর্শ প্রথমতঃ সেই ব্যক্তির নিকট হইতেই উত্থাপিত হয়—যে ব্যক্তি নিজেই দোষী, আর অপর দোষী ব্যক্তিও পাছে তাহার ছিদ্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহার সম্মানের লাঘব হয়—এই ভয়ে ঐ চুক্তি স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার কোনও খুঁৎ নাই, যিনি সৎসাহসী, নির্ভীক, বলবান ও সত্যপ্রিয়, যিনি সত্য অপেক্ষা লোকপ্রিয়তাকে বড় মনে করেন না, তিনি কখনও ঐরূপ চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করেন না।

জগতের বহু লোকই সত্য গ্রহণ করিবে না, অথচ সত্যগ্রহণ ব্যতীত মঙ্গলও হইবে না। যিনি আত্মমঙ্গলকামী তিনি সংখ্যাধিক্য, গণ-মত, লোকপ্রিয়তা, তথাকথিত শান্তি, নির্ব্বিবাদ ও নির্ব্বিরোধে পৃথিবীতে বা সমাজে বাস,—এই সকলের দিকে না তাকাইয়া নির্ভীক-কণ্ঠে সত্যকথা আচার ও প্রচার করেন। তিনি তথাকথিত সমন্বয়বাদরূপ বহির্ম্মুখ **'গণবাদ'**কে আদর না করিয়া যাঁহারা ভগবানের জন, সেই শুদ্ধভক্তগণের উপদেশ ও শাস্ত্রের বাণীর অনুসরণ করেন।

❀

গণবাদ—জনসাধারণের মতবাদ।

ডুড্ও খা'ব টামাকও খা'ব

বিধানপুরের জমিদারের এক গুণধর পুত্র ছিল। পুত্র অনেক প্রকার বদভ্যাসের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই তামাক খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিল। পিতার দেখাদেখি বাল্যকালেই রূপার গড়গড়াতে লক্ষ্ণৌ, গয়া, বিষ্ণুপর প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট মিঠা—কড়া অম্বরী তামাক পান না করিতে পারিলে বালক পৃথিবী অন্ধকার দেখিত। এইরূপ অপরিপক্ক বয়সে অত্যধিক তামাক সেবন ও নানা প্রকার বদভ্যাসের ফলে বালকের যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয়। জমিদারবাবু বড় বড় চিকিৎসক আনাইয়া বালকের চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করাইলেন। সকল সুচিকিৎসকই এক বাক্যে বলিলেন—''বালক একেবারেই তামাক সেবন করিতে পারিবে না। উহা তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য, আর তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিতে হইবে।''

বালক চিকিৎসকগণের ব্যবস্থার মধ্যে দুগ্ধ-পানের কথাটি শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইল। কিন্তু যখন শুনিল যে, সে তামাক স্পর্শ করিতে পারিবে না, তখন চিকিৎসকগণের নিকট বলিল—''আমি ডুড্ও খা'ব টামাকও খা'ব। অর্থাৎ দুগ্ধ পান করিয়া যে ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় তাহাও চাই, আর তামাক সেবন করিয়া সে সুখটি হয় তাহাও পূর্ণমাত্রায় চাই। চিকিৎসকগণ বলিলেন—''তামাক কিছুমাত্র গ্রহণ করিলেও তুমি দুগ্ধসেবনের ফল পাইবে না।''

যাহারা মনে করে—বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গও (অসৎসঙ্গও) করিব, আর হরিভজনও করিব, তাহারাও "ডুড়ও খা'ব টামাকও খা'ব" নীতির অনুসরণকারী। অনেকে হরিকীর্ত্তনোৎসব প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উৎসব মনে করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় রাজ্য হইতেই আনন্দ লুটিবার জন্য চেষ্টাযুক্ত। ইহাদের কোনও কালে মঙ্গল হয় না। অনেকে বহু হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, বহু সাধন-ভজন ও সেবার অভিনয় করিয়াও ফল লাভ করিতে পারে না। তখন তাহারা ভক্তির প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সৎসঙ্গের ফল পাইতে হইলে অসৎসঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৮।১৬

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই হরিভজন। যাহারা হরিভজনকেও ইন্দ্রিয়তর্পণের একটি আশ্রয়স্থান-বিশেষ মনে করে, তাহারাই দুইদিকের মজা লুটিতে চাহে। কিন্তু একসঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না। অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে, পরিবর্জন না করিলে কখনও হরিভজন উন্নতি বা ফল লাভ করা যাইতে পারে না। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"ততো দুঃখসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান।"

বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গকে বরণ করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন—

কুটীনাটী ছাড়, মন করহ সরল।
গৌরভজা লোকরক্ষা একত্র নিষ্ফল ॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি ॥
জগাই বলে, যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদীপারের দুর্দ্দশা লাভিবে ॥

৪০❁৫০

কূপমণ্ডূক-ন্যায়

সমুদ্র হইতে কিছু দূরে একটি কূপ ছিল, তাহাতে একটি ভেক (মণ্ডূক) বাস করিত। কূপেই উহার জন্ম হইয়াছিল এবং জন্মের পর হইতেই সে ঐ কূপেই বাস করিত। সে কখনও কূপের বাহিরে যায় নাই; তথাপি সে নিজেকে সর্বজ্ঞ বলিয়া মনে করিত।

মণ্ডূকটি কূপের জলে লম্ফ-ঝম্প দিয়া বেড়াইত ও মনে মনে ভাবিত, সে-ই ঐ কূপের একছত্র মালিক বা জমিদার;—শুধু কূপের মালিক নহে, পৃথিবীর মালিক—সম্রাট!

একদিন সমুদ্রের একটা ভেক বেড়াইতে বেড়াইতে সেই কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ও কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। কূপের ভেকটি মনে করিল, আজ তাহার নিকট একটা মস্ত

শিকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু লাফ দিয়া শিকারের উপর পড়া-মাত্রই সে দেখিতে পাইল যে, উহা তাহারই মত আর একটি ভেক, কিন্তু ভেক হইলেও তাহা হইতে একটু পৃথক। কূপের ভেকটি সমুদ্রের ভেককে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

সমুদ্রের ভেক—সমুদ্র হইতে।

কূপের ভেক—সমুদ্র আমার কূপ হইতে কতটা ছোটো?

সমুদ্রের ভেক—সমুদ্রের সহিত কূপের তুলনাই হয় না।

কূপের ভেক—এত বড়? ইহা বলিয়া সে এক লম্ফ দিল।

সমুদ্রের ভেক—তুমি আর কত বড় লম্ফ দিতে পারিবে! সাগর তোমার কূপ হইতে অনেক বড়।

তখন কূপের ভেকটি কূপের এক দিক হইতে অন্য দিক পর্যন্ত লম্ফ দিয়া বলিল,—ইহা হইতে বড় আর কিছুই থাকিতে পারে না।

তখন সমুদ্রের ভেক বলিল,—তুমি এই কূপ ছাড়িয়া একটু উপরে উঠিয়া দেখ,—সাগর কত বড়।

তখন কূপের ভেক বলিল,—ইহা তোমার গোঁড়ামি। সাগর খুব বেশি বড় হইলে না হয় আমার কূপের সমান হইবে। আমার মন তোমার মনের মত এত সংকীর্ণ নহে যে নিজের জিনিষকেই সর্বাপেক্ষা বড় বলিব। তোমার সাগরও যত বড়, আমার কূপও তত বড়; কারণ, উভয় স্থানেই জল পাওয়া যায়। তুমি নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য গোঁড়ামি করিয়া সাগরকে বড় বলিতেছ।

তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ প্রথমে নিজ-নিজ মতকে সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে, কিন্তু বিচারে ও যুক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে বলিয়া থাকে— প্রেমভক্তিকে খুব বেশি হইলে কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির সমান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু ইহারা মনে করে, কেবলাদ্বৈত-মতই শ্রেষ্ঠ; ভক্তির কথা অনেক নীচের স্তরের কথা! ভক্তগণ গোঁড়ামি করিয়া ব্রহ্মানন্দ হইতে প্রেমানন্দকে বড় বলিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—

> কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
> ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৭।৯৭

অর্থাৎ কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সমুদ্রের আস্বাদন হয়, 'ব্রহ্মানন্দ' তাহার নিকট খালের অল্প জল বা গোষ্পদের (গরুর ক্ষুদ্র পদচিহ্নে যে গর্তটুকু হয়, তাহাতে যে সামান্য জল থাকে, তাহার ন্যায়)। গরুর পদচিহ্ন জাত গর্তের জলের সহিত অতল সমুদ্রের জলের যেরূপ তুলনা হয় না, 'ব্রহ্মানন্দে'র সহিত প্রেমানন্দেরও সেইরূপ তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু যাহাদিগের কূপমণ্ডূকের ন্যায় প্রবৃত্তি তাহারা মনে করে,—ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা বড় আবার কী আছে? প্রেমানন্দকে অতুলনীয় বলা কেবল গোঁড়া-ভক্তদের গোঁড়ামি বা অতিস্তুতি মাত্র। যদি তথা-কথিত সমন্বয়বাদিগণ কোনোদিন কূপমণ্ডূকতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রেমিক ভক্তের কৃপা লাভ করিতে পারে, তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে,

প্রেম-সমুদ্রের সহিত গোষ্পদরূপ ব্রহ্মানন্দের তুলনাই হইতে পারে না। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথমতঃ **ব্রহ্মানন্দে** মগ্ন থাকিলেও পরে **প্রেমানন্দে** আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আত্মারাম সনকাদি মুনিগণ আত্মারামতা পরিত্যাগ করিয়া পরে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অদ্বৈত-পথ পরিত্যাগ করিয়া **কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়াছিলেন। অতএব কূপমণ্ডূকের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া **ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর** অনুসন্ধান করাই সকল জীবের প্রধান কর্তব্য।

ꕥ

ব্রহ্মানন্দ—জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রেমানন্দ—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া ভক্তগণ যে আনন্দ লাভ করেন।

কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু—কৃষ্ণপ্রেমের যে আনন্দ, তাহা অনন্ত, অপার, অতল ও নবনবায়মান চমৎকারিতাযুক্ত বলিয়া তাহাকে সিন্ধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—ভক্তি বা সেবারস অর্থাৎ প্রেমই অমৃত, তাহার সিন্ধু। নানা লহরী বা নবনবায়মান বিচিত্রতা পূর্ণ।

কৈমুতিক-ন্যায়

সংস্কৃত ভাষায় 'কিমুতি' (কিম্+উত) এই অব্যয় পদ্যটি হইতে 'কৈমুতিক' (কিমুত+ষ্ণিক) শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অধিক আর কী?'—এরূপ অর্থে 'কিমুত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যে পাঁচ মন ভার বহন করিতে পারে, সে অবশ্যই পাঁচ সের বহন করিতে পারিবে,—ইহা আর তাহার পক্ষে অধিক কথা কি?—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে 'কৈমুতিক ন্যায়ে'র প্রয়োগ হয়।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী-প্রভু 'কৈমুতিক-ন্যায়ে'র প্রয়োগ করিয়া একটি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই উপদেশটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনেক সময়ই বলিতেন। যাহার এক কোটি টাকা আছে, তাহার এক পাই, এক পয়সা, এক টাকা ও এক লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই আছে। ইহা আর পৃথক করিয়া বলিতে হয় না। সেইরূপ যাঁহার বৈষ্ণবতা আছে, তাঁহার ব্রাহ্মণতা, যোগিত্ব প্রভৃতি নিশ্চয়ই আছে; ইহা আর পৃথক করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা মনে করে, কোনো ব্যক্তি বৈষ্ণব বটেন, কিন্তু তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ নহেন; অথবা কেহ ভক্ত বটেন, কিন্তু **ব্রহ্মজ্ঞ** নহেন, তাহাদিগের বিচার এই যে কোটিপতির শত-মুদ্রা বা সহস্র-মুদ্রা নাই।

এক তত্ত্ববস্তুই ভগবান পরমাত্মা ও ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন।

ব্রহ্মজ্ঞ—যিনি ব্রহ্মকে জানেন।

তত্ত্ববস্তু—পরমেশ্বর।

একই বস্তু দর্শনকারীর দর্শনের স্থান-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কেহ একটি পর্বতকে বহু দূর হইতে দেখিলে একটি উচ্চ স্তূপ-মাত্র দর্শন করে, তাহাতে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পায় না; আবার পর্বতের ঠিক নীচে দাঁড়াইয়া পর্বতকে দেখিলে তাহাতে উচ্চ-নীচ প্রস্তরের সমাবেশ ও নানাপ্রকার বৃক্ষাদি দেখিতে পায়; আবার পর্বতের উপরে আরোহণ করিয়া পর্বতকে দেখিলে নানা প্রকার বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, প্রাণী, প্রস্রবণ প্রভৃতি সমস্তই বিশেষভাবে দেখিতে পায়, তদ্রূপ যাঁহারা দূর হইতে ভগবানের অঙ্গের জ্যোতিঃ মাত্র দর্শন করেন, তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে, যাঁহারা আংশিকভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা তাঁহাকে পরমাত্মারূপে এবং যাঁহারা পূর্ণভাবে তাঁহার বিশেষত্ব দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা ভগবদ্‌রূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এই তিন প্রকার প্রকাশ একই বস্তুর হইলেও ঐ প্রকাশ-সমূহের মধ্যে তারতম্য অর্থাৎ অসম্যক, আংশিক ও পূর্ণ-প্রকাশের কথা আছে। অতএব ভক্তি চক্ষুদ্বারা ভগবদ্‌রূপ দর্শনের মধ্যে সমগ্র দর্শনই অন্তর্ভুক্ত আছে। এইজন্য ভগবদ্‌ভক্তে ব্রাহ্মণত্ব, যোগিত্ব প্রভৃতি কোনো গুণেরই অভাব নাই। ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলা যাইবে, ইহা আর অধিক কথা কী?

৪০❀৫৩

গোময় পায়সীর ন্যায়

কোনো কোনো মূর্খ ব্যক্তি কুযুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়া থাকে যে 'গোময়' ও 'পায়স'—একই জাতীয়। যখন দুগ্ধ ও গোময় উভয়ই গরুর শরীর হইতে নির্গত হয়, তখন উভয়কে কেনই বা একই জাতীয় বলা হইবে না? এমনকি, কোনো কোনো মূর্খ ব্যক্তি গোময়কে দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বস্তুবিশেষ বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

গোময় ও পায়সকে এক জাতীয় মনে করার ন্যায়, বৈষ্ণবের কৃপা ও বঞ্চনাকে, বৈষ্ণবের হরিভজন-পরায়ণ পুত্র ও হরিভজনবিমুখ পুত্রকে, সদ্‌গুরুর প্রকৃত শিষ্য ও শিষ্য-নামধারী কপট ব্যক্তিকে এক মনে করাও মূর্খতা ও বিড়ম্বনা। শ্রীল অদ্বৈতচার্য প্রভুর পুত্র একান্ত গৌরভক্ত শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও অন্যান্য যে সকল পুত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারের বিরোধ করিয়াছেন, এই উভয় শ্রেণিই বাহ্য-দৃষ্টিতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 'পুত্র' বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহাদিগের দ্বারা একই আদর্শ প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছিদ্রানুসন্ধানকারী, 'গুরুর উপর গুরুগিরি' করিবার দাম্ভিকতা-যুক্ত, নির্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরী বাহ্য-দৃষ্টিতে একই গুরুর শিষ্য বলিয়া পরিচিত থাকিলেও উভয়ের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক।

সদ্‌গুরু বা মহাভাগবত বৈষ্ণব শিষ্যকে শাসন করিয়া কৃপা করেন, আবার অন্যাভিলাষী শিষ্য-নামধারী ব্যক্তিকে অর্থ ও সম্মান দিয়া বঞ্চনা করেন। কিন্তু উহা একই গুরুদেবের নিকট

হইতে প্রকাশিত হইলেও উভয়ের ফল সম্পূর্ণ পৃথক।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি একই শাস্ত্রে লিখিত থাকিলেও ভক্তির ফল—'প্রেম' অর্থাৎ চরম মঙ্গল-লাভ, কর্মের ফল—ভোগের জালে বন্ধন-লাভ, আর জ্ঞান ও যোগের ফল—আত্মার বিনাশ। যাহারা কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগকাণ্ডকে ভক্তির সহিত সমান বলিয়া মনে করে, বৈষ্ণবের বঞ্চনা ও কৃপাকে এক জাতীয় বিচার করে, অথবা শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট শিষ্য ও অন্যাভিলাষী শিষ্য নামধারী কপট ব্যক্তিকে সমান মনে করে, তাহাদিগের বিচার 'গোময়-পায়সীর ন্যায়ে'র বিচার অর্থাৎ তাহারা গোবরকে পায়স মনে করিয়া থাকে।

বকবন্ধন-ন্যায়

কোনো এক ব্যক্তি একটি বক ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সে মনে মনে বক ধরিবার একটি কৌশল স্থির করিল। সে ভাবিতে লাগিল—''বকগুলি বড়ই চঞ্চল, সুতরাং উহাদিগকে সহজে ধরা যাইবে না। যখন উহারা কোনো জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হইবে, তখন উহাদিগের কোনো একটির মস্তকে ঘৃত ঢালিয়া দিব। সূর্যের উত্তাপে ঐ ঘৃত গলিয়া বকের চোখে লাগিলে বক নিশ্চয়ই অন্ধ হইয়া যাইবে এবং উহাকে অনায়াসেই ধরিতে পারিব।'' এইরূপ কৌশল হাস্যাস্পদ ও মূর্খতা-জ্ঞাপক। কারণ, বক ধরা পড়িলে

তাহার মস্তকে ঘৃত ঢালিবার আর কোনো প্রয়োজন নাই। আর বক যদি ধরা না পড়ে, তাহা হইলে উহার মস্তকে ঘৃত স্থাপন করিবার চেষ্টাও বাতুলতা-মাত্র।

কতকগুলি লোক ধ্যানাদি কৃত্রিম সাধনের দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। চঞ্চল মন যদি ধ্যানই করিতে পারিত, তবে আর তাহাকে বশীভূত করিবার প্রয়োজন কী? অস্থির চিত্তে কখনও ধ্যান হয় না। আর অস্থির মন যদি ধ্যান করিতে না-ই পারে, তহে তাহা দ্বারা ধ্যানের চেষ্টা করাইবার প্রয়াসও বৃথা সময়ক্ষেপ-মাত্র।

কফোণি-গুড়-ন্যায়

এক লোভী ব্যক্তি কোনো মুদি-দোকানে যাইয়া কিছু গুড় প্রার্থনা করিল। কিন্তু মুদি বিনা-মূল্যে ঐ ব্যক্তিকে গুড় দিতে স্বীকৃত হইল না। তখন ঐ ব্যক্তি গুড় সংগ্রহ করিবার জন্য একটি উপায় স্থির করিল। দোকানের সম্মুখে কতকগুলি গুড়পূর্ণ ভাণ্ড সজ্জিত ছিল। যেন কোনো একটি ভাণ্ডের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই ভাব দেখাইয়া ঐ লোভী ব্যক্তি তাহার হাতের কনুইটি গুড়পূর্ণ ভাণ্ডের মধ্যে ডুবাইয়া দিল। হাত দিয়া গুড় উঠাইতে গেলে দোকানদার দেখিয়া ফেলিবে, কিছুতেই গুড়

লইতে দিবে না; কিন্তু কনুইতে কিছু গুড় লাগাইয়া লইতে পারিলে দোকানদার বুঝিতে পারিবে না। অথচ স্থানান্তরে গিয়া উহা লেহন করিয়া ভোজন করিতে পারা যাইবে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই লোভী ব্যক্তি তাহা কার্যে পরিণত করিল এবং কিছু দূর যাইয়া কনুইএর মধ্যে যে গুড় লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা লেহন করিয়া মিষ্ট রস আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু লোভ-পরবশ মূর্খ জানিত না যে, জিহ্বা কিছুতেই কনুই স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাকেই ''কনুইতে (কফোণিতে) গুড়-ন্যায়'' বলে।

যাহারা মনে করে যে, তাহারা কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন-দ্বারাই মুক্তি-সুখ আস্বাদন করিবে, তাহাদিগের বিচারও ''কনুইতে গুড়-ন্যায়ে'র মত,—অর্থাৎ মুক্তি নিকটে থাকিলেও তাহারা তাহা আস্বাদন করিতে পারে না। কারণ, ভক্তি ব্যতীত প্রকৃত মুক্তি-লাভ হইতে পারে না।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির চেষ্টার দ্বারা স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তিকে স্পর্শই করা যায় না। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

''এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥''

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ২২।১৮।২১

কর্ম, জ্ঞান, যোগ—কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি।

মুক্তি—ভক্তির দাসী। ঠাকুর শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—''শ্রীকৃষ্ণের চরণে যাঁহার শুদ্ধভক্তি আছে, মুক্তি পরিচারিকার ন্যায় কখন কিরূপে তাঁহার সেবা করিতে পারিবে, তজ্জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে থাকে।''

অতএব কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনের সাহায্যে প্রকৃত মুক্তিসুখ লাভের অভিলাষ বৃথা। ভক্তি লাভ করিতে পারিলে মুক্তি অনায়াসে ও **আনুষঙ্গিক**-ভাবেই লাভ হইবে।

আকাশে মুষ্ট্যাঘাত-ন্যায়

অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির কোনো এক ব্যক্তি ধরাকে সরার মত জ্ঞান করিত। সে ভাবিয়া দেখিল যে, আকাশই এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক দাম্ভিক ও বলবান। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপতন প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আকাশ হইতেই ঘটিয়া থাকে। আকাশ হইতেই বিদ্যুতের বিকাশ ও মেঘের গর্জন হয়। এই সকলই আকাশের দাম্ভিকতার পরিচয়। অতএব আকাশকে দমন

আনুষঙ্গিক—প্রধান উদ্দেশ্য না হইলেও অন্য বিষয়ের সঙ্গেই যাহা লাভ হয়।

করিতে হইবে। এক মুষ্ট্যাঘাতে আকাশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সে একদিন আকাশের দিকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে (ঘুষি মারিতে) লাগিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ মুষ্ট্যাঘাত করা সত্ত্বেও আকাশের কিছুই ক্ষতি হইল না, আকাশ স্থির ও গম্ভীরভাবে একইরূপে অবস্থান করিতে লাগিল; কেবল ঐ দাম্ভিক ব্যক্তি ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে কয়েকবার ভূপতিত হইয়া শরীরে আঘাতও পাইল।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গল্পটি বলিয়া গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দাম্ভিকগণের চরিত্র ও পরিণামের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। গুরু-বৈষ্ণবগণ আকাশের ন্যায় নির্বিকার ও স্ব স্ব হরিসেবায় মত্ত। কিন্তু জাগতিক অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করে—ভগবদ্ভক্তগণ আকাশের ন্যায় দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া সংসারে নানাপ্রকার দুর্যোগ আনয়ন করেন এবং সংসারকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেন। এইজন্য বহির্মুখ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি যেসকল অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করে, তাহা আকাশের মুষ্ট্যাঘাত করিবার ন্যায় কেবল পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। তাহাতে আকাশের কোনো ক্ষতি হয় না, বিদ্বেষি-ব্যক্তিগণই ক্লেশে পতিত হয়।

৪০❁০৫

মর্কট-ন্যায় ও মার্জ্জার-ন্যায়

মর্কটের (বানরের) শাবক উহার মাতাকে হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রাখে; মর্কটী (বানরী) কিন্তু উহার শাবককে ধরিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লম্ফ প্রদান করে না। আর মার্জারী (বিড়ালী) উহার শাবককে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া মুখে ধরিয়া রাখে, শাবক উহার মাতাকে ধরিয়া রাখিবার কোনো চেষ্টা করে না। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বিড়ালী উহার শাবককে মুখে করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতেছে, শাবকটি হাত পা ছাড়িয়া দিয়াছে, মাতাকে ধরিয়া থাকিবার জন্য শাবকের কোনো চেষ্টাই নাই।

'নিজেদের সাধনের দ্বারাই সিদ্ধি-লাভ হয়, ভগবানের কৃপার কোনো প্রয়োজন নাই',—যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহাদিগের মত ''মর্কট-ন্যায়'' বা বানর-শাবকের বিচারের ন্যায়; আর যাঁহারা বিচার করেন, একমাত্র ভগবানের কৃপার দ্বারাই সব হয়, সাধনের কোনো প্রয়োজনীয়তাই নাই, তাঁহাদিগের বিচার 'মার্জার--ন্যায়'' বা বিড়াল-শাবকের বিচারের ন্যায়।

বহুশত বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে 'শ্রী' সম্প্রদায়ের 'বরবর মুনি' নামে এক বৈষ্ণবাচার্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে **'শ্রী'-সম্প্রদায়ের** 'বড়দলই' নামক শাখার সাধকগণ প্রচার করিলেন যে,—সাধনের দ্বারাই সব হয়, ভগবানের কৃপার প্রয়োজন নাই।

শ্রী-সম্প্রদায়—শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী হইতে যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে। আচার্য শ্রীরামানুজ এই সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।

আবার 'তেঙ্গলৈ' শাখার সাধকগণ এইরূপ এক মত প্রচার করিলেন যে,—ভগবানের কৃপার দ্বারাই সব হয়, সাধনের কোনো প্রয়োজন নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় এই দুই প্রকার বিচারের প্রকৃত সমন্বয় হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন যে, ভগবানের দিক হইতে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা-ধারা, আর জীবের দিক হইতে পূর্ণা শরণাগতি,—এই দুইটি বৃত্তির সম্মেলনেই সিদ্ধিলাভ হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এই কথাটি বুঝাইয়াছেন—

একটি লোক কূপে পড়িয়া গিয়াছে—সে নিজে শত চেষ্টা করিয়াও কূপ হইতে উঠিতে পারিতেছে না, তখন কোনো দয়ালু ব্যক্তি যদি কূপের মধ্যে একটি রজ্জু নিক্ষেপ করেন, তবেই সেই পতিত ব্যক্তি হস্ত প্রসারিত করিয়া রজ্জু ধরিয়া কূপ হইতে উঠিতে পারে। উক্ত দয়ালু ব্যক্তি কূপে রজ্জু নিক্ষেপ করিলেও কূপে পতিত ব্যক্তি যদি হস্ত প্রসারিত করিয়া না ধরে, রজ্জু অবলম্বন করিয়া উঠিবার চেষ্টা না করে, তবে সে কূপ হইতে আর উঠিতে পারিবে না। সেই দয়ালু ব্যক্তিই—শ্রীগুরুদেব বা শ্রীভগবান। তিনি অন্ধকূপে পতিত আমাদিগের জন্য যে কৃপা-রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা যদি তাহা হস্ত প্রসারিত করিয়া না ধরি, তাঁহাতে পূর্ণ শরণাগত না হই, সেই পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা বরণ না করি, তাহা হইলে আমরা এই সংসার-কূপ হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইব না। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদিগের শত-চেষ্টা বা

সাধন-সত্ত্বেও আমরা এই অন্ধকূপ হইতে উঠিতে পারিব না। অতএব আমাদিগের সেবা-বৃত্তি যতটা বৃদ্ধি পাইবে, আমরাও ততটা কৃপা লাভ করিতে পারিব। সুতরাং সেবাই কৃপা। সেবা করিতে করিতে কৃপা পাওয়া যাইবে। আবার কৃপা পাইলে অধিকতর সেবা-বৃত্তি জাগরিত হইবে।

৷৷ ❀ ৷৷

বৃশ্চিক তাণ্ডুলীয়ক-ন্যায় *

বৃশ্চিকের (বিছার) ঔরসে বৃশ্চিকীর (স্ত্রী-বিছার) গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম। আবার কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় যে, তণ্ডুল (চাউল) হইতেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে কোনো পিতা বা মাতা হইতে কীটের উৎপত্তি হয় নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু কোনো কোনো স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মণ' নহেন। পরবর্তিকালে তাঁহাদিগের বংশধরগণ ব্রহ্মজ্ঞ ও আত্মবিৎ হইয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

---

* শ্রীমন্মধ্বাচার্য হইতে ষষ্ঠ বেদান্তাচার্য শ্রীজয়তীর্থ তাঁহার "শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকায় "বৃশ্চিক-তাণ্ডুলীয়ক-ন্যায়ের" উল্লেখ করিয়াছেন—'ব্রাহ্মণাদেব ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মস্য ক্বচিদন্যথাত্বোপপত্তের্বৃশ্চিক-তাণ্ডুলীয়-কাদিবদিতি।"

পরমহংসশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবের শিষ্যগণও সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত 'সামাজিক ব্রাহ্মণ' নহেন। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের দাস বলিয়া 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ'।

অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায় ও অর্দ্ধজরতী-ন্যায়

জনৈক অহিন্দু ব্যক্তি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া গৃহপালিতা একটি কুক্কুটিকে (মুরগীকে) বিক্রয় করিতে হাটে লইয়া গিয়াছিল। সেই ব্যক্তি মনে করিল যে, যদি সে উহাকে তাহার পিতৃপুরুষগণের পালিত জন্তু বলিয়া প্রচার করে, তাহা হইলে পুরাতন চাউল, তেঁতুল ও ঘৃতের ন্যায় উহার মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইরূপ বিচার করিয়া সেই ব্যক্তি সমস্ত ক্রেতার নিকটই 'আমার এই কুক্কুটি অতি প্রাচীনা', ইহা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার হাটে যাইয়া ও ক্রেতাদিগের নিকট এইরূপ প্রচার করিয়া এক বৎসরের মধ্যেও সে তাহার কুক্কুটিকে বিক্রয় করিতে পারিল না—কুক্কুটিকে বৃদ্ধা অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া কেহই উহাকে ক্রয় করিল না। তখন এক প্রবীণ ব্যক্তি ঐ কুক্কুটির মালিককে বলিলেন যে, সে ক্রেতাদিগের নিকট তাহার কুক্কুটিকে বৃদ্ধা বলাতেই উহাকে বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। অতএব ক্রেতাদিগের নিকট উহাকে 'তরুণী' বলিয়া জানাইলে শীঘ্রই উহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া ঐ কুক্কুটি-বিক্রেতা মনে মনে একটি সঙ্কল্প

করিল। সে ভাবিল,—"কুক্কুটিকে বহু লোকের নিকট একবার 'অতি-প্রাচীনা' বলা হইয়াছে; এখন কি করিয়াই বা ইহাকে আবার 'নবীনা' বলা যাইতে পারে? অতএব ইহার অর্দ্ধাংশ প্রাচীন ও অর্দ্ধাংশ নবীন,—ক্রেতাদিগের নিকট ইহা বলিলে আমার উভয় কুলই রক্ষা হইবে।"

যখন ঐ ব্যক্তি হাটে যাইয়া ক্রেতাদিগের নিকট এইরূপ বলিতে লাগিল, তখন ঐরূপ হাস্যজনক ও অসম্ভব কথা শুনিয়া কেহই আর ঐ কুক্কুটিকে গ্রহণ করিতে চাহিল না।

অর্দ্ধজরতী-ন্যায়ের আর একটি গল্প এই,—কোনো সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অভাবে পড়িয়া নিজের গরুটিকে বিক্রয় করিবার জন্য হাটে লইয়া গিয়াছিলেন। ক্রেতারা গরুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন,—"মনুষ্যের অধিক বয়স হইলে যেমন প্রাচীন জানিয়া লোকে তাঁহাকে অধিক সম্মান করে, পুরাতন ভৃত্য হইলে যেরূপ তাহার বেতন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই গরুটিকে যদি 'প্রাচীনা' বলা যায়, তাহা হইলে ইহারও মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে।" এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ গরুটিকে তাঁহার 'পৈতৃক গাভী' বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ কথা শুনিয়াই ক্রেতারা ফিরিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দিলেন— "আপনি যদি গরু বিক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে ক্রেতাদিগের নিকট উহাকে 'এক বিয়ানের গরু' বলিয়া পরিচয় দিবেন।" তখন ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি বিচার করিলেন,—"আমি যদি গরুকে আত্মাংশে 'জরতী' (বৃদ্ধা) ও শরীরাংশে 'তরুণী' জানিয়া

'অর্দ্ধজরতী' বলি, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বের ও পরের কথার মধ্যে **তত্ত্ব-বিরোধ** হইবে না।

যাহারা নির্বিশেষবাদী তাহারাও এইরূপ তত্ত্ব-বিচার (?) করিয়া 'সবিশেষ ও নির্বিশেষ' ব্রহ্ম প্রভৃতি কথা বলিয়া থাকে। ব্রহ্ম প্রথমে সবিশেষ ও চরমে নির্বিশেষ,—যাঁহারা এইরূপ প্রচার করেন, তাঁহাদিগের বিচার অর্দ্ধজরতী-ন্যায়ের মত। বস্তুতঃ নিত্য চিচ্ছক্তি না মানিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি হয়। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম, কহি—'শ্রীভগবান'।
ষড়্বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্ব ধাম ॥
তাঁ'রে 'নির্ব্বিশেষ' কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৭।১৩৮, ১৪০

বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন,—যাঁহারা বেদের প্রাদেশিক বাক্য-মাত্রকে 'মহাবাক্যে' বলিয়া থাকেন—শ্রুতি-সমূহ হইতে কেবলা-দ্বৈতপর বাক্য-সমূহ চয়ন করিয়া দ্বৈতপর বাক্য-সমূহ পরিত্যাগ করেন, অথবা **প্রাতিভাসিক সত্যতা ও ভেদের প্রতিপাদক**

তত্ত্ববিরোধ—'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ যথার্থ বা স্বরূপ, তাহার বিরোধ বা শত্রুতা অর্থাৎ প্রতিকূল বিচার।

প্রাতিভাসিক সত্যতা—যে সত্য কেবল প্রতিভাত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সত্য নহে; যেমন রজ্জুতে 'সর্প'-জ্ঞান প্রাতিভাসিক সত্য।

ভেদের প্রতিপাদক—ব্রহ্ম ও জীবের সহিত ভেদের অর্থাৎ সেব্যসেবক-সম্বন্ধের বোধক।

অদ্বৈতপর বাক্যই সাময়িক মূল্যমাত্র আছে, শ্রুতিসমূহের অদ্বৈতপর বাক্যেই চরম উদ্দেশ্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা 'শ্রুতি-মাতা'র বা 'গো-মাতা'র বা 'গো-মাতা'র এক অংশ রাখিয়া আর এক অংশ ছেদন করিবারই পক্ষপাতী। গরুর শরীর রাখিয়া মস্তক ছেদন করিলে, বা মস্তকটি রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে তদ্দ্বারা 'গো-হত্যা'র মহা-পাপেই লিপ্ত হইতে হয়। কুক্কুটির যে অংশ ডিম্ব প্রসব করে, সেই অংশটি রাখিয়া উহার মস্তক ছেদন করিলে আর ডিম্ব পাওয়া যায় না।

যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে মানেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মানেন না; বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মানেন, শ্রীগৌরসুন্দরকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মানেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে মানেন না; বা যাঁহারা শ্রীগৌরকে মানেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদেবকে মানেন, কিন্তু শ্রীগৌরকে মানেন না; বা যাঁহারা শ্রীগৌরকে মানেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীভগবানকে মানেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তকে মানেন না; বা যাঁহারা ভক্তকে মানেন, কিন্তু শ্রীভগবানকে মানেন না, তাঁহাদিগের বিচার 'অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়' বা 'অর্দ্ধজরতী-ন্যায়ে'র বিচার। কুক্কুটি বা গরুর এক অর্দ্ধাংশ যেরূপ প্রাচীন ও অন্য অর্দ্ধাংশ যেরূপ নবীন হইতে পারে না, তাহা হইলে সমস্ত বস্তুকেই অবজ্ঞা করা হয়, তদ্রূপ যাঁহারা পরব্রহ্মকে নির্বিশেষ মনে করেন, অথবা যাঁহারা শ্রীভগবানকে মানিয়া ভক্তকে মানেন না, তাঁহারাও সম্পূর্ণ বস্তুকেই অস্বীকার করেন অর্থাৎ তাঁহারা

নাস্তিক। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান!
'অর্দ্ধকুক্কুটিন্যায়' তোমার প্রমাণ ॥
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি, আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৫।১৭৬-১৭৭

লাজাবন্ধন-ন্যায়

এক দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এক ধর্মশালায় একটি স্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; গঙ্গ-স্নান করিয়া এক ধনী ব্যক্তি ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিটিকে ঐরূপ ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিকটস্থ একটি দোকান হইতে কিছু লাজ (খৈ) ক্রয় করিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন—"আমি তোমাকে কিছু খৈ দিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ কর।" ইহাতে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া স্তম্ভের দুই পার্শ্ব দিয়াই অঞ্জলি পাতিল। সেই ধনী ব্যক্তি তাহাকে স্তম্ভপরিত্যাগ করিয়া খৈ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে সে তাহা শুনিল না। অগত্যা উক্ত দাতা ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অঞ্জলিতে খৈ দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ক্ষুধার্তব্যক্তিটি মুখ বাড়াইয়া উহা ভোজন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহা আর পারিল না। তাহার এইরূপ অবস্থা হইল যে, সে না পারে মুখ

বাড়াইয়া খৈ খাইতে, না পারে খৈ ত্যাগ করিয়া বন্ধন-মুক্ত হইতে। খৈগুলি বাতাসে উড়িয়া যাইতে লাগিল, তথাপি ঐ ব্যক্তি খৈ খাইবার আশায় হস্তদ্বয়ের বন্ধন মুক্তি করিতে না পারিয়া ঐ ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে পেটে আগুন জ্বলিতেছে, অথচ হস্তে খাদ্য রহিয়াছে, কিন্তু খাইবার উপায় নাই।

যাহারা ভগবানের সেবায় বিমুখ, তাহাদিগের দশাও এইরূপ। বদ্ধজীবগণ সংসারের স্তম্ভকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিয়াই ত্রিতাপরূপ ক্ষুধাকে শান্ত করিতে চাহে। তাহাদিগের হস্তে কেহ বিষয় প্রদান করিয়া গেলেও তাহারা ঐ বিষয় ভোগও করিতে পারে না, ত্যাগও করিতে পারে না—এইরূপ এক অবস্থায় উপনীত হইয়া তাহারা ত্রিতাপের জ্বালায়ই জ্বলিতে থাকে। অতএব ভগবানের শুদ্ধভক্তের উপদেশানুসারে ও তাঁহার কৃপার প্রভাবেই এই জড়জগতের স্তম্ভের প্রতি নির্ভরতা পরিত্যাগ-পূর্বক অকপটভাবে হরিভজন করিলেই পরাশান্তি লাভ করা যায়; ইহা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা-ন্যায়

কোনও এক নদীর তীরে কতকগুলি বক মৎস্যের লোভে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে উহারা দেখিতে পাইল—কতকগুলি বৃষ নদীর তীর দিয়া যাইতেছে। বৃষগুলির

লম্বমান অণ্ডকোষকে 'সফরী', মৎস্য (পুঁটি মাছ) মনে করিয়া বকগুলি চিন্তা করিতে লাগিল যে, উহাদিগের অণ্ডকোষগুলি খসিয়া পড়িলেই তাহারা তাহা ভোজন করিতে পারিবে! অতএব মৎস্যের জন্য নদীর তীরে বৃথা বসিয়া না থাকিয়া ঐ বৃষগুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হওয়াই উচিত। বকগুলি তাহাই করিল। কিন্তু উহারা বৃষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বৃষগুলির অণ্ডকোষগুলিকে চঞ্চুর দ্বারা স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিল এবং বৃষগণের পুনঃপুনঃ পদাঘাতে জর্জরিত হইতে থাকিল, তথাপি উহাদিগের পশ্চাদ্দেশ পরিত্যাগ করিল না।

যে-সকল বদ্ধজীব ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বকাণ্ড-প্রত্যাশার ন্যায় বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহারাও এইরূপে কেবল মায়ার পদাঘাতে ও কষাঘাতেই জর্জরিত হইতে থাকে; তথাপি মায়া এমনি মোহিনী যে, বদ্ধজীবগণ ঐ বকাণ্ডের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়-ভোগের দ্বারাই তাহাদিগের তৃপ্তি ও শান্তি লাভ হইবে,—এই কল্পনা করিয়াই তাহারা বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। কিন্তু তৎকালে কেবল অতৃপ্তি ও অশান্তিই লাভ করিয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও ঐরূপ প্রত্যাশায় ধাবিত না হইয়া একমাত্র শ্রীহরির সেবা-লাভের আশায়ই যত্ন করিবেন।

গতানুগতিক-ন্যায়

কএকজন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে গঙ্গা-স্নান ও গঙ্গার তীরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন। সকলেই তর্পণের জন্য **কোষা** লইয়া যাইতেন। কিন্তু প্রত্যহই একজনের কোষা অন্য জনের কোষার সহিত পরিবর্তিত হইত। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের কোষাকে অন্যান্য সকলের কোষা হইতে পৃথকভাবে চিনিয়া রাখিবার জন্য উহার উপরে একটি বালুকা-পিণ্ড রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও স্নানের পূর্বে কোষার উপর বালুকা-পিণ্ড রাখিতে হয় মনে করিয়া, পূর্ববর্তী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুবর্তন করিলেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি স্নান করিয়া উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার কোষাটি চিনিবার আর উপায় নাই, সকল কোষার উপরেই বালুকা-পিণ্ড রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন—"লোকগুলি কী গতানুগতিশীল! প্রকৃত বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই কেবল অপরের দেখাদেখি কার্য করিয়া থাকে। তাহারা যদি বুদ্ধিপূর্বক কার্য করিত, তবে সকলেই একপ্রকার চিহ্ন দিত না।"

আধুনিক সমাজের ধর্মকর্ম-চেষ্টাও ঠিক এইরূপ। সমাজে ও সাহিত্যে এইরূপ কতকগুলি আচারের ও কথার সৃষ্টি হইয়াছে যে, লোকে প্রকৃত বিষয়টি কী হওয়া উচিত, তাহা মোটেই বিচার না করিয়া কেবল অন্ধভাবে অপরের অনুকরণ করিতেছে।

কোষা—পূজার জন্য ব্যবহৃত তাম্রময় জল-পাত্র-বিশেষ।

যিনি ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি 'লক্ষ্মী' নামে পরিচিতা, সেই লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদসেবা করেন, তিনিই 'শ্রীনারায়ণ'। শ্রীনারায়ণই সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক,—তাঁহার কোনোপ্রকার অভাবই নাই। যাহারা অভাবগ্রস্ত, তাহাদিগকে 'দরিদ্র' বলা হয়। দারিদ্র্য জীবের ত্রিতাপের অন্তর্গত একটি তাপ-বিশেষ। ভগবানে ত্রিতাপ বা কোনপ্রকার অভাব থাকিতে পারে না। কিন্তু লোকে এই সকল কথার বিচার না করিয়াই গতানুগতিকভাবে দরিদ্রকেও 'নারায়ণ' বলিতেছে এবং ইহা হইতে আধুনিক সাহিত্যে 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—নারায়ণ দরিদ্র না হইলেও জীবের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ বিচারও ভুল। বদ্ধজীবের দরিদ্রতা হইয়াছে বলিয়া নারায়ণের দারিদ্র্য হয় নাই; আর জীব কখনও নারায়ণ নহে।

শাস্ত্র বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥"

—বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন

যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা।

জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ১৮।১১১, ১১৩

অনেক পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সকল শাস্ত্রযুক্তি ও মহাজনবাণী বিচার না করিয়াই কেবল লোকের দেখাদেখি 'গতানুগতিক ন্যায়ে' অন্যান্য ব্রাহ্মণের দ্বারা উক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কার্যের অন্ধ অনুকরণের ন্যায় ধর্মরাজ্যে নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও পাষণ্ডতা করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্যের অবৈধ অনুকরণ করিয়া যে-কোনো নশ্বর বস্তু, প্রতিষ্ঠান বা জীবের জন্ম-তিথির প্রতিই 'জয়ন্তী' শব্দের প্রয়োগ করা হয়। বস্তুতঃ রোহিণীনক্ষত্র-সংযুক্তা ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী বা একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিই 'জয়ন্তী' নামে অভিহিত হন। আজকাল কুকুর-বিড়ালের, ঘোড়া-গাধার, এমনকি, অচেতন কল-কারখানা প্রভৃতির জন্মতিথি-গুলিও 'জয়ন্তী' নামে অভিহিত হইতেছে! জড়সাহিত্যিকগণ গতানুগতিকভাবে ইহার অন্ধ অনুকরণ করিয়া ভগবানের চরণে হয় অজ্ঞাতসারে, না হয়, জ্ঞাতসারে দম্ভভরে অপরাধ করিতেছে।

৯০✿০৩

গণগড্ডলিকা-ন্যায়

যে মেষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষের পাল গমন করে, উহাকে গড্ডরিকা' বা 'গড্ডলিকা' বলে। 'গড্ডলিকা-প্রবাহ' বলিতে গড্ডলিকা বা মেষী যে দিকে যায়, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে যাওয়া, অর্থাৎ কোনো বিবেচনা না করিয়াই সকলের দেখাদেখি প্রচলিত মতের অনুবর্তী হইয়া চলা।

মেষপালের মধ্যে একটি মেষ যদি অগ্রে নদীতে বা গর্তে পতিত হয়, তবে সেই মেষপালের অন্তর্গত সব মেষগুলিই নিবারণ করা সত্ত্বেও তথায় পতিত হয়।

আধুনিক তথাকথিত 'সমন্বয়বাদ' এইরূপ গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়েই গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে শত শত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেও কেহই তাহা শুনিতেছে না। সকলেই এক ধূয়া ধরিয়াছে,—"যত মত তত পথ!" নাস্তিক হইয়াও যে পূর্ণতা লাভ করা যায়, ভক্ত হইয়াও তাহাই লাভ করা যায়। কিছুদিন পূর্বে এক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

"Buddha may or may not have believed in God, that does not matter to me. He reached the same state of perfection to which others come by BHAKTI–love of God, YOGA or JNANA. Perfection does not come from belief or faith."

অর্থাৎ বুদ্ধ ভগবানে বিশ্বাস করিয়া বা না করিয়াও থাকিতে

পারেন; তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। যে পূর্ণতার অবস্থায় অন্যান্য ব্যক্তিগণ ভক্তি বা ভগবৎপ্রেম, যোগ অথবা জ্ঞানের দ্বারা উপনীত হইয়া থাকে, তিনি সেই একই পূর্ণতার অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন, পূর্ণতা বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হইতে লাভ হয় না।

এই সকল উক্তি মনুষ্যের সাধারণ-বুদ্ধি কিংবা বহির্মুখ চিত্তবৃত্তিকে এতটা উত্তেজিত করে যে, তাহারা ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রযুক্তি না শুনিয়াই গড্ডলিকা-প্রবাহে গা' ভাসাইয়া দিয়া ইহার অনুমোদন করিয়া থাকে। বক্তা যদি বলিতেন যে, বুদ্ধদেব পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, বা তিনি ভগবানের অবতার, সুতরাং তাঁহার পূর্ণতা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি অযৌক্তিক বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইত না। কিন্তু কেহ নাস্তিক হইয়াও আস্তিক বা ভগবৎ-প্রেমিকের ন্যায় সমান পূর্ণতা লাভ করিতে পারে,—এইরূপ উক্তি নাস্তিকতারই ন্যায় একটি মত বা পথ। যাহারা এইরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদকে লুফিয়া লইতেছে, তাহারা গণ-গড্ডলিকা-ন্যায়ের অনুসরণ করিতেছে। যখন গণ বা জন-সমষ্টি ব্যক্তিত্বের মোহে পড়িয়া বহু লোকের দেখাদেখি বিনা বিচারেই কোনো মত পোষণ করে, তখন এইরূপ ভ্রান্ত মতও জগতে সত্য ও পরম উদার মত বলিয়া বহুমানিত হয়। গণগড্ডলিকার প্রভাবকে অতিক্রম করা জনসাধারণের পক্ষে সহজ নহে। ভগবানগণ জগতে আসিয়া সময়ে সময়ে সেই সাধারণ ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের

একটি লীলার কথা উল্লেখ করিয়া গণগড্ডলিকা-ন্যায়ের উপদেশ প্রদান করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন কতকগুলি লোক একটা জনরব তুলিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে কালীয়-হ্রদে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। বহু লোক একত্র শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল—"কালীয়-হ্রদে কালীয়-নাগের মস্তকে মণি জ্বলিতেছে এবং তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। ইহা আমরা সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই।" এইরূপে তিন দিন যাবৎ গণগড্ডলিকা স্রোতের মত আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সাক্ষ্য দিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক সরল-বুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের কালীয়-দহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলভদ্রকে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—"তুমি গণগড্ডলিকার কথায় ভ্রান্ত হইতেছ কেন? গণগড্ডলিকার কথার মোহে পড়িয়া অসত্যকে সত্য মনে করিও না।"

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট একজন শিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ধীবরগণ রাত্রিকালে নৌকাতে চড়িয়া প্রদীপ জ্বালিয়া কালীয়-দহে মৎস্য ধরিয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তিগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া নৌকাকে কালীয়-নাগ, প্রদীপকে উহার মস্তকের মণি ও ধীরবকে 'কৃষ্ণ' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে এবং এইরূপ ভ্রান্তিকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছে।

ধর্মরাজ্যে এইরূপ অনেক ব্যাপার গণগড্ডলিকার দ্বারা 'ধর্ম' ও 'সত্য' বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। গণগড্ডলিকার দ্বারা কত কল্পিত অবতার, মহাপুরুষ ও মতবাদের যে প্রচার হইয়া লোককে বিপথগামী করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃত সত্যপিপাসুগণ ইহা হইতে সতর্ক থাকিবেন।

অন্ধপরম্পরা-ন্যায়

শ্রেণিবদ্ধভাবে স্থিত অন্ধগণের মধ্যে যদি একজন অন্ধ গর্তে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সকলেই জড়াজড়ি করিয়া গর্তে পতিত হইয়া থাকে। যাহাতে গর্তে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য কেহই বিশেষ বিবেচনা করিয়া যত্ন করে না।

জগতে যাহারা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি-কার্যে ব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোকের দেখাদেখি নিজেরাও মোহ-গর্তে পতিত হইতেছে, তাহারাও কোনোদিন বিশেষ বিচার করিয়া উহা হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় অনুসন্ধান করে না।

ইহারা ভোগী ও ত্যাগী জীবগণের সংসর্গ-প্রবাহের মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহাতেই গা' ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করিতেছে। যদি ইহাদিগের নিকট কেহ নিত্যমঙ্গলের কথাও বলেন, তথাপি তাহারা উহা শ্রবণ করিতে চাহে না; কারণ তাহারা মনে করে যে, অন্যান্য বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তি যখন ঐরূপ কর্যে লিপ্ত আছে, তখন তাহারাও উহাদিগেরই অনুসরণ

করিবে। তাহাদিগের আদর্শ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ যে বিষয়-মদান্ধ ও তাহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে যে, মোহ-গর্তে পতিত হইতে হইবে—এইরূপ বিচার-শক্তি বা আত্মমঙ্গল-লাভের বুদ্ধিবিবেক ইহাদিগের নাই।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।৩১

অর্থাৎ যাহাদিগের মন বিষয়ভোগের দ্বারা দুষ্ট হইয়াছে ও যাহারা বহির্বিষয়ে আসক্ত কামিগণকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছে, তাহারা পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছুক বৈষ্ণবগণের একমাত্র গতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জানে না। সুতরাং এক অন্ধ ব্যক্তি দ্বারা চালিত অন্য অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত সত্যপথের সন্ধান না পাইয়া গর্তে পতিত হয়, তদ্রূপ বহির্মুখ ব্যক্তিগণও কর্মকাণ্ডাত্মক বেদরূপ সুদীর্ঘ রজ্জুর সংহিতাব্রাহ্মণাদিরূপ মহাসূত্রে কাম্যকর্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ অন্ধ-পরম্পরায় ধাবমান বদ্ধজীবগণের কেশ আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে মোহ-গর্ত হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহারা এই সকল জীবের উদ্ধারের জন্যই অনুক্ষণ শ্রীহরি-কীর্তন করিয়া থাকেন।

অন্ধ গজ-ন্যায়

কয়েকজন জন্মান্ধ ব্যক্তি কোনো প্রাচীন ব্যক্তির নিকট 'হস্তী' নামক এক অদ্ভুত প্রাণীর কথা শ্রবণ করিয়াছিল। তাহাদিগের বড়ই ইচ্ছা হইল যে, তাহারা ঐরূপ এক অদ্ভুত প্রাণীকে স্পর্শ করিয়া উহাকে অনুভব করে। তাহারা যষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক রাজবাড়ির হস্তী-শালায় যাইয়া উপস্থিত হইল এবং মাহুতকে অনুরোধ করিয়া তাহার সাহায্যে কেহ বা হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিল, কেহ বা উহার শুণ্ড, কেহ বা পুচ্ছ এবং কেহ বা পদদেশ স্পর্শ করিয়া অনুভব করিতে লাগিল। যে অন্ধটি হস্তীর শুণ্ড স্পর্শ করিল সে হস্তীকে একটি বৃহৎ সর্পের আকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল; যে পদদেশ স্পর্শ করিল, সে উহাকে একটি স্তম্ভের মত মনে করিল; যে কর্ণ স্পর্শ করিল, সে উহাকে একটি বৃহৎ কুলার মত এবং যে উদর স্পর্শ করিল, সে উহাকে একটি ঢাকের মত মনে করিল। এইরূপে 'হস্তী' সম্বন্ধে অন্ধদিগের কোনো ধারণাই পূর্ণ হইল না।

জগতে যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদিগের ধারণাও ঐরূপই অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানজ্ঞানের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যাওয়াতেই 'মায়াবাদ', 'সন্দেহবাদ' ও নানাপ্রকার নাস্তিক্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু চক্ষুষ্মান হইয়া অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের নিকট দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ করিয়া, যখন ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্য হয়, তখনই

ভগবানের পরিপূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। যাহারা ভগবদ্ভক্ত নহে, যাহারা তত্ত্বান্ধ, তাহারা ভগবানের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলে, তাহা সমস্তই অসম্পূর্ণ, বিকৃত ও ভ্রান্ত-মত। ভগবানকে দর্শন না করিয়াই ভগবানকে 'নিরাকার' বা 'জড়সাকার' প্রভৃতি যাহা কিছু বলা যায়, তাহা সমস্তই ভুল। এইজন্য যাঁহারা ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, সেইরূপ মহাজনগণের বাণী শ্রবণ করিয়া যখন আমাদিগের দিব্য-চক্ষু উন্মীলন হয়, তখনই আমরা ভগবানের পূর্ণ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি।

দেহলীদীপ-ন্যায়

'দেহলীদীপ-ন্যায়' 'মধ্যদীপ-ন্যায়' ও 'অন্তর্দীপিকা-ন্যায়'—একই বিষয়কে লক্ষ্য করে। গৃহ ও বাহির, উভয় স্থানের মধ্যস্থ দরজার চৌকাঠের নীচের কাঠের উপর প্রদীপ জ্বালাইলে যেরূপ উভয় স্থানই আলোকিত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহাদিগের ভগবানের সেবা-লাভ ত' হয়-ই, সংসার হইতে মুক্তিলাভও আনুষঙ্গিকভাবে এবং অনায়াসেই হইয়া থাকে। যাঁহার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়াছে, তাঁহার সংসার-মুক্তিও হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উভয় উদ্দেশ্যেই পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন। যেমন, রন্ধন-

কার্যের জন্য আগুন জ্বালাইলেই আনুষঙ্গিকভাবে আলোক-প্রাপ্তি এবং শীত নিবারণও হয়, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিযাজন করিলেই সর্বসিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের অন্যান্য দেবতা, পিতৃ-পিতামহ ও পূজনীয় ব্যক্তিবর্গের পূজার সর্ববিধ পূর্ণ-ফল আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হয়। অতএব ভগবদ্ভক্তিযাজন করা জীবমাত্রেরই কর্তব্য।

প্রস্তর ও মৃৎপিণ্ড-ন্যায়

যখন তুলার সহিত মৃত্তিকা-পিণ্ডকে তুলনা করা যায়, তখন তুলা হইতে মৃত্তিকা-পিণ্ডই শক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু যখন প্রস্তরের সহিত মৃত্তিকার তুলনা করা যায়, তখন মৃত্তিকা অপেক্ষা প্রস্তরই অধিকতর শক্ত বোধ হয়। কেহ যদি পাষাণ চূর্ণ করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রস্তরের পরিবর্তে মৃৎপিণ্ডই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। যাহারা কুতর্কের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগের কুতর্ক ও কুযুক্তিগুলিই বিনষ্ট হইয়া যায়। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তিকে জাগতিক কোনও প্রকার তর্ক-যুক্তিই কখনও নিরাস করিতে পারে না।

অনেক সময়ে শাস্ত্রে কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি পথের প্রশংসা

দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অন্য পথের সহিত তুলনা-মূলেই ঐ সকল প্রশংসা করা হইয়াছে; যেমন, অসৎ কর্ম বা কোনোপ্রকার কর্ম না করিয়া আলস্যময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা সৎকর্ম করা ভাল; আবার সকাম কর্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম ভাল; নিষ্কাম কর্ম হইতে জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি ভাল। ইহা তুলার সহিত তুলনায় মৃত্তিকা-পিণ্ডকে কঠিন বলিয়া অনুভবের ন্যায় বিচার। কিন্তু ভক্তি স্বয়ং ভগবানের প্রীতি-বিধান করে বলিয়া উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ যখন ভক্তির সহিত কর্ম-জ্ঞানযোগাদির তুলনা করা যায়, তখন আর উহাদের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব থাকে না—ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমদভগবদ গীতায় কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতির প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না, তাহারা উহার ভক্তি কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি—সকল পথেরই প্রশংসা দেখিয়া সকল পথই বা সকল উপায়ই সমান, এইরূপ মীমাংসা করে; কিন্তু গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে দেখিতে পাওয়া যায়—তপস্বী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, কর্মী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, আবার যিনি শ্রদ্ধার সহিত ভগবানকে ভজন করেন, সেই ভক্তিযোগী যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। রাজা বা বিচারক বহু আইন প্রণয়ন করিয়া সর্বশেষে যে আইন বা বিধির দ্বারা পূর্ব পূর্ব সমস্ত আইন বা বিধিগুলিকে রহিত করিয়া চরম আইন প্রস্তুত করেন, সেই বিধিটিই সর্বাপেক্ষা বলবান্ ও তাহাই বহাল হয়। গীতার সর্বশেষে ভগবান্ ''অন্যান্য সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র

আমার শরণ গ্রহণ কর,—একমাত্র ভক্তি-দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইবে; ইহাই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ'—এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া ভগবদ্ভক্তিই যে ভগবানের সাক্ষাৎকারলাভের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ও উপেয় (প্রয়োজন), তাহাই জানাইয়াছেন।

অন্ধ ও গোপুচ্ছ-ন্যায়

এক অন্ধ ব্যক্তি লাঠিতে ভর করিয়া তাহার শ্বশুর-বাড়ি যাইতে যাইতে মাঠের মধ্যে এক রাখালের সাক্ষাৎকার পাইয়া কহিল—''ওহে ভাই, তুমি আমাকে আমার শ্বশুর-বাড়িতে লইয়া যাইতে পার?'' ইহা শুনিয়া রাখাল বলিল—''আমি অনেকগুলি গরু চরাইতেছি; তোমাকে তোমার শ্বশুর-বাড়ি লইয়া যাইতে হইলে গুরুগুলি সকলই পলায়ন করিবে। তবে তোমার উপকারের জন্য আমি এক কাজ করিতে পারি—আমার একটি খুব নিরীহ, শান্ত ও বিশ্বস্ত গরু আছে, তুমি উহার লেজ ধরিয়া যাও; সেই গরুটি তোমাকে যে বাড়িতে লইয়া যাইবে, উহাই তোমার শ্বশুর-বাড়ি বলিয়া জানিবে।

অন্ধ রাখালের কথা শুনিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে গরুর লেজ ধরিয়া রহিল। এদিকে গরুটি অন্ধের হাতের চাপে প্রমাদ ভাবিয়া অন্ধকে লাথি মারিতে মারিতে কাঁটা-বনের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া

যাইতে লাগিল। অন্ধের সমস্ত শরীর কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল এবং তাহার কাপড়-চোপড় সব ছিঁড়িয়া গেল। গভীর রাত্রিতে ঐ অন্ধ ঐরূপে ক্ষত-বিক্ষত ও উলঙ্গ হইয়া শ্বশুর-বাড়িতে পৌঁছিল। অন্ধের শ্বশুরের চাকরেরা তাহাকে 'গরুচোর' মনে করিয়া কিল, ঘুষি ও চড় মারিয়া উহার মুষ্টিবদ্ধ হাত গরুর লেজ হইতে ছাড়াইয়া লইল। ইহাতে অন্ধের দুর্ভোগের আর সীমা রহিল না।

যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ দুষ্ট গুরুকে 'সদ্গুরু' মনে করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের পরিণামও এইরূপই শোচনীয় হয়। যে-কোনো ব্যক্তি ভগবানের রাজ্যের পথ দেখাইতে পারে না এবং যে-কোনো প্রতিনিধিও আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে পারে না। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য।

কমলপত্রশতবেধ-ন্যায়

উপরি উপরি স্থিত একশত পদ্মপত্রকে যদি একটি সূচীদ্বারা বিদ্ধ করা যায়, তবে মনে হয় যে, উহারা একই কালে বিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ এক একটি করিয়া পর পর একশত পত্র বিদ্ধ হইয়া থাকে। পদ্মপত্রসমূহ একই সময়ে বিদ্ধ হইয়াছে বলিলেও একটির পর আর একটি পত্র বিদ্ধ হইতে কিছুকাল বিলম্ব ঘটিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

একান্তভাবে ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও ধর্মাত্মা হন। ভক্তি আভাসমাত্রে একমুহূর্তেই সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি একশত কমলপত্রকে যুগপৎ সূচীর দ্বারা বিদ্ধ করিবার ন্যায়ে একটু কালবিলম্ব স্বীকার করিতে হয়। গীতায় (৯।৩১) যে ভগবান বলিয়াছেন,—''ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'' অর্থাৎ শীঘ্রই সুদুরাচার ব্যক্তিও ধর্মাত্মা হইয়া থাকেন, সেখানে 'শীঘ্র' শব্দের দ্বারা 'কমল-পত্র-শতবেধ' ন্যায় কিঞ্চিৎ কালবিলম্বের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রকে (Electric Fan কে) সুইচ্ (Switch) টিপিয়া বন্ধ করিলেও দুই একবার ঘুরিয়া তবে উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়। সেইরূপ হরিভক্তি-আশ্রয়কারী ব্যক্তির পাপ-প্রবৃত্তি প্রশমিত হইলেও পূর্বপ্রেরণা-বশতঃ অবশিষ্ট পাপপ্রবৃত্তির আকারমাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

''যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাং
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥''

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৬

হে ভগবান যাঁহার নাম শ্রবণ, তৎপরে কীর্তন, উচ্চারণ ও স্মরণ করিবা-মাত্র চণ্ডাল ও যবনকুলে উদ্ভূত ব্যক্তিও সবনের (সোম-যজ্ঞের) যোগ্য হইয়া উঠে, এমন সেই প্রভু যে তুমি, তোমার দর্শন হইতে কী না হয়?

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥"

—পদ্মপুরাণ

যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহাদিগের অপ্রারব্ধ অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ ও অনন্তফল, কূট (বীজোন্মুখ), বীজ (প্রারব্ধোন্মুখ ও বাসনাময়) এবং ফলোন্মুখ (প্রারব্ধ)—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়।

পূর্ববর্তী ভাগবতীয় শ্লোকে যে হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-কারীর 'সদ্যঃ' (তৎক্ষণাৎ) সবন (সোমযাগ) কার্যে যোগ্যতা হয়, তাহাই পদ্মপুরাণের উক্ত বাক্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীমৎ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় 'সদ্যঃ' শব্দের তাৎপর্য এরূপ লিখিয়াছেন—"সদ্যঃ সবনায়েতি কমলপত্রশতবেধ-ন্যায়েন কিঞ্চিৎ কালবিলম্বো জ্ঞেয় ইতি।" অর্থাৎ 'সদ্যঃ সবনযোগ্য হয়'—এ স্থলে কমলপত্রশতবেধ-ন্যায়ানুসারে কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব জানিতে হইবে।

৪০❁০৫

শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্

"জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাম্।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্ ॥"

যে অন্ন ভোজন করিলে সহজে জীর্ণ হয়, সেইরূপ অন্নই

প্রশংসার যোগ্য; যে পত্নী সৎপথে থাকিয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছে, সেই স্ত্রীই প্রশংসনীয়া। যে বীর যুদ্ধ জয় করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, সেই বীরই প্রশংসার যোগ্য; আর যে শস্য ক্ষেত্র হইতে গৃহে আনীত হইয়াছে, সে শস্যই প্রশংসনীয়।

এই নীতিটি উল্লেখ করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিলেন যে, যিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অকপট ভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত-প্রস্তাবে নিষ্কপট সেবক। অনেকে প্রথম মুখে কপটতা করিয়া হরিভজন বা হরিসেবায় অনেক উৎসাহের অভিনয় প্রদর্শন করে; কিন্তু তাহাদের অন্য অভিলাষ পূরণের বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভাব হইলে তাহাদের আর উৎসাহ থাকে না। যে উৎসাহ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষ পর্যন্ত থাকে, তাহাকেই 'প্রকৃত উৎসাহ' বলা যায়।

কোনো কোনো ব্যক্তি সম্মান-লাভের আশায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া বলিতেন,—অমুক স্থানে খুব সেবার আনুকূল্য পাওয়া যাইবে, অমুক ব্যক্তির খুব উৎসাহ আছে। তখন শ্রীল প্রভুপাদ "শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্" এই নীতিটি উদ্ধার করিতেন। যিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে সেবা করিয়াছেন, তাঁহাকেই সেবক বলা যাইবে। কেবল শুভ ইচ্ছা পোষণ, বা ভবিষ্যতের আশায় সমস্ত রাখিয়া দেওয়া নিষ্কপট হরিসেবকের বিচার নহে।

৪০❁০৫

ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ

"রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥"

রাজা কর্ণের দ্বারা অর্থাৎ দূতের মুখে সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিষয় দর্শন করেন; পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন; পশুগণ গন্ধের দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ ঘ্রাণ লইয়া সমস্ত জানিতে পারে; আর মূর্খেরা কোনো কার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে তবে দেখিতে পায়।

যাঁহারা রাজা অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা ভগবানের দূতের নিকট কর্ণের সাহায্যে সমস্ত বস্তু দর্শন করেন; আর যাঁহাদের **শ্রৌত-শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধি** হইয়াছে, এরূপ পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা বিষয় দর্শন করেন। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত মূর্খ, তাহারা কোনো ঘটনা ঘটিয়া গেলে পরে ঐ বিষয় কিছুটা দেখিতে পারে, দেখিয়াও আবার ভুলিয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তগণ মায়ার নানাপ্রকার ছলনার কথা ও ভগবানে ভক্তির সার্থকতার কথা কাণে শুনিয়াই উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহারা সর্বতোভাবে সতর্ক হইয়া একমাত্র হরিভজনকেই সার করেন; কিন্তু যাহারা পশু হইতেও মূর্খ, তাহারা কানে শুনিয়া কিংবা বুদ্ধিদ্বারা অথবা অন্য কোনও ভাবেই এই সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারে না, মাংসচক্ষু বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই তাহাদের একমাত্র সম্বল। যাহারা চাক্ষুষ-জ্ঞান,

শ্রৌত-শাস্ত্র—গুরুপরমপরায় প্রাপ্ত যে শ্রুতি তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্র।
উজ্জ্বলা বুদ্ধি—সুতীক্ষ্ণা সেবা বুদ্ধি।

অক্ষজ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়াছে, তাহারা গন্ধবেদী-পশু হইতেও মূর্খ।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিতেন,—"কখনও চক্ষু দিয়া সাধুকে দেখিতে অর্থাৎ মাপিতে নাই,—কর্ণের দ্বারা, অর্থাৎ সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহার দ্বারা অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত (regulated) করিয়া সাধু দেখিতে হইবে। যাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা প্রতারিত, তাহারাই সর্বাপেক্ষা মূর্খ।"

কদাপি কুপ্যতে মাতা, নোদরস্থা হরিতকী

কখনও কখনও গর্ভধারিণী মাতাও সন্তানের প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়া সন্তানের অপকার করিয়া ফেলিতে পারেন; কিন্তু হরীতকী কাহারও উদরে প্রবেশ করিয়া কখনও উপকার ব্যতীত অপকার করে না। হরীতকী আপাত তিক্ত কষায় বোধ হইলেও উহার সেবনে পরিণামে উপকার হয়। গুরু ও বৈষ্ণবের সুতীব্র উপদেশ জগতের স্নেহময়ী মাতার কথার ন্যায় আপাত-সুখকর না হইলেও, বা আপাততঃ তিক্ত-কষায় বোধ হইলেও পরিণামে মঙ্গলকর হয়। জগতের বহির্মুখ মাতা, পিতা বা গুরুজন যেসকল মায়াময় বাক্য বলেন, তাহা মধুর বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাতে

আমরা মায়াতেই আসক্ত হইয়া পড়ি। গুরু ও বৈষ্ণব দেহ ও মনের কোনোপ্রকার সুখ বা তৃপ্তি প্রদান করেন না। তাঁহারা নির্ম্মম, তিক্ত ও কঠোর বাক্য বলিয়া দেহের প্রতি আসক্তি ও মনের নানাপ্রকার কুবাসনাগুলিকে ছেদন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের এই কার্য হরিতকীর ন্যায় আপাতত তিক্ত ও কষায় বোধ হয়; কিন্তু সদ্‌গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের সেই সকল উপদেশ বরণ করিলে কোনোদিনই উপকার ব্যতীত অপকার হয় না। জাগতিক গুরুজনগণও জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের স্নেহের পাত্রগণের অমঙ্গল করিয়া ফেলিতে পারেন জানিয়া একমাত্র গুরুদেব ও বৈষ্ণবের হিতকর বাক্যই শ্রবণ করা উচিত। তাঁহাদের উপদেশ পরিপালন করিলে জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্

‘‘ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নৈত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥’’

—কুমারসম্ভবম্ ২।৫৫

ব্রহ্মার বরে তারকাসুর অত্যন্ত উদ্ধত, উৎপীড়নকারী ও দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। দেবতাগণ ঐ তারকাসুরকে বধ করিবার জন্য

ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। ইহাতে ব্রহ্মা বলিলেন—‘‘আমার নিকট হইতে বর লাভ করিয়াই তারকাসুর উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমার নিকট হইতে উহার বিনাশ লাভ অনুচিত; কারণ, বিষবৃক্ষকেও বর্দ্ধিত করিয়া স্বহস্তে ছেদন করা অনুচিত।’’

জগদ্ গুরু ব্রহ্মার বরে যেরূপ তারকাসুর উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্রূপ গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্বাদ গুরুসেবায় নিযুক্ত না করিয়া **গুরু-ভোগস্পৃহা** ও বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব-বিস্তারে নিযুক্ত করিলে জীবের অপরাধের মাত্রা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, তাহাতে আসুরভাব ও ঔদ্ধত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। দেবচরিত্র সাধুগণ **মহাভাগবতবর** গুরুপাদপদ্মের নিকট ঐরূপ গুরুভোগী ও **বৈষ্ণবভোগীর** অত্যাচারের কথা নিবেদন করিলেও যে বিষবৃক্ষ তাঁহার নিকট অপরাধ-ফলে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই বিষবৃক্ষকে তিনি স্বয়ং ছেদন করেন না; পরবর্তীকালে তাহা ভগবদিচ্ছায় বিনষ্ট হয়।

গুরুভোগস্পৃহা—গুরুদেবের অহৈতুকী সেবা করিবার পরিবর্তে তাঁহার দ্বারা নিজের কোনও জাগতিক কামনা পরিপূর্ণ করিবার ইচ্ছা।

মহাভাগবতবর—যিনি উত্তম ভক্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ গুরুদেব।

বৈষ্ণবভোগী—যে বৈষ্ণবকে ভোগ অর্থাৎ তাঁহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার বৈষ্ণবের দ্বারা নিজের জাগতিক স্বার্থ পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা করে।

পশূনাং লগুড়ো যথা

শ্রীকৃষ্ণের পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত শাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করেন। কৌরব-পক্ষের চারি জন বীর শাম্বকে লক্ষ্মণার সহিত বন্ধন করিয়া হস্তিনাপুরে লইয়া যায়। ইহাতে যাদবগণ কৌরবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ না হয়, বলদেব সেজন্য যাদবগণকে সান্ত্বনা দিয়া ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণের সহিত হস্তিনাপুরে গমন করেন।

বলদেব কৌরবদিগকে উগ্রসেনের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, যে, কৌরবেরা বহু ব্যক্তি একত্রিত হইয়া সহায়-শূন্য শাম্বকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাকে অবিলম্বে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করা হউক। ইহা শুনিয়া কৌরবগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয় এবং দাম্ভিকতার সহিত যাদবগণের প্রতি অনেক কটাক্ষ করিতে থাকে; এমনকি, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের বিরুদ্ধেও নানাপ্রকার দুর্বাক্য বলিতে থাকে। শ্রীবলদেব পৃথিবীকে কৌরব-শূন্যা করিবার অভিলাষে যখন হলাগ্র চালনা দ্বারা হস্তিনাপুরীকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করিতেছিলেন, তখন কৌরবগণ ভয়ে শাম্ব ও লক্ষ্মণাকে লইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

"নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬৮।৩১

যাহারা ধন, জন প্রভৃতির গর্বে উন্মত্ত, সেইরূপ অসদ্-ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই কখনও শান্তি ইচ্ছা করে না। পশুদিগকে যেরূপ লগুড়াঘাতদ্বারা দমন করা যায়, সেইরূপ ইহাদিগকেও দমন করিতে হইলে দণ্ড ব্যতীত আর উপায় নাই। দুর্জনেরা উপদেশ শুনিবার লোক নহে। সুতরাং লগুড়ই ইহাদের পক্ষে প্রকৃত উপদেশ।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটি অনেক সময় উচ্চারণ করিয়া হরিগুরু-বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ও বিদ্বেষী ব্যক্তিগণকে উপদেশ না দিয়া দণ্ড-দানের কথাই বলিতেন। শ্রদ্ধা-হীন ব্যক্তির কর্ণে ভক্তির উপদেশ পৌঁছে না। তাহা প্রদান করাও অপরাধ। তাহাদের প্রতি 'যেমন কুকুর, তেমন মুগুর'—নীতিই অবলম্বন করা উচিত।

বৈষ্ণব নিজের প্রতি আক্রমণ বা শত শত কটাক্ষ সহ্য করেন; কিন্তু গুরু ও বৈষ্ণবের নিন্দা হইলে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দায় অধীর হওয়াই প্রকৃত বৈষ্ণবতা। নির্বিশেষবাদিগণ সাধারণ ব্যক্তিগণের সহিত গুরু-বৈষ্ণবকে সমান দর্শন করে বলিয়া তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের নিন্দায়ও কপট-তৃণাদপি-সুনীচভাব ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবার জন্য বৈষ্ণবকে উপদেশ প্রদান করে।

❀

একমনুসন্ধিৎসতোঽপরং প্রচ্যবতে

সংস্কৃত ভাষায় উপরি-উক্ত প্রবাদ বা ন্যায়টি শুনিতে পাওয়া যায়। কোনো এক ব্যক্তি একটি বহুমূল্য কাচের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। সে ঐ ভগ্ন পাত্রের অংশগুলি সম্মিলিত করিয়া উহাকে সংস্কার করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যেমনই সে কোনো অংশ সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, অমনি পাত্রের অপর অংশগুলি পড়িয়া যাইতেছিল।

অনেক সময় কেহ কেহ কোনো বস্তুর অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অন্যান্য বস্তুগুলি হারাইয়া ফেলে। বদ্ধজীবের অবস্থাই এইরূপ। জাগতিক লোক একটি অভাব-অসুবিধা দূর করিতে গিয়া দশটি প্রতিকূল অবস্থা বা অভাবের সম্মুখীন হয়। সংসারের অভাব-মোচনের জন্য ব্যবসায় করিতে গিয়া অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পত্নী-বিয়োগের পর পুত্র-কন্যার পরিচর্যার ভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিতে যাইয়া আরও বহুসংখ্যক পুত্র-কন্যার পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি জড়জগতের অভাব বা অসুবিধা মোচনের দিকে অধিক মনোযোগ প্রদান না করিয়া হরিভজনের অনুকূল বিষয় স্বীকার-পূর্বক শ্রীহরিরই পাদপদ্ম অনুসন্ধান করিবেন। নিত্য-তত্ত্ব কৃষ্ণবস্তুর অনুসন্ধানে অভাব ও অসুবিধার মাত্রা বৃদ্ধি হয় না, তাহা দ্বারা নিত্য মঙ্গলের পথই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

❀

তাতস্য কূপঃ

এক পিতৃভক্ত পণ্ডিত কোনো গ্রামে বাস করিতেন। তিনি বলিতেন—"পিতাই প্রত্যক্ষ দেবতা; তাঁহার কৃপাতেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়া সুখ ভোগ করিতেছি। সুতরাং পিতা ব্যতীত দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা বা ভগবান আমি স্বীকার করি না।" "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"—এই শ্লোকটি ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্বক্ষণ উচ্চারণ করিতেন। পিতার নাম জপ, পিতার মূর্তির ধ্যান, পিতৃপিতামহের তর্পণ, ইহাই ছিল তাঁহার নিত্যব্রত।

এই পণ্ডিতের প্রপিতামহ একটি কূপ খনন করাইয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে এই কূপটির জল এক সময়ে সর্বাপেক্ষা সুমিষ্ট ও নির্মল বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তিন চারি পুরুষ পরে অর্থাৎ এই পণ্ডিতের সময়ে কূপটি প্রায় দেড় শত বৎসরের পুরাতন হওয়ায় উহার জল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং উহাতে অনেক আবর্জনা, পঙ্ক ও নানাপ্রকার তৃণ-গুল্ম-লতাদি পচিয়া কূপটির জল একেবারে অপেয় ও অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ব্যতীত উহাতে দুই একটি ভেকের মৃতদেহ পচিয়া যাওয়ায় উহা দুর্গন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ও নানাপ্রকার রোগের বীজাণু উহাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

পিতৃভক্ত পণ্ডিত তাঁহার প্রপিতামহের খনিত ঐ কূপের জল পান করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পিতা এই কূপের জল ব্যতীত গ্রামের অন্য কোনো পুকুরের বা নদীর জল পান করেন নাই—

এই বিচার করিয়া তিনি নিজেও কখনও অন্য কোনো জলাশয়ের জল পান করিতেন না, বা স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদিকে অন্য কোনো স্থানের জল পান করিতে দিতেন না। পিতৃভক্ত পণ্ডিতটির অনেকগুলি পুত্র-পৌত্রাদি ছিল। তাহারা সকলেই নানা রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পত্নীটিও দূষিত রোগে প্রাণত্যাগ করিল। পণ্ডিত মহাশয়ও কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। গ্রামে কয়েকটি নলকূপ ছিল এবং কয়েক মাইল দূরেই গঙ্গাপ্রবাহিতা ছিলেন। সকলেই পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণের দূষিত কূপের জল ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া নলকূপ অথবা গঙ্গার জল পান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ''তাতস্য কূপঃ'' অর্থাৎ 'আমার পিতৃপিতামহের কূপ, আমি বংশানুক্রমে সেই জলই পান করিতে থাকিব'—এই একগুঁয়েমি হওয়ায় তাঁহাকে অবশেষে নির্বংশ হইতে হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষ ঐ কূপটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য একদিন সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত পণ্ডিত মহাশয় ''তাতস্য কূপঃ'' বলিতে বলিতে কূপটিকে আচ্ছাদন করিয়া তথায় এরূপভাবে বসিয়া রহিলেন যে, বোধ হইল—তাঁহার মৃত্যু না হইলে কোনো রাজশক্তি ঐ কূপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিবে না।

যেহেতু আমার পিতামহ ও পিতা কোনো বিশেষ গোস্বামীর (?) নিকট হইতে মন্ত্র বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমিও বংশানুক্রমে জাতি-গোস্বামীর নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিব, যাঁহারা এইরূপ একগুঁয়েমি প্রকাশ করেন, তাঁহাদের বিচারও

''তাতস্য কূপঃ'' ন্যায়ের বিচারের অনুরূপ। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ যখন কোনো গোস্বামীর (?) নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, বা কোনো বিশেষ কূপের জল পান করিয়াছিলেন, হইতে পারে তখন সেই **মন্ত্রোপদেষ্টা** সত্যসত্যই প্রকৃত গোস্বামী ও সদ্‌গুরু ছিলেন বা সেই কূপের জল সুনির্মল ও উপকারী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যদিও উহার ব্যতিক্রম ঘটে, তথাপি পূর্বের নজির দেখাইয়া বিষাক্ত জল পান বা 'গুরু'-নামধারী সংসারাসক্ত বদ্ধজীবের আশ্রয়-গ্রহণ কখনই নিত্যমঙ্গলের হেতু হইতে পারে না। অনেকে ''কুলগুরু পরিত্যাগ করা অপরাধ''—এইরূপ মেয়েলী শাস্ত্রের কথা বলিয়া অসদ ব্যক্তিকেই 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করেন। তাহাতে তাঁহাদের কোনও দিন মঙ্গল লাভ হয় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেন—''ডাক্তারের পুত্র সকল সময় ডাক্তার হয় না। অতএব ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারি না পড়িলেও তাহাকে ডাক্তার কল্পনা করিয়া যদি বিসূচিকা-ব্যাধির চিকিৎসা করিবার জন্য তাহার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দর্শনী প্রদান করিয়া আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে রোগী নিরাময় হওয়া দূরে থাকুক, মৃত্যুমুখেই পতিত হইয়া থাকে।'' শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—''আরসুলার নাদী-মিশ্রিত অতি পুরাতন ডাল, যাহা কোনোদিনই সিদ্ধ হইবে না, তাহা বাড়ির নিকটে মুদি-দোকানে পাওয়া যায় বলিয়া অলস ব্যক্তি ব্যতীত অপরে কখনই তাহা ক্রয় করে না। যে-স্থানে উৎকৃষ্ট ডাল পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া সে-স্থান হইতেই উহা ক্রয়

মন্ত্রোপদেষ্টা—যিনি মন্ত্রের উপদেশ করেন, দীক্ষাগুরু।

করে। যাহারা নিজেদের মঙ্গল-লাভের প্রতি অতিশয় উদাসীন, অত্যন্ত জড় ও আরামপ্রিয়, কেবল তাহারাই সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করে না।

৯০❀৩

দিদি-শ্বাশুড়ীর ধামা-চাপা

একবার কোনো গৃহস্থের বাড়িতে বিবাহ-উৎসব-কালে একটা বিড়াল বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। বিড়ালের উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহকর্ত্রী বিড়ালটিকে ধামা-চাপা দিয়া তবে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে সেই বংশের বধূরা যখন পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মনে দিদি-শ্বাশুড়ীর 'বিড়ালকে ধামা-চাপা দেওয়া'র কথা স্মরণ হইল। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, বিবাহের দিন যদি বিড়ালকে ধামা-চাপা না দেওয়া যায়, তাহা হইল নিশ্চয়ই কোনো অশুভ হইবে। কি কারণে দিদি-শ্বাশুড়ী বিড়ালকে ধামা-চাপা দিয়েছিলেন, তাহা বিচার না করিয়াই ঐ বংশের বধূগণ অন্ধভাবে উহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। এইরূপেই হিন্দু-সমাজে অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় দেশাচার ও লোকাচারমূলক যে-সকল মেয়েলী 'হিন্দুয়ানি' প্রচলিত হইয়াছে, উহাকেই তথাকথিত আধুনিক হিন্দু-সমাজের ব্যক্তিগণ 'সনাতনধর্ম' বলিয়া প্রচার ও প্রচলন করিতেছেন।

'মেয়েলীশাস্ত্র' ও সনাতন-শ্রুতি-শাস্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আজকাল 'হিন্দু' নামধারী জনসাধারণ অনেকটা 'মেয়েলী হিন্দুয়ানি' চালাইবার জন্য ব্যস্ত। শাস্ত্র-কথা শ্রবণ বা তাহাতে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা তাহারা স্ত্রীলোকদিগের মুখে ধর্মের কথা শুনিয়া তাহাতে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করে। সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইলে নিজের যোগ্যতা ও শরণাগতির প্রয়োজন হয়। সেইজন্য সাধারণ লোকদিগের কেহ কেহ স্বভাবতঃই স্ত্রীজাতির বাধ্য হওয়ায়, তাহারা মেয়েলী শাস্ত্রকেই 'প্রিভি-কাউন্সিলে'র শেষ মীমাংসার ন্যায় মনে করে।

কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, পিতা গুরু হইলেও তিনি জননীর বাধ্য। সুতরাং জননীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহা-গুরু। আবার পত্নীর স্নেহবাধ্য জগৎ, সুতরাং মাতৃবাক্য হইতেও পত্নীর বাক্য অধিক আদরের। ফরাসী দার্শনিক কোমৎ (Comte) বলেন—''মাতা, পত্নী ও কন্যা-ভেদে নারীর সেবকসম্প্রদায়ই পুরুষ। প্রকৃতি-সেবাই জীবের একমাত্র কর্তব্য।'' কাজেই, মেয়েলী শাস্ত্রকে আদর না করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ যদি অন্য কোনো শাস্ত্রের কথা বলেন, তবে তাহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি 'নূতন কথা' বলিয়া মনে করেন ও তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

কতকগুলি লোকের ধারণা এই যে, বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা যেমন ধর্মপরায়ণা, পুরুষেরা সেইরূপ নহে। স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্র অধিক মানে; সুতরাং নারীদের নিকটেই হিন্দুয়ানি পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—''পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ধর্ম-যাজন করিবার অধিক সুবিধা আছে। নারীগণ

অনেক সময়ে পুরুষগণের বিধাতার কার্য করেন। তাঁহারাই পুরুষদিগকে ধর্মপথে লইয়া যান। তাঁহাদের নিকট হইতেই হিন্দুয়ানি শিক্ষা করিয়া আজকালকার তথাকথিত ধর্ম-প্রতিনিধি-গণ হিন্দুর ধর্ম প্রচার করেন।'' ইহারা দিদি-শ্বাশুড়ীর যুগের যে সকল ধামা-চাপা-দেওয়া প্রথার কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহা ছাড়া অন্য সিদ্ধান্তকে সনাতন-ধর্ম বলিয়া মানিতে সম্মত হন না।

'পি পু', 'ফি শো'

দুইজন অত্যন্ত অলস ব্যক্তি একঘরে একসঙ্গে বাস করিত। ঘটনাক্রমে শীতকালের এক রাত্রিতে সেই ঘরে আগুন লাগে। আগুন ক্রমশঃ অধিক জ্বলিয়া উঠিলে প্রথম অলস ব্যক্তির পৃষ্ঠে উত্তাপ লাগিল; তথাপি সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল না। যখন উত্তাপ আর সহ্য করিতে পারা গেল না, তখন প্রথম অলস ব্যক্তিটি অধিক কথা বলিবার পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য অতি সংক্ষেপে দ্বিতীয় অলস ব্যক্তিটিকে বলিল—''পি পু'' অর্থাৎ পিঠ পুড়ছে।' দ্বিতীয় অলস ব্যক্তিটি তখন সংক্ষেপে উত্তর দিল—''ফি

শো'' অর্থাৎ 'ফিরে শো' কিন্তু অগ্নি যতই ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়া নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই অধিক জ্বালা অনুভব করিয়া প্রথম অলস ব্যক্তিটি মনে করিল—''বোধ হয়, রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে, সূর্য উঠিয়াছে, তাই সূর্যের উত্তাপ পিঠে আসিয়া লাগিতেছে।'' ইহা ভাবিয়া সে দ্বিতীয় অলস ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল—''ভাই, দেখ ত' কত রবি জ্বলে?'' দ্বিতীয় অলস ব্যক্তিটি ভাবিল—''কে আর এত পরিশ্রম করে?'' তাই উত্তর দিল—''কেবা আঁখি মেলে?'' ইহা বলিতে বলিতে ঘরের সহিত দুই অলস ব্যক্তিরই দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

'গোঁফখেজুরে' বলিয়া এইরূপ আর একটি গল্প আছে। এক অলস ব্যক্তি গাছে উঠিয়া খেজুর পাড়িতে হইলে পরিশ্রম করিতে হইবে মনে করিয়া, যদি দৈবক্রমে দুই একটি খেজুর তাহার মুখে আসিয়া পড়ে, এই আশায় গাছের তলায় শুইয়া রহিল। এইভাবে অনেকক্ষণ থাকিবার পর একটি খেজুর তাহার গোঁফের উপরে ঝরিয়া পড়িল। হাতটি বাহির করিলেই খেজুরটি মুখের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'কে আর এত পরিশ্রম করিবে', এই ভাবিয়া 'গোঁফখেজুরে' অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিল। একজন লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া 'গোঁফখেজুরে' বলিল—''দেখ ভাই! যদি দয়া করিয়া আমার মুখের মধ্যে তোমার পা দিয়া খেজুরটি ফেলিয়া দাও বড়ই ভাল হয়।'' সেই লোকটির পায়ের আঙ্গুলিতে একট বিষাক্ত ব্যাধি ছিল; খেজুরের মধ্যে সেই বিষাক্ত রোগের বীজ প্রবিষ্ট হইল। 'গোঁফখেজুরে' ঐ খেজুর ভক্ষণ করিবার পর বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইল।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই 'পি পু', 'ফি শো' গল্পটি বলিয়া যাহারা হরিভজনের বা মঠ-বাসের অভিনয় করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় আলস্য প্রকাশ করে, তাহারাও যে মৃত্যুমুখে অর্থাৎ মায়ার কবলে পতিত হয়—ইহা উপদেশ দিতেন। হরিভজনকারীর জীবন আলস্যময় জীবন নহে। সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের অনুগত থাকিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত সর্বপ্রকার সেবা করিতে হইবে। কর্মীর জীবন ফলভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তের জীবন ভক্ত ও ভগবানের ইন্দ্রিয় তর্পণ বা সুখ-বিধানের জন্য। কর্মীর জীবন অপেক্ষাও ভক্তের জীবন অধিকতর নিরলস, তৎপর ও উৎসাহপূর্ণ। পূর্বকালে ব্রহ্মচারিগণ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবার জন্য কিরূপ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতেন, নিজের সুখ বা ফলভোগের দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করিতেন না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—''প্রকৃত নিষ্কপট গুরুসেবক বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। সর্বদা তন্ময় ও নিরলস হইয়া উদয়াস্ত হরিসেবার কার্যে ব্যস্ত থাকিবেন। যে মুহূর্তে কেহ উহা হইতে বিরাম লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, সেই মুহূর্তে মায়া আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিবে। ভক্তিরাজ্যে বিশ্রাম বা পেন্সন্-ভোগের কামনা নাই।''

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে রহস্যচ্ছলে আর একটি গল্প বলিতেন। কোনো অলস 'শিষ্য'-নামধারী ব্যক্তি মালা টানিবার ছলে গুরুসেবা হইতে বিরত থাকিবার ইচ্ছায় গুরুদেবের কোনো সেবাকার্য উপস্থিত হইলেই বলিত—''আমি মালায় আছি।'' কেহ কেহ মুখে এইরূপ না বলিলেও সেবার পরিশ্রম হইতে কিরূপে

নিষ্কৃতি পাইয়া নির্জনে বা নিজের খেয়ালমত শান্তিময় জীবন-যাপন করা যায়, অন্তরে সেজন্য ব্যস্ত। এইরূপ আরামপ্রিয়তার মত ভজনের প্রবল শত্রু আর কিছুই নাই। এই শত্রুকে চিরতরে বিতাড়িত করিয়া নিষ্কপটভাবে ও দীনচিত্তে গুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে প্রবল উৎসাহে হরিসেবা করিতে হইবে।

গোপালসিংহের বেগার

বিষ্ণুপুরে গোপালসিংহ-নামে এক বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। ইনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার রাজ্য মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, অষ্টাদশ ও তদূর্দ্ধ-বর্ষীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলসী-মালিকায় নিয়মিতভাবে হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান তাঁহারা এই আদেশ আনন্দের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাদের হরিনামে রুচি ও বিশ্বাস নাই, তাহারা রাজার আদেশ না মানিলে পাছে দণ্ড ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে লোক দেখাইবার জন্য কোনোরূপে নিয়ম রক্ষা করিতে লাগিল।

কিংবদন্তী এই যে, এক সময়ে মহারাজ গোপালসিংহ সকলে তাঁহার আদেশ যথাযথ-ভাবে পালন করিতেছে কি না, তাহা স্বয়ং

প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ছদ্মবেশে গোপনে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে পর্যটন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি এইরূপে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে কুশল-জিজ্ঞাসাকালে বলিতেছিল যে, তাহাকে 'গোপালসিংহের বেগার' দিতে হইতেছে।

'বেগার' শব্দের অর্থ—অনিচ্ছাপূর্বক বিনা-বেতনে বাধ্যতামূলক খাটুনি। কতকগুলি লোক হরিভজন করিবার অভিনয় করিতে আসিয়া গুরুসেবাকে এইরূপ 'বেগার' মনে করিয়া থাকে। যদি গুরুসেবাদ্বারা কামিনী, কাঞ্চন বা সম্মানের আশা না থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ 'বেগার' খাটিয়া লাভ কী? এইরূপ বিচার অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে রহিয়াছে। গুরুসেবা, বৈষ্ণবসেবা বা কৃষ্ণের সেবায় গুরু, বৈষ্ণব বা কৃষ্ণকে কৃতার্থ করা হয় না বা তাহাদিগের কিছু উপকার করা হয় না। যাঁহারা অকপট-ভাবে সেবা করেন, তাঁহাদিগেরই নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

যাত্রার দলের নারদ

যাত্রাওয়ালা ধীরেন অধিকারী কালী বাগদীকে মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনা দিয়া তাহার যাত্রার দলে ভর্তি করিয়া লইয়াছিল। কালী দেখিতে খুব লম্বা-চওড়া, তাহার গলার স্বরটিও মিষ্ট ছিল।

কাজেই, ধীরেন অধিকারী সবদিক বিবেচনা করিয়া কালীকে দিয়া নারদের অভিনয় করাইত।

কালী বাগদী খুব গাঁজা খাইত, অন্যান্য বহু দোষও তাহার ছিল। যখন নারদের সাজে সাজিয়া কালী আসরে নামিত, তখন তাহার দুইটি রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া অজ্ঞ সাধারণ লোক মনে করিত যে, উহার চক্ষু-দুইটি প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে ঐরূপ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে! বস্তুতঃ নানাপ্রকার নেশা করায় কালীর চক্ষু সর্বদাই রক্তবর্ণ থাকিত। কালী আসরে নানাপ্রকার হাবভাব দেখাইয়া বীণা-যন্ত্রে গান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত।

যাহারা কালী বাগদীকে চিনিত, তাহারা বুঝিতে পারিত যে, তাহার নারদের ভক্তির লেশ হওয়া দূরে থাকুক, সে একজন দুশ্চরিত্র নেশা-খোর, ভক্তির 'ভ'ও তাহাতে নাই, কেবল অর্থ ও সম্মানের লোভেই সে ঐরূপ অভিনয় করিতেছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভক্তের বা সেবকের অভিনয়কারী ব্যক্তিগণকে 'যাত্রার দলের নারদ' বলিতেন। 'যাত্রার দলের নারদ' ও ভক্তশ্রেষ্ঠ 'গুরুদেব নারদ'—এক নহে; অর্থাৎ ভক্তের বা সেবকের অভিনয়কারী ও প্রকৃত ভক্ত কখনই এক নহে। যাহারা সদ্গুরুর নিকট **দীক্ষা** গ্রহণের অভিনয় করিয়া হৃদয়ে অন্য অভিলাষ পোষণ করিতেছে, নিজেকে ও লোককে বঞ্চনা করিতেছে, যাহাদের **দিব্যজ্ঞান**-

---

দীক্ষা—মন্ত্রগ্রহণ।

দিব্যজ্ঞান—ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান। অপ্রাকৃত জ্ঞান।

লাভের চেষ্টা নাই, যাহারা কেবল ভক্তির কাচ কাচিয়া থাকে, অথবা যাহারা মুখে নিজদিগকে গুরু, গোস্বামী, ধর্ম-প্রচারক ইত্যাদি বলিয়া অন্য কার্যে আসক্ত; যাহারা কামিনী, কাঞ্চন ও সম্মানলাভের জন্য ধার্মিকের সজ্জা গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা অন্যান্য কার্যে আসক্ত থাকিয়া ভক্তের 'মুখোষ' ও 'পরচুলা' পরিয়াছে, তাহারা সকলেই 'যাত্রার দলের নারদ', অর্থাৎ তাহারা কেহই প্রকৃত ভক্ত নহে, কপটব্যক্তি।

যত ছিল নাড়া বুনে

কোনো বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়ার সম্মান চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কতকগুলি ঈর্ষা-পরায়ণ অনুকরণ-প্রিয় দল উক্ত কীর্ত্তনীয়ার প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুকরণ করিয়া নূতন নূতন কীর্ত্তনের দল গঠন করিতে লাগিল। যাহারা কোনোদিন কীর্ত্তনের ধার ধারে না; বা সেরূপ কোনো যোগ্যতাও নাই, সেই সকল ব্যক্তিও অর্থ ও সম্মানের লোভে কীর্ত্তনীয়া হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া সেই প্রকৃত কীর্ত্তনীয়া বলিলেন—

''যত ছিল নাড়া-বুনে সবাই হ'লো কীর্ত্তনে',
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ায় করতাল।''

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্তমান জগতের অনুকরণকারী তথাকথিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান-সমূহে শ্রীচৈতন্যদেব ও ভক্তি-সম্বন্ধে সব-জান্তা-মনোভাব ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া এই উক্তিটি করিতেন। প্রকৃত শুদ্ধভক্তশ্রেষ্ঠ মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বহু অন্যাভিলাষী, নির্বিশেষবাদী মিছা-ভক্তগণ ভক্ত ও প্রেমিকের অভিনয় করিতেছে। ইহারা অন্তরে ভক্ত নহে বা ঐকান্তিক সেবা করিবার চিত্তবৃত্তিও ইহাদের নাই। ইহারা নানাপ্রকার অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া লোকদেখা-দেখি একটা হুজুগে পড়িয়া সাময়িকভাবে হঠাৎ ভক্ত বা ধর্ম-প্রচারক সাজিয়া বসিয়াছে।

''কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥''

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অঃ ৭।১১

যে-কোনও লোকই ভক্তিধর্ম-প্রচারকের কার্য করিতে পারে না। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিজ-শক্তি বা নিজের জন ব্যতীত কেবল অবৈধ অনুকরণ করিয়া লোকে হরিকীর্ত্তনকারী গুরুদেব বা শুদ্ধভক্তি-ধর্ম-প্রচারক হইতে পারে না।

কুকুরের লেজ

কুকুরের লেজে পুনঃপুনঃ ঘি মালিশ করিলেও তাহা কিছুতেই সোজা হয় না, বাঁকাই থাকে। যাহার যে স্বভাব তাহা সে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না।

সাধুগণের নিন্দা, তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব-পোষণ, তাঁহাদিগের ছিদ্র-অনুসন্ধান, তাঁহাদিগের প্রতি মৎসরতা, তাঁহাদিগের প্রতি **মর্ত্ত্যবুদ্ধি** (সাধারণ জন্মমরণশীল জীববুদ্ধি), এই সকল খল ও অসৎপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। তাহারা যতই উপদেশ শ্রবণ করুক না কেন, তাহাদিগের অসৎস্বভাব কিছুতেই দূর হয় না।

যাহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ আছে, তাহারা প্রত্যহ শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠ কীর্ত্তন বা শ্রবণের অভিনয় করিয়াও পরমুহূর্ত্তেই বৈষ্ণবের নিকট যাইয়া বলিয়া থাকেন—'আমার পুত্রটির যেন ব্যবসায়ে উন্নতি হয়; তাহার যেন লোকের নিকট সম্মানলাভ হয়।' কখনও বা বলিয়া থাকেন—'আমার শরীর যেন ভাল হয়; আমি যেন মনের শান্তি লাভ করিতে পারি'—ইত্যাদি। হৃদয়ে অন্য অভিলাষ থাকিলে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ উপদেশ শুনিয়াও চিত্ত 'কম্পাসের' কাঁটার ন্যায় বিষয়-ভোগের দিকেই বিনিষ্ট থাকে। প্রকৃত সাধুগণ জন্মজন্মান্তরের এই হরিবিমুখতারূপ স্বভাবকেও কৃপা করিয়া দূর করিবার চেষ্টা করেন; তাঁহারা এত বড় দয়াময়!

মর্ত্ত্যবুদ্ধি—মাটিয়া বুদ্ধি; মনুষ্যবুদ্ধি; পৃথিবী-জাত বস্তু বলিয়া মনে করা।

ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাই নি!

এক জমিদার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার ধনের অভাব ছিল না। সুতরাং লোকের চক্ষুর তৃপ্তি বিধান করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে সম্মান পাইবার আশায় তিনি ঠাকুরকে উত্তম বসন-ভূষণের দ্বারা সাজাইয়া রাখিতেন এবং নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোগ দেওয়াইয়া তাহা আত্মীয়স্বজনগণকে বিতরণ করিতেন।

জমিদারবাবু একটি পূজারী রাখিয়াছিলেন। সে পূজা করিত আর ভাবিত—''ঠাকুরের গায়ে এত অলঙ্কার, এত উত্তম বসনভূষণ, এগুলির একটিও কী আমার লইবার অধিকার নাই? প্রহরীরা চারিদিকে কড়া পাহারা দিতেছে, একটি জিনিসও সরাইয়া ফেলিবার উপায় নাই! নৈবেদ্যের ভাল ভাল জিনিসগুলিও আমার ভাগ্যে জোটে না! তাহাও জমিদারবাবুর আত্মীয়-স্বজনেরাই ভোজন করিয়া থাকে। আমাকে কেবল পাঁচটি টাকা মাহিনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।''

একদিন জমিদারবাবু তাঁহার জমিদারী হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট 'অমৃতসাগর' ও 'অগ্নিশ্বর' কলা আনাইয়া পূজারীর হাতে দিয়া বলিলেন—''ঠাকুর মহাশয়, এই কলাগুলি ভোগ দিয়া সব অন্দরমহলে পাঠাইয়া দেবেন। আজ দূরদেশ হইতে আমার কয়েকজন বন্ধু আসিবেন, এই কলা-প্রসাদ তাঁহাদিগের জন্যই থাকিবে।''

মধ্যাহ্নে ভোগের পূর্বে স্বয়ং জমিদারবাবু কলাগুলি ভোগ দেওয়া হইল কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, মন্দিরের দ্বার ভিতর দিক হইতে বন্ধ রহিয়াছে। পূজারীঠাকুর তখন পূজা করিবার ছলনায় কপাট বন্ধ করিয়া কয়েকটি কদলী ভক্ষণ করিতেছিল ও ভাবিতেছিল—''এইরূপ সুস্বাদু কলা কী আর জীবনে খাইতে পারিব? যখন সম্মুখে পাইয়াছি, তখন ভোগ ছাড়িব কেন? বাবু কী আর সকল কলাই গুনিয়া রাখিয়াছেন? চারিপাঁচটা কলা কম হইলেও তিনি ধরিতে পারিবেন না।''—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন পূজারীটি কলা খাইতেছিল তখন জমিদারবাবু অকস্মাৎ বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—''ঠাকুর ঘরে কে?'' চোরের মন সর্বদাই শঙ্কিত থাকে। কাজেই পূজারীঠাকুর ভয়ে আত্মহারা হইয়া মুখে কদলী চর্বণ করিতে করিতেই বলিয়া ফেলিল, ''কলা খাই না।'' পূজারীর কণ্ঠস্বর ও তাহার ঐরূপ উত্তর শুনিয়াই জমিদার বাবুর আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পূজারী কদলীগুলি উদরস্থ করিতেছে।

যাহারা নানাপ্রকার অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া হরিভজন করিবার অভিনয় করে, তাহারাও প্রকৃত সাধুবৈষ্ণবের নিকট এইরূপেই নিজেদের কপটতা প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। যখনই কেহ অযাচিতভাবে নিজের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করে, কিংবা অপরের সমালোচনায় চঞ্চল হইয়া নিজের সাধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে অন্যাভিলাষ আছে। পৃথিবীর সমস্ত বহির্মুখ লোক

একবাক্যে নিন্দা করিলেও বা স্বার্থপর ব্যক্তিগণ তাঁহার নামে অসংখ্য মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিলেও প্রকৃত সাধু তাঁহার সাফাই গাহিবার জন্য চেষ্টা করেন না। বৈষ্ণব কখনই নিজে নিজের নিন্দার প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু তিনি অপর বৈষ্ণবগণের বা গুরুবর্গের নিন্দা সহ্য করেন না। যাহার হৃদয়ে নিজের সাফাই গাহিবার ইচ্ছা আছে, সে নিশ্চয়ই প্রকৃত দোষী—অন্যাভিলাষী এবং বহির্জ্জগতের সম্মান প্রার্থী।

দশচক্রে 'ভগবান্' ভূত

কোন দেশে ভগবান নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিদ্যাবলে সেই দেশের রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া মন্ত্রীদিগের মনে অত্যন্ত হিংসার উদয় হইল। যাহাতে ভগবান-পণ্ডিতকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায়, মন্ত্রিগণ প্রজাদিগের সহিত মিলিয়া সেইরূপ এক ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা দারোয়ানকে বলিয়া দিলেন—''রাজার আদেশ হইয়াছে, ভগবান পণ্ডিতকে আর রাজবাড়িতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।'' দারোয়ান সেইরূপ কার্যই করিল।

এদিকে রাজা ভগবান-পণ্ডিতকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রিগণকে পণ্ডিতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন—''ভগবান-পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছে।''

মন্ত্রীদিগের চক্রান্তে রাজবৈদ্যও ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। রাজা ভগবান-পণ্ডিতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন।

কিছুদিন পর একদিন রাজা নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, দেখিতে পাইয়া ভগবান-পণ্ডিত সেই সুযোগে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজার সঙ্গে তাঁহার মন্ত্রিগণ ও বহু অনুচর ছিলেন। তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া রাজাকে এমন ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিলেন যে, ঐরূপ জনতা ভেদ করিয়া ভগবানপণ্ডিত রাজার নিকটে যাইতে পারিলেন না। বেগতিক দেখিয়া ভগবান পণ্ডিত এক বৃক্ষের উপর উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! আমি আপনার সেই ভগবান-পণ্ডিত।" রাজা ইহা শুনিয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পারিষদ-বর্গ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ! ভগবানপণ্ডিত 'ভূত' হইয়া ঐ গাছের ডালে বসিয়া আপনাকে ডাকিতেছে। শীঘ্র এই পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলুন।" এতগুলি লোক একবাক্যে যে-কথা বলিতেছে, তাহা কিছুতেই অবিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, এইরূপ বিচার করিয়া রাজা ভগবান-পণ্ডিতের কথায় কর্ণপাত না করিয়াই অন্যপথে চলিয়া গেলেন। তখন ভগবানপণ্ডিত দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা, চক্রের কী শক্তি! দশচক্রে পড়িয়া ভগবান পণ্ডিতকেও ভূত হইতে হইল!"

এই উদাহরণটি দ্বারা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জগতের বহির্মুখ গণমতের প্রভাবে ও চক্রান্তে প্রকৃত

সত্য ও ধর্মের যে-অবস্থা হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেন। জগতের গণমত কোনো আত্মমঙ্গলেচ্ছু বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শুদ্ধভক্তির কথা শুনিতে দিতেছে না; তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেছে—কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি মত বা পথের ন্যায় 'ভক্তিও একটি মত বা পথ। ইহাতে শুদ্ধভক্তির প্রকৃত স্বরূপ কাহারও দৃষ্টিপথে আসিতেছে না। কেহ কেহ উচ্চকণ্ঠে শুদ্ধভক্তির প্রকৃত স্বরূপ জানাইয়া দিলেও বহির্মুখ গণগড্ডলিকা শুদ্ধভক্তিকে জানিতে দিতেছে না। গণগড্ডলিকার চক্রান্তে 'যত মত, তত পথ' এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি এক **একটি উপায়-মাত্র, তাহা উপেয় বা প্রয়োজন নহে,** কিন্তু **ভক্তিই উপায় ও উপেয়** অর্থাৎ **ভক্তির দ্বারা ভক্তিই লাভ হইবে;** জীবের **ভক্তি-ব্যতীত** আর **কোনো বড় প্রয়োজন নাই।**

যাঁহাদিগের ভাগ্য ভাল অর্থাৎ যাঁহারা সদ্‌গুরুদেবের উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা দশচক্রের কবলে পতিত হন না; তাঁহারা গণগড্ডলিকার কথায় পড়িয়া শুদ্ধভক্তির সম্বন্ধে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। শুদ্ধভক্তির আসন—অদ্বিতীয়; একমাত্র তাহাই ভগবানকে বশ করিতে পারে।

মুড়ি মিছরির সমান দর

ভাল জিনিস ও মন্দ জিনিসকে এককার করা উচিত নহে—ইহাই উপরিউক্ত লৌকিক নীতিটির তাৎপর্য। যাহারা মুড়ি ও

মিছরিকে সমান দর বা মূল্য দেয়, বা ঐ দুই জিনিসকে একাকার করে, তাহাদিগের বস্তু-জ্ঞানের অভাব আছে। এইরূপ একাকার করাকে 'গোলে হরিবোল দেওয়া'ও বলে।

'যত মত, তত পথ' বলিয়া যে একটি ছড়া প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ভক্তি ও অভক্তি উভয়েই সমান দর বা আদর দেখিতে পাওয়া যায়। **কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা** প্রভৃতি **সাধনের পথগুলি 'অভক্তি'র পথ,** আর **ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য,** তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন—**এই সকল ভক্তির পথ। পুণ্যকামনা, শান্তিকামনা, মুক্তিকামনা, লয়-কামনা, নির্বাণ-লাভের কামনা**—এই সকল 'অভক্তি', আর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনা, তাঁহার যথেচ্ছাচারিতার নিকট আত্মসমর্পণ প্রভৃতি 'ভক্তি'। কাজেই যাহারা মনে করে—কর্মও যাহা ভক্তিও তাহা; নির্বিশেষজ্ঞান, যোগ প্রভৃতিও যাহা, আর শুদ্ধভক্তও তাহা, মুক্তি ও সিদ্ধিকামনাও যাহা, সেবাকামনাও তাহা; তাহারা মুড়ি ও মিছরির সমান আদর বা উহাদিগকে একাকার করিবার চেষ্টা করে। শুদ্ধভক্তগণ বা শাস্ত্রাদি মুড়ি-মিছরিকে একাকার করেন নাই। গীতায় কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও ভক্তির কথা আছে। কর্মের স্থানে কর্মের প্রশংসা, জ্ঞানের স্থানে জ্ঞানের প্রশংসা, যোগ

লয়—ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত মিশিয়া গিয়া সেবা পরিত্যাগ করা।

নির্বাণ—সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি। "লোভ, ঘৃণা ও মায়ানাশই নির্বান।" (সারিপুত্তের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ)। সুখদুঃখের অনুভূতির অযোগ্য চেতনহীন অবস্থায় পরিণতি।

ও তপস্যার স্থানে তাহাদিগের প্রশংসা করিয়া অন্যান্য সমস্ত পথ পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র কৃষ্ণে ভক্তি ও শরণাগতিকেই সর্বাপেক্ষা মঙ্গলের পথ বলা হইয়াছে। সর্বশেষ বিধির দ্বারা পূর্ব পূর্ব বিধিকে খণ্ডন করা হইয়াছে; কারণ, পরবিধিই বলবান। ভগবান ভক্তিযোগকেই সর্বগুহ্যতম অর্থাৎ সকল গুহ্য উপদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুহ্য উপদেশ বলিয়াছেন।

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি

গাছের উপরে অনেক ফলের কাঁদি (ফলের স্তবক বা গুচ্ছ) থাকে। গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি বা এক থোকা ফল পাওয়া গিয়াছে, মনে করা যেরূপ কল্পনামাত্র, সেইরূপ ভাবভক্তি বা প্রেম লাভ করিবার পূর্বেই কপটতা করিয়া লোকের নিকট ভাবের বিকারসমূহ দেখান বা 'আমার ভাব হইয়াছে', এইরূপ কল্পনা করাও কেবল লোক-বঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা মাত্র। পূর্বে হরিগুরুবৈষ্ণব ও ভক্তিতে শ্রদ্ধা, তৎপর সাধুগণের সঙ্গ, গুরুদেবের ও সাধুগণের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগের অনুগত হইয়া তাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে সর্বক্ষণ নিষ্কপটভাবে জীবন যাপন

করিতে করিতে অনর্থের নিবৃত্তি হয়। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে ভগবানের সেবায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও তৎপর ভাবের উদয় হয়। এই 'ভাব' অস্থায়ী ভাব নহে অর্থাৎ একবার উদিত হইলে তাহা আর কখনও নষ্ট হয় না। ইহাকে 'স্থায়ীভাব' বা 'রতি' বলে। এই ভাব যখন আরও পরিপক্ক হয়, তখনই তাহাকে 'প্রেম' বলে। সুতরাং এই 'ভাব' বা 'প্রেম' লাভ করা মুখের কথা নহে। কতকগুলি লোক অন্য লোকের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিবার জন্য কপটতা করিয়া ভাবের সাত্ত্বিক বিকার-সমূহের অনুকরণ করে। তাহাদিগের বিচার এই যে, তাহারা সাধনের দ্বারা বৃক্ষে আরোহণ করিবার পূর্বেই সিদ্ধি বা ফল পাইয়াছে। ইহাদিগের জন্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণ-কল্পতরু'তে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল ''প্রেম প্রেম'', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥

না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি'
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম ' প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥

* * *

কেন, মন, কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়।
চর্ম্মমাংসময় কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড়বিষয়েতে সদা ধায় ॥
জীবের স্বরূপ-ধর্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম মর্ম,
তাহার বিষয় মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'।
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,

এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥
ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রম-ত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে ॥
নাটকাভিনয়-প্রায়, সকপট প্রেম তায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ দোষ ॥

—কল্যাণকল্পতরু, উপদেশ ১৮-১৯

৯০❀৩

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

কোনো গ্রামে একটি অত্যন্ত **হাবাগোবা** লোক ছিল। গ্রামের জমিদারবাবুর বাগানে একটি খুব বড় কাঁঠালগাছে অনেক উঁচুতে কয়েকটি কাঁঠাল ঝুলিয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ বোকা লোকটির কাঁঠাল খাইবার লোভ হইল। সে এক মুদি-দোকান হইতে কিছু তেল চাহিয়া লইয়া আসিল এবং কাঁঠাল গাছের তলায় বসিয়া তাহার গোঁফে তেল মাখিতে লাগিল। বোকা লোকটির আর কোনো বুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক, অন্ততঃ এই বুদ্ধিটুকু ছিল যে,

হাবাগোবা—বাকশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিহীন।

(বোধ হয় পূর্বের কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে) গোঁফে তেল না মাখিলে কাঁঠালের আঠা গোঁফে লাগিয়া যায়।

গোঁফে তেল মাখিয়া সে কাঁঠাল গাছে উঠিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে একটু উঁচুতে উঠিতে না উঠিতেই পা পিছলাইয়া গাছ হইতে পড়িয়া গেল ও সমস্ত শরীরে আঘাত পাইল; তাহার হাত-পা ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময়ে জমিদারবাবুর মালী আসিয়া ঐ বোকাকে কাঁঠাল-চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। বোকার গোঁফে তেল মাখাই সার হইল, কাঁঠাল খাওয়া আর হইল না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত লৌকিক প্রবাদটির উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, যাহারা সুদুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেম হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়াও উহা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করে, অনর্থযুক্ত অবস্থাতেই তাহা আস্বাদন করিবার কল্পনা করে, তাহারা অত্যন্ত মূর্খ। ইহাদিগকে 'প্রাকৃতসহজিয়া' বলে। ইহারা ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিয়াই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার (?) আলোচনা ও উহা আস্বাদন করিবার চেষ্টা করে। 'কৃষ্ণপ্রেম' বস্তুটি কী তাহা কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা লাভ করিতে হইলে কী ভাবে জীবন গঠন করিতে হয়—সদ্‌গুরুর অনুগত থাকিয়া তাহা অনুসন্ধান করিবার পরিবর্তে 'কৃষ্ণপ্রেম' (?) বা 'মধুর রস' (?) আস্বাদনের লোভ অর্থাৎ ভোগ বাঞ্ছাই ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা কাঁঠালের মধুররসের আস্বাদ পাইবার পূর্বেই, অনেক নীচে থাকিতেই গোঁফে তেল মাখিতে থাকে অর্থাৎ যে কার্য বা চেষ্টা অনর্থ-নিবৃত্তির পরে আবশ্যক, তাহা পূর্বেই আরম্ভ করিয়া দেয়।

উহারা গাছে উঠিবার কৌশল জানে না বলিয়া উহাদের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়, 'চোর' বলিয়া ধরা পড়ে এবং মায়ার দণ্ডলাভ করে।

অতএব **ক্রম-পন্থায়** সাধু-গুরুর অনুগত হইয়া তাঁহাদিগের কৃপায় প্রেম-লাভের জন্য যত্ন করা উচিত। এই ক্রমিক পথ লঙ্ঘন করিয়া অপক্ক অবস্থাতেই প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য মন-গড়া সাধন (!) করিলে মায়ার দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

'ইঁচড়ে পাকা বোষ্টম'

কাঁঠাল যদি অকালে পাকিয়া যায়, তবে তাহা অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়া পড়ে। গরু, ছাগল প্রভৃতি পশু ব্যতীত ঐরূপ স্বাদহীন ফল আর কেহ খাইতে চাহে না।

কতকগুলি ব্যক্তি প্রেমভক্তি লাভ করিতে আসিবার অভিনয় করিয়া ঐরূপ 'ইঁচড়ে পাকা' হইয়া যায়। তাহারা কাম-ক্রোধাদি ষড়্রিপুর নানাপ্রকার চঞ্চলতা থাকা কালেই প্রেমভক্তি-রাজ্যের বড় বড় কথা আলোচনা করে। যে সকল গ্রন্থপাঠে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহারা কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেইসকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অভিনয় করে। অথচ যে-সকল বিষয় কীর্ত্তন ও

ক্রম-পন্থা—(১) সর্বাগ্রে প্রকৃত সাধু-গুরু-বৈষ্ণব, শাস্ত্র, ভগবান ও ভক্তিতে শ্রদ্ধা; (২) সাধুসঙ্গ, (৩) তাঁহাদের অনুগত হইয়া ভজন, (৪) অনর্থনিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা, (৬) রুচি, (৭) আসক্তি, (৮) ভাব ও (৯) প্রেমলাভের এই ক্রম বা সোপান।

স্মরণ করিলে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের মঙ্গল হইবে, তাহারা তাহা করে না; তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 'মধুর লীলা' (?) শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা দেখাইয়া থাকে; কৃত্রিমভাবে লীলা স্মরণ করে; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী ও গীতগোবিন্দ, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠের অভিনয় করিয়া অনধিকার চর্চা করে এবং ইঁচড়েই পাকিয়া যায়। ইহারা নিজেরাই রস-আস্বাদক ভোগী হইতে চাহে বলিয়া ইহাদিগের চেতনের বৃত্তি বিকশিত হয় না ও তাহা কৃষ্ণের ভোগেও লাগে না। এইরূপ ইঁচড়ে পাকা 'বোষ্টম্' **ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারক**-গণকে **শুষ্কজ্ঞানী** বলিয়া মনে করে ও নিজদিগকে 'রসে ডগমগ' কল্পনা করিয়া থাকে। ইহারা ভক্তিরাজ্যের জঞ্জালস্বরূপ।

কুকর্ম্মীর কাণাকড়ি

কর্ম্মী দুই প্রকার—সু-কর্ম্মী ও কু-কর্ম্মী। সুকর্ম্মী পুণ্য কর্ম্ম করিয়া ফলের আকাঙ্ক্ষা করে; আর কুকর্ম্মী কুকর্ম্ম করিয়া সাময়িকভাবে লাভবান হইতে চাহে। সুকর্ম্মীর কর্ম্মের কড়িগুলি ব্যবহৃত হইতে

ভক্তি-সিদ্ধান্তের বিচারক—যাঁহারা ভক্তির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কোনটি ভক্তি। কোনটি অভক্তি, কোনটি রস, কোনটি রসাভাস, কোনটি বিরস, এই সকল বিষয় ভক্তির বিজ্ঞান অনুসারে বিচার করেন।

শুষ্কজ্ঞানী—যে সকল জ্ঞানী ভক্তির বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেবল শুষ্ক বিচারক।

হইতে যখন ফুটা হইয়া যায়, তখন কুকর্মী তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়। ঐ ফুটা কড়িগুলির কোন মূল্য নাই, উহারা বাজারে চলে না। ঐগুলিকেই 'কাণাকড়ি' বলে।

কুকর্মী মনে করে, সে অনেক কড়ির মালিক; বহু অর্থ বহু সম্মান, বহু কামিনী তাহার ভাণ্ডারে আছে। সে ঐ সকল দ্রব্যের দ্বারা ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া রাখিলেও ঐগুলি কাণাকড়ির স্তূপের ন্যায় অকর্মণ্য।

যে ব্যক্তি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করে না, তাহার ভাণ্ডারের সমস্ত দ্রব্যই 'কাণাকড়ি' এবং সেইরূপ ব্যক্তি কুকর্মী।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার একটি গীতিতে গোহিয়াছেন—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা ত' নহে কভু অনিত্য বৈভব।

এই পদসমূহের তাৎপর্য এই যে, কনক অর্থাৎ অর্থের দ্বারা লক্ষ্মীপতি নারায়ণের সেবা করিতে হইবে। শ্রীভগবানের নাম-গুণ-প্রচারে অর্থের নিয়োগই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার—তাহাই পরমার্থ। যে-অর্থ কৃষ্ণের নাম-প্রচারে নিযুক্ত না হইয়া কেবল ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাই 'কুকর্মীর কাণাকড়ি', অর্থাৎ

উহার কোনো প্রকৃত মূল্য নাই। কামিনীগণের চেতন আত্মাকে কৃষ্ণের ভোগে নিযুক্ত করিতে হইবে। যাহারা তাহা না করিয়া কামিনীর স্থূল দৈহিক রূপে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় আত্ম বিসর্জন করে, তাহারা অত্যন্ত মূঢ়। সম্মান বা পূজা একমাত্র গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের সেবাতেই নিযুক্ত করিতে হইবে। যাহারা নিজেরাই পূজালাভের জন্য লালায়িত, তাহারা রাবণের ন্যায় উচ্চ সম্মান-লাভের আশায় চেষ্টা করিয়া অবশেষে আত্মবিনাশই লাভ করে। যাহারা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকে ভোগ করিতে চাহে, তাহারাই কুকর্মী; তাহাদিগের ঐ সকল দ্রব্য কাণাকড়ির ন্যায় নিরর্থক। বৈষ্ণবগণ কুকর্মীর 'কাণাকড়ি'কে কখনও গ্রহণ করেন না। সুকর্মী তাহার কাণাকড়ি দিয়া স্বর্গরাজ্য ক্রয় করিতে চাহে এবং সৎকর্ম দ্বারা স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়া কিছুকাল সুখ-ভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে অবশেষে উহা হইতে মর্ত্যলোকে পতিত হয়; কিন্তু কাণাকড়ি দিয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্য লাভ করা যায় না। যাঁহার কড়ি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত হয়, তিনিই বৈকুণ্ঠপতি অজিত ভগবানকে জয় করিতে পারেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্মীর ভোগের বিষয়কে 'কর্মীর কাণাকড়ি' বলিতেন; কেন না তাহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব গ্রহণ করেন না। অতএব, আমরা কর্মী না হইয়া শুদ্ধ ভক্তের দাসানুদাস হইবার জন্যই যত্নবিশিষ্ট হইব। তাঁহাদিগের পূর্ণ আনুগত্যে সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইলেই তাঁহারা আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

কাঠ-বিড়ালীর সেতুবন্ধন

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে উদ্ধার করিবার জন্য সাগরের উপর সেতুবন্ধন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীরাও তাহাদিগের সামান্য শক্তি-অনুসারে সেই কার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিল। কাঠ-বিড়ালীদিগের ঐ সেবা অতি নগণ্যা হইলেও তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সেবার আনুকূল্য ও তাঁহার সন্তোষ হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেন—জীব সদ্‌গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অনুগত হইয়া অকপটভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম ও প্রেম-প্রচার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলে স্ব-স্ব শক্তি-অনুসারে আচার করিয়া প্রচার করিলে, তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে অতি সামান্য মনে হইলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের সন্তোষ ও সকলের সমবেত ক্ষুদ্রচেষ্টার দ্বারা একটি লোকহিতকর মহৎকার্য সম্পাদিত হইতে পারে।

সেতুবন্ধন-কার্যের মধ্যে পাষণ্ড-দলন ও শুদ্ধ-ভক্তির উদ্ধার—এই দুইটি কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাবণের আদর্শে ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়, নির্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিকে হরণ করিবার চেষ্টা করে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তির অপলাপ করিবার শক্তি কাহারও নাই। পাষণ্ডতাকে দলন করিয়া শুদ্ধভক্তির প্রকৃত স্বরূপ জগতে প্রকাশ-করাই শ্রীরাম-ভক্তের কার্য। বজ্রাঙ্গজী (হনুমান) রামভক্তগণের অগ্রণী। তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিয়া কাঠ-বিড়ালীগুলিও উহাদিগের অতি-সামান্য শক্তিদ্বারা

অকপটভাবে সেতুবন্ধনের যে সাহায্যটুকু করিয়াছিল, তাহাও শ্রীরামচন্দ্র সন্তোষের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। যেরূপ রামভক্তগণের অগ্রণী শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম সেবক শ্রীহনুমান্, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তগণের অগ্রণী-শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম সেবক—শ্রীগুরুদেব। সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা-কার্যের সহায়তা স্ব-স্ব শক্তি-অনুসারে নিষ্কপটভাবে যিনি যতটুকু করিবেন, তাহা অতি সামান্য হইলেও তাহা দ্বারাই তাঁহার ব্যক্তিগত মঙ্গল, জগতের মঙ্গল ও ভগবানের সন্তোষ বিধান হইবে।

❀

গোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া

বঙ্গদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে গৃহস্থ ও কৃষকদিগের গোশালায় একটি বাঁধান উঁচু জায়গায় মাটির গামলা বসাইয়া অথবা লম্বা খাতের মত করিয়া দিয়া তাহাতে খইল, বিচালী ঘাস, খড়কুটা প্রভৃতি গরুর খাদ্যসমূহ দেওয়া হয়। উহার সংলগ্ন যেস্থানে গোমহিষাদি দাঁড়াইয়া ঐ গামলা হইতে খড়, বিচালী প্রভৃতি খায় এবং শুইয়া থাকে, সেই স্থানটি কিছু উঁচু করিয়া তৈরী করা হয়; আর গরু-মহিষাদির পশ্চাৎদিকে ক্রমশঃ ঢালু করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে গোবর বা চোনা প্রভৃতি গরু-মহিষ দাঁড়াইবার ও শুইবার স্থানে জমিয়া থাকিতে না পারে, একেবারে গড়াইয়া নীচে বহুদূরে বহিয়া যাইতে পারে; গরু-মহিষাদির খড় বিচালি প্রভৃতি খাইবার ও দাঁড়াইবার ঐ স্থানটিকেই কোনো কোনো অঞ্চলে 'গোড়া' কহে।

'গোড়া' ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যাওয়া যেরূপ গরু মহিষদিগের পক্ষে অত্যন্ত বোকামি ও বিপজ্জনক, সেইরূপ শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবের সেবা ও দয়া অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টাও চরম মূর্খতা ও অসম্ভব। শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব আমাদিগকে ভগবানের কথা জানাইতে পারেন। ভগবান কী বস্তু, আমরা কী বস্তু, ভগবানের সহিত আমাদিগের কী সম্বন্ধ, আমাদিগের কী কর্তব্য, আমাদিগের ভগবানের সেবা করিবার কী প্রয়োজন—এই সকল কথাই গুরু বৈষ্ণব দয়া করিয়া না জানাইলে তাহা জানিবার জন্য পথ আর নাই। যাহারা গুরুবৈষ্ণবের **আনুগত্য** পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে ভজন করিতে যায়, তাহারা ভগবানের সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না—তাহাদিগের ভগবান, (?) ও ধর্মকর্ম সকলই কাল্পনিক। অতএব তাহারা কখনও ভগবানের প্রকৃত সেবা লাভ করিতে পারে না। গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্য দিয়াই ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেন। গুরু-বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া কেহই ভগবানের নিকট যাইতে পারে না। সম্রাটের নিকট যাইতে হইলে যেরূপ রাজপ্রতিনিধি বা সম্রাটের অধীন কোনো ব্যক্তির অনুমতি লইয়া তাঁহার সহায়তায় তথায় সহায়তায় তথায় যাওয়া যায়, সেইরূপ ভগবানের নিকট যাইতে হইলেও গুরু ও বৈষ্ণবের সহায়তা ও অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়। নিত্যকাল তাঁহাদের অনুগত হইয়া ভগবানের সেবা করাই 'ভক্তি'; আর তাহাদিগের অনুগত না

আনুগত্য—গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে সর্বক্ষণ চলা।

হইয়া ভগবানের সেবার অভিনয়কে অভক্তি বা পাষণ্ডতা বলে।

ভগবানের দর্শন লাভ করিলেও গুরু ও বৈষ্ণবের অনুগত থাকিয়া বা তাঁহাদিগের সঙ্গেই ভগবানের সেবা করিতে হয়। গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ ও অধীনতা ত্যাগ করিলে কোনোদিনই ভগবানে ভক্তি রক্ষা হয় না, বা ভগবান দর্শন দান বা সেবা গ্রহণ করেন না। এতএব গুরু ও বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া ভগবানের সেবা করাই আমাদিগের কর্তব্য।

গুরুর উপর গুরুগিরি

গুরুর উপর ''গুরুগিরি' বা 'খোদার উপর খোদাগিরি' বলিতে শিক্ষাদাতাকেও শিক্ষা দিবার চেষ্টা বুঝায়। কতকগুলি লোক এত দাম্ভিক যে, তাহারা শিষ্যই হইতে পারে নাই, কোটি কোটি জন্মেও পারিবে কিনা সন্দেহ, অথচ তাহারা গুরু ও বৈষ্ণবের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদিগকে নির্ব্বিশেষবাদী বলা যায়।

কেহ কেহ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্যদেবেরও পর্যন্ত ভুল ও দোষ ধরে। ''শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন; তিনি দুর্নৈতিক ছিলেন। রামচন্দ্র স্ত্রৈণ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্ত্রী ও মাতাকে অনাথাভাবে রাখিয়া অন্যায় কার্য করিয়াছিলেন; কিংবা তিনি জগাই-মাধাইর অত্যাচার-কালে 'চক্র' 'চক্র' বলিয়া ডাকিয়া অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন;

তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতেন।" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া খোদার উপর খোদাগিরি করিয়া থাকে।

রামচন্দ্রপুরী নামক এক সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবের বাসগৃহ হইতে কতকগুলি পিপীলিকা নির্গত হইতে দেখিয়া মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করেন, এইরূপ দোষারোপ করিয়াছিল। ইহাই খোদার উপর খোদাগিরি। রামচন্দ্র পুরী তাহার গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীকে কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল যে, যিনি **ব্রহ্মবিৎ** তাঁহার পক্ষে ক্রন্দন করা উচিত নহে। গুরুদেবকে এইরূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা—গুরুর উপর গুরুগিরি বা **নির্বিশেষবাদ**। ইহার ন্যায় পাষণ্ডতা আর কিছুই নাই। ইহাদের কোনও কালে মঙ্গল হয় না। কেহ কেহ ব্যাসের ভ্রান্তি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কেহ বা পাছে ব্যাসকে লোকে ভ্রান্ত মনে করে, এই আশঙ্কা করিয়া ব্যাসের কথার উপর চুন-কাম করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সকল বিচার—গুরুর উপর গুরুগিরি বা নির্বিশেষবাদ। কেহ বা মনে করে, বর্তমান জগতে গুরু ও বৈষ্ণব নাই। পূর্বকালে ভাল ভাল গুরু ও বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছে, এরূপ আর এখন দেখা যায় না। কেহ বা নিজের বুদ্ধিবলে গুরুর ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারে, গুরু ত্যাগ করিতে পারে—এইরূপ

ব্রহ্মবিৎ—যিনি ব্রহ্ম বা ভগবানকে জানেন।

নির্বিশেষচিন্তাস্রোতে—হরিগুরুবৈষ্ণবের সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা বা পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা থাকিতে পারিবে না, তাঁহাদিগকেও প্রাকৃত নীতির আসামী হইতে হইবে, এইরূপ বিচার-প্রবাহ।

দাম্ভিকতারও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল বিচারও—গুরুর উপর গুরুগিরি। বস্তুতঃ 'গুরু' শব্দের অর্থ ভারী। যাহা হইতে বেশি ভার আর কিছুই নাই, তিনিই গুরুদেব। আর যাহাকে শাসন করা যায়, যিনি শাসনের যোগ্য, তিনি—শিষ্য। গুরুদেবকে শাসন করা বা শিক্ষা দেওয়া যায় না। গুরুকে কেহ ত্যাগ করিতে পারে না, লঘুকেই ত্যাগ করা যায়।

কতকগুলি লোক নির্বিশেষ চিন্তা স্রোতে ধাবিত হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া—'তাহারা নিজেরা ভাল, নিজেরা সত্যপ্রিয়, আর যিনি শাসন করেন, তিক্ত বা অপ্রিয় সত্য কথা বলেন, তিনি লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন না বলিয়া তিনি বিপথে চলিয়াছেন, তিনি বিলাসী তিনি প্রতিষ্ঠাকামী; সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে—এইরূপ 'যা'রে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা' নীতি-অবলম্বনে গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে উদ্যত হয়। যাঁহার কৃপায় শক্তিলাভ হইয়াছে, সেই শক্তির দ্বারা তাঁহাকেই হনন করিতে চাহে।

বাণ রাজা মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে মহাদেবের নিকট হইতে এক সহস্র বাহু লাভ করিয়া সেই মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করে। মহাদেব বাণ রাজাকে অভিলাশ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণ রাজার সহস্র বাহুর মধ্যে কেবল চারিটি বাহু অবশিষ্ট ছিল। বাণ রাজা জগতের ভীষণ শত্রুতা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পৌণ্ড্রকও একজন শিবভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকটে বর লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং

তাহাতে বিনষ্ট হয়।

বৃক শিবের ভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। অনেক তপস্যা করিয়া বৃক শিবের নিকট হইতে এক বর লাভ করে যে, সে যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তির তন্মুহূর্তেই মৃত্যু ঘটিবে। বৃক এই বর লাভ করিয়া বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রথমে বরদাতা শিবেরই মস্তকে হস্ত স্থাপন করিতে উদ্যত হয়। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া বৃককে বলেন—''শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি নিজের মস্তকে একবার হস্ত দিয়াই দেখ না কেন, কিছুই হইবে না।'' বৃক নিজের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবা-মাত্রই বিনিষ্ঠ হয়।

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুবাণেই রাবণ নিহত হয়। ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে মহাবর লাভ করিয়া ক্রৌঞ্চ দেবতাগণকে বিতাড়িত করিয়া দেয়, ব্রহ্মা কার্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধে পাঠান। কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন।

যাহারা গুরুর উপর 'গুরুগিরি' করে, গুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত শক্তিদ্বারা গুরুদেবকেই (?) বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্রের দ্বারাই আত্মহত্যা করে।

অতএব গুরুর উপর গুরুগিরি করিবার চেষ্টা না করিয়া গুরুদেবের কৃপার অনুসরণ করাই কর্তব্য।

"নদী শুকালে পার হ'ব"

এক ব্যক্তি অত্যন্ত 'ঘর-পাগলা' ছিল। সে কিছুতেই ঘর ছাড়িয়া অন্য কোনো স্থানে যাইতে চাহিত না। একদিন তাহার এক বন্ধু তাহাকে বলিল—''চল কামিনীমোহন! আমরা দুইজনে সাধু দর্শন করিয়া আসি। শ্রীধাম মায়াপুরে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তিনি পরম মঙ্গলের বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। সেই মহাত্মার নাম—শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিলে মানব-জন্ম-সাধক হইবে।

কামিনীমোহন সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য কিছুতেই গৃহের আরাম ছাড়িতে প্রস্তুত হইল না। তখন তাহার বন্ধু কামিনীমোহনকে এক প্রলোভন দেখাইয়া বলিল—''কুলিয়ার চড়ায় আজ খুব বড় মেলা বসিয়াছে; সেখানে খুব আমোদ-প্রমোদ হইতেছে, না হয়, তাহা দেখিয়া ফিরিয়া আসিও। চল, বেড়াইয়া আসি।''

কামিনীমোহন তামাসা দেখিবার লোভে তাহার বন্ধুর সহিত কুলিয়ার চড়ায় যাইতে প্রস্তুত হইল। বন্ধুর উদ্দেশ্য—কামিনীমোহনকে কোনো কৌশলে কুলিয়ার চড়ায় লইয়া যাইতে পারিলে গঙ্গা পার করিয়াই তাহাকে শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া যাইতে পারিবে।

কামিনীমোহন কুলিয়ার চড়ায় আসিয়া কিছুক্ষণ নানাপ্রকার তামাসা দেখিল। তারপর তাহার বন্ধু তাহাকে গঙ্গার তীরে লইয়া গেল এবং বলিল—''নদী পার হইলেই শ্রীমায়াপুর; চল, একবার

শ্রীধাম দর্শন করিয়া আসি, সেস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটা আছে, মহাপুরুষগণ আছেন, চাঁদকাজীর সমাধি আছে, বল্লালসেনের ভগ্ন প্রাসাদ, বল্লাল দীঘি প্রভৃতি অনেক কিছু দেখিবার জিনিস আছে।"

কামিনীমোহন দেখিল, তাহার বন্ধু যেভাবে তাহাকে ধরিয়াছে, তাহাতে তাহার আর নিস্তার নাই। তখন সে মনে মনে এক বুদ্ধি স্থির করিয়া বন্ধুকে বলিল—"ভাই, নদী পার হইতে আমার বড় ভয় করে। আমি নৌকাতে মোটেই চড়িতে পারি না, চড়িলেই বমি-বমি ভাব হয়, মাথা ঘুরে ও কোন্ সময়ে জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইব, এই ভাবিয়া বুক ধড়ফড় করিতে থাকে। এখন বর্ষাকাল, শীতকাল আসিলে নদী যখন শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন নৌকাতে না চড়িয়া হাঁটিয়াই নদী পার হইতে পারিব। সে সময়ে তোমাকেই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব ও শ্রীমায়াপুরে যাইয়া সব দেখিয়া আসিব।"

কামিনীমোহনের এই কথা শুনিয়া তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল—"দেখ হে, তুমি যে বলিতেছ—নদী শুকাইলে পার হইবে, তাহা তোমার কপটতা। নদীও শুকাইবে না, কোনো দিন পারও হইতে পারিবে না।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গল্পটির উল্লেখ করিয়া গৃহারামী ও আত্মমঙ্গলের বিষয়ে চিন্তাহীন ব্যক্তিগণকে সতর্ক করিতেন। আমরা অনেকেই মনে করি—সংসারের অভাব, অসুবিধা, নানাপ্রকার বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি, দেহের অসুখ, পুত্র-কন্যার শিক্ষা ও বিবাহ, পরিবারবর্গের

ভরণপোষণ—এই সকল কার্য সুসমাপ্ত করিয়া সাধুর কথা শ্রবণ করিতে যাইব। কিন্তু এই সকল বাধা-বিপত্তি ও অভাব অসুবিধা কোনো দিনই যাইবে না, সুতরাং হরিভজনও করিতে পারিব না। জাগতিক অভাব অসুবিধা ত্রিতাপের অন্তর্গত তাপবিশেষ। এইগুলিকে বিতাড়িত করিয়া কেহই এ পর্যন্ত হরিভজন করিতে পারে নাই। যাহারা কল্পনা করে—সংসারের অভাব-অসুবিধা দূর হইলে পরে হরিভজন করিবে, তাহাদিগের হৃদয়ে কপটতা আছে। কবে নদী শুকাইবে, সেইজন্য বসিয়া থাকা আত্মবঞ্চনা, অর্থাৎ নদী পার না হইবারই অভিসন্ধি। অভাব, অসুবিধা প্রভৃতি দূর হইলে হরিভজন করিবার ইচ্ছা হরিভজন না করিবারই কপটতাপূর্ণ সঙ্কল্পবিশেষ। আমরা অনেক সময়ে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ইহা বুঝিতে না পারিলেও ঐরূপ বিচারের অন্তরালে হরিভজন না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করিবারই পিপাসা আছে। বৃদ্ধ-বয়সে হরিভজন করিবার বিচারের মধ্যেও এই জাতীয় চিন্তাস্রোত রহিয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

'জীবন সমাপ্তি-কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।'
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥

সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা-বশে যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন ॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণ-নাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥
—কল্যাণকল্পতরু, প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধি...৪

জলে না নামিয়াই সাঁতার শিখিবার আব্দার

কোনো এক বালকের মাতা তাঁহার পুত্রকে কিছুতেই নদীতে স্নান করিতে দিতেন না। নদীতে স্নান করিবার সময় পুত্র পাছে জলে ডুবিয়া যায়, এই আশঙ্কায় মাতা ঐরূপ করিতেন। একদিন এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী আসিয়া উক্ত বালকের মাতাকে বলিলেন যে, বালককে নদীতে স্নান করিতে না দিলে সে কোনো দিনই সাঁতার শিখিতে পারিবে না; আর সাঁতার না জানিলে বিদেশে গমনাগমন-কালে যখন তাহাকে নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইতে হইবে তখন দৈবাৎ দুর্বিপাকে নদীর জলে পড়িয়া গেলে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে। সুতরাং সাঁতার শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

ইহা শুনিয়া উক্ত বালক প্রতিবেশীটিকে বলিল—''যাহাতে আমি ভবিষ্যতে জলে ডুবিয়া প্রাণ না হারাই তাহার জন্য আমার সাঁতার শিখিবার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু জলে না নামিয়া সাঁতার শিখিবার কোনো কৌশল আবিষ্কার করিতে পারেন কি?'' বালকের মাতাও বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া এই কথার অনুমোদন করিলেন।

হরিভজন না করিলে পরকালে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয় বা নরকে যাইতে হয়, এই সকল কথা শুনিয়া সংসারের লোকসমূহ নিজদিগকে ভবিষ্যৎ কষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু গুরুগৃহে বাস করিয়া কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষা-রূপ হরিভজনের বৈধী প্রণালী গ্রহণ করিয়া হরিভজন করিতে প্রস্তুত হয় না। ইহাতে তাহাদিগের আশঙ্কা, ভয়, সঙ্কোচ, নিরুৎসাহ, জড়তা প্রভৃতি আসে। উহা জলে না নামিয়াই সাঁতার শিখিবার শুভ ইচ্ছার ন্যায় কেবল কল্পনায়ই পর্যবসিত হয়, কার্যত কিছু হয় না। সাঁতার শিখিতে হইলে জলে নামিবার সৎসাহস করিতে হইবে; সেইরূপ হরিভজন করিতে হইলে প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ও সাধুসঙ্গে অবস্থান করিতে হইবে। তাহাতে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন আসিতেছে দেখিয়া যদি ভয় বা সংশয় করিয়া পূর্বেই হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে কোনদিনই হরিভজন হইবে না। হরিভজন-ব্যতীত জীবন মৃত্যু-তুল্য।

'দুই নৌকায় পা'

''দু'নৌকায় পা' দিলে, পড়ে' যা'বে অগাধ জলে।'' যখন দুইটি নৌকা এক সঙ্গে চলিতে থাকে, তখন যদি কেহ সেই দুই নৌকায় দুই পা' রাখিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে নৌকা-দুইটির মধ্যে একটু ফাঁক হইলেই সে জলে পড়িয়া যাইতে পারে। দুই দিকই বজায় রাখিতে গেলে কোন দিকই বজায় থাকে না। বরং শেষে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন—'সংসারও কর, ভগবানকেও ডাক; হাতে কাজ কর, মুখে হরিনাম কর।' এই সকল বিচার—দুই নৌকায় পা' দেওয়ার বিচারের ন্যায়। সংসারও করিব, ভগবানকেও ডাকিব, ইহা অসম্ভব। সংসারে থাকিয়া হরিভজন হইতে পারে। কিন্তু তাহা কৃষ্ণের সংসার হইবে, মায়ার সংসার নহে। মায়ার সংসারে থাকিয়া হরিভজন হয় না; আবার কৃষ্ণের সংসারে থাকিয়াও মায়ার ভজন হয় না। কৃষ্ণের সংসারে সকল কার্য্যই কৃষ্ণের নাম-গুণ-কীর্ত্তনের জন্য—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য করা হয়, নিজের ভোগের বা ত্যাগের জন্য করা হয় না। কেবল বাহিরে সন্ন্যাসী, গৃহী বা বৈরাগী সাজিলেও হরিভজন হয় না। হরির সুখ যাহাতে হয়, অর্থাৎ জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবের সেবার জন্য গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া সকল অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত কার্য করিলেই কৃষ্ণের সংসার-ধর্মপালন বা হরিভজন হয়। যাহারা কৃষ্ণের ভোগের জন্য কতকগুলি কার্য, আর নিজেদের ভোগের জন্য কতকগুলি

কার্য করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের চেষ্টাই—দুই নৌকায় পা' দেওয়ার চেষ্টা।

শুদ্ধভক্তগণ সমস্ত কার্য্যই শ্রীহরিসেবার জন্য করিয়া থাকেন; এমনকি, তাঁহাদিগের মল-মূত্র-ত্যাগ প্রভৃতি কার্যও তাঁহাদিগের ভোগের জন্য না হইয়া শ্রীহরিসেবার অনুকূলেই অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহাদিগের ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেরই মূল উদ্দেশ্য—হরিসেবা। কিন্তু কেহ কপটতা করিয়া নিজের ভোগ চালাইবার জন্যই 'হরিসেবার জন্যই আমি এই সকল করিতেছি'—মুখে এইরূপ বলিলেই অথবা মনে মনে জানিলেই, তাহা হরিসেবা হইবে না। প্রকৃত গুরু ও বৈষ্ণবগণ এই সকল কপটতা ধরিয়া ফেলেন। লোকের চোখে ধূলি দিয়া ও নিজের মনকে ফাঁকি দিয়া এইরূপে দুই নৌকায় পা' দিলে কিছুদিনের মধ্যেই তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে, অর্থাৎ মায়ানদীতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। এইজন্য একমাত্র সাধু-গুরু-কর্ণধারের নৌকায় আরোহণ করিয়া এই দুস্তর ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য।

জগাই বলে, যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী পারের দুর্দ্দশা লভিবে ॥

৯০❀০৩

কামারকে ইস্পাত-ফাঁকি

একজন ব্যবসায়ী নিজেকে অতিশয় বুদ্ধিমান ও চতুর বলিয়া মনে করিত। ধূর্ততা করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়াই তাহার ব্রত ছিল।

একবার সে এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কতকগুলি নারিকেল বিনামূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই নারিকেলগুলি কাটিবার জন্য তাহার একটি ধারাল কাটারীর (দা'র) প্রয়োজন হইল। তাহার ঘরে একটি অতি পুরাতন ও অকর্মণ্য দা ছিল। সে ঐটিকে লইয়া কামার বাড়িতে গেল এবং কামারকে একটি ভাল দা তৈয়ারী করিয়া দিতে বলিল। কামার বলিল যে, উৎকৃষ্ট ইস্পাত সংগ্রহ করিয়া দিলে সে একটি ভাল দা তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে। তখন ঐ ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি কামারের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিল,—"আমি ইস্পাতের ব্যবসায় করিয়া থাকি, আমার নিকট খুব ভাল ইস্পাত আছে। আমি তোমাকে কিছু বেশি করিয়া ইস্পাত দিব। তুমি উহা দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে একটি দা তৈয়ারী করিয়া দিবে। দা তৈয়ারী করিয়া অবশিষ্ট ইস্পাত যাহা থাকিবে, তাহাই তোমার পারিশ্রমিকের মধ্যে ধরিয়া লইবে। আমি তোমার নিকট যে ইস্পাত পাঠাইব তাহা ভারতের কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না, তাহা অতি মূল্যবান।"

এইরূপ বাকচাতুরী করিয়া উক্ত ব্যবসায়ী কার্যকালে একটি নিকৃষ্ট লৌহের পাতকে উৎকৃষ্ট ইস্পাত বলিয়া তাহার পুত্রকে দিয়া কামারের নিকট পাঠাইয়া দিল। কামার ঐ লৌহ দেখিয়াই

বুঝিতে পারিল যে, তাহা ইস্পাত ত' নহেই পরন্তু অতি নিকৃষ্ট লৌহ। কামার ঐ লৌহ দিয়াই বণিককে একটি দা প্রস্তুত করিয়া দিল। উহা নিতান্ত অকর্মণ্য হইয়াছে দেখিয়া বণিক ক্রুদ্ধ হইয়া কামারের নিকটে যাইয়া তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। তখন কামার বলিল—"কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে এইরূপ দা-ই তৈয়ারী হয়।"

যাহারা হরিভজন করিতে আসিবার অভিনয় করিয়াও গুরু ও বৈষ্ণবকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে বা সেবা-কার্যে গোঁজামিল ও ফাঁকি দিতে চাহে, তাহারা ফলপ্রাপ্তি-কালেও ঐ চতুর বণিকের মত মেকি জিনিসই লাভ করিয়া থাকে। হরিসেবায় ফাঁকি দিলে নিজেকেই ফাঁকিতে পড়িতে হয়, অর্থাৎ মায়ার মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হয়, মঙ্গল-লাভ হয় না।

কোনো কোনো অন্যাভিলাষী মনে করে যাঁহারা হরিভজনের জন্য **সর্বস্ব সমর্পণ** করিয়াছেন, তাঁহারা ঠকিয়া গিয়াছেন; আর যাহারা ভোগ ও ভক্তির অভিনয় দুইটিই বজায় রাখিয়া চলিয়াছে তাহারাই জিতিয়াছে। ইহা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার নীতিবিশেষ। ভগবানকে কেহই ঠকাইতে পারে না; চালাকি করিয়া ভগবানের রাজ্য জয় করা যায় না। যিনি ভগবানে নিষ্কপটভাবে শরণাগত হন, তিনিই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

সর্বস্ব সমর্পণ—মন, বাক্য, বুদ্ধি, আত্মা, অর্থ, প্রাণ, দেহ সমস্তই ভগবানের সেবায় অর্পণ; পূর্ণ শরণাগতি।

কর্মকার ও কুম্ভকার

বিলাসপুর গ্রামে বামাচরণ নামে এক কর্মকার (কামার) বাস করিত। সে একদিন হরিপুর-গ্রামনিবাসী তাহার এক বন্ধু কোনো কুম্ভকারের (কুমারের) গৃহে বেড়াইতে গেল। বামাচরণ তাহার বন্ধুর প্রশংসা-ভাজন হইবার জন্য বন্ধুকে তাহার কার্যে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিল। কুম্ভকার হাতুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে পিটিয়া পিটিয়া কতকগুলি হাঁড়ি কলশি নির্মাণ করিতেছিল। বামাচরণ ইহা দেখিয়া একটি হাতুড়ি লইয়া হাঁড়ি ও কলশিগুলি এমন ভাবে পিটিতে আরম্ভ করিল যে, অচিরেই ঐ সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

কর্মকার যে-ভাবে হাতুড়ি পিটিয়া লৌহের দ্বারা কোনো বস্তু তৈয়ারি করে, কুম্ভকার সেইভাবে মৃন্ময় পাত্র নির্মাণ করে না। উভয়ের কৌশল ও প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই ন্যায়টি উল্লেখ করিয়া কর্মী, নির্বিশেষবাদী ও শুদ্ধভক্তের চেষ্টার মধ্যে পার্থক্য শিক্ষা দিতেন। কর্মী মনে করে, ভক্তও যখন হরিসেবার অনুকূল কর্ম করেন এবং ঐ সকল কর্মের আকার যখন বাহিরে দেখিতে একই রূপ, তখন হরিসেবার অনুকূল কর্ম ও জগতের ভোগপর কর্ম উভয়ই একই জাতীয়। বস্তুতঃ উভয় কর্মের প্রণালী ও কৌশলের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। জগতের তথাকথিত নিষ্কাম কর্মগুলিরও কোনো মূল্য নাই, যদি তাহা হরিসেবার সম্পূর্ণ অনুকূল না হয়। যে-কর্মের দ্বারা শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না

হয় আত্মার হরি-সেবাবৃত্তির জাগরণ না হয়, সেই কর্ম যতই ভোগ বা ত্যাগপর হউক, যতই নিষ্কাম বা জগতের তথাকথিত হিতকারক হউক, উহা পরিণামে ভগবানের সেবাবৃত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার চেষ্টাই করে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা নাস্তিকতাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে রতি বা প্রীতির উদয় করায় না। ভক্তের শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও পঞ্চোপাসকের কল্পিত দেবতার পূজা বাহিরে দেখিতে এক প্রকার মনে হইলেও একটি ভক্তি বা সেবাবৃত্তিকে প্রকট করে, আর একটি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার চেষ্টা করে। ভগবান ভক্তের পূজায় ভক্তহৃদয়ে নিত্য আসন প্রতিষ্ঠিত করেন, আর পঞ্চোপাসক উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবারই সাধন করে। নির্বিশেষবাদী ভক্তকে তাহার সাধন-প্রণালীর দ্বারা সাহায্য করিতে উপস্থিত হইলে ভক্তের ক্ষতিই করিয়া থাকে, কোনো উপকার করিতে পারে না।

বোকা মালী ও বোকা পণ্ডিত

বড় লোকের বাড়িতে অনেক প্রকারের জীবই বাস করে। বড় লোকের বাড়িতে এক একখানি ছোট 'চিড়িয়াখানা' বা 'পশুশালা' বলা যায়।

কোনো জমিদারের বাগানে একটি মালী ও তাঁহার সভায় একজন পণ্ডিত ছিল। তাহারা উভয়ে একই জাতীয় ছিল, অর্থাৎ

একজন মালী হইলেও কী করিয়া বৃক্ষের যত্ন করিতে হয়, তাহা জানিত না। আর একজন অনেক অনুস্বার-বিসর্গ মুখস্থ করিলেও তাহার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।

একদিন জমিদারবাবু তাঁহার বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মালী বাবুকে দেখিয়া খুব পরিশ্রমের অভিনয় করিয়া গাছগুলিতে জল সিঞ্চন করিতেছিল। বোকা মালী মনে মনে বিচার করিয়াছিল যে, গাছের শাখায় যখন ফল ধরে, আর ফুল হইতে যখন ফল হয়, তখন শাখা, পত্র ও পুষ্পেই বেশি করিয়া জল দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া সে এক একটি ফুল, পাতা ও শাখা ধরিয়া উহাতে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জমিদারবাবু বোকা মালীকে বলিলেন—"তুমি এ কী করিতেছ? গাছের গোড়ায় জল দিতে হয়। ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায় বা শাখায় শাখায় জল দিলে গাছ বাঁচিবে না, বরং ঐগুলি পচিয়া গিয়া সমস্ত গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া দিবে। তোমার মত বোকা মালী ত' আর দেখি নাই। গোড়ায় জল দাও, অল্প পরিশ্রমে সকল স্থানেই জল পৌঁছিবে। তাহাতে গাছ, পাতা, ফুল সমস্তই বাঁচিয়া থাকিবে, গাছে উত্তম ফুল-ফল ফলিবে।"

জমিদারবাবু বোকা মালীকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ঘরে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার সভাপণ্ডিত-মহাশয় আর এক বোকামি করিতেছেন। মালী লেখা-পড়া না শিখিয়া যে বোকামি করিয়াছে, পণ্ডিতজী লেখাপড়া শিখিয়াও তাহা অপেক্ষাও বেশি বোকামি করিতেছেন। পণ্ডিতজী আসন করিয়া বসিয়াছেন; তাঁহার সম্মুখে পায়সান্ন ও নানা প্রকার ব্যঞ্জন-সংযুক্ত ঘৃতসিক্ত অন্ন রহিয়াছে।

পণ্ডিতজী ঐ অন্নগুলি দিয়া এক একটি পিণ্ড রচনা করিতেছেন, আর এক একটি পিণ্ড লইয়া নিজের কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে, কখনও বা নাসিকার ছিদ্রের মধ্যে, কখনও বা চক্ষুর অভ্যন্তরে, কখনও বা হস্তের উপরে, কখনও বা পায়ের উপরে পিণ্ডগুলি প্রদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন—"ওঁ কর্ণাভ্যাং স্বাহা, ওঁ নাসিকাভ্যাং স্বাহা, ওঁ চক্ষুর্ভ্যাং স্বাহা" ইত্যাদি।

পণ্ডিত মহাশয় বিচার করিয়াছেন—"চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিই সর্বক্ষণ কর্ম করিতেছে এবং আমরা যখন যাহা কামনা করি তৎক্ষণাৎ উহারাই তাহা পূরণ করিতেছে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র কামনা-পূরণকারী ইন্দ্রিয়সকলকে ভোজন না করাইয়া একমাত্র মুখ-গহ্বরে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া প্রাণের তুষ্টি সাধন করা কখনই কর্তব্য নহে। একমাত্র মুখ বা উদরের সাহায্যে প্রাণের সন্তোষবিধান বা পূজা করিবার গোঁড়ামি মূর্খেরাই করিয়া থাকে; আমি 'পণ্ডিত' হইয়া কেন মূর্খগণের পথে চলিব?"

জমিদারবাবু পণ্ডিতমহাশয়ের ঐরূপ আচরণ দেখিয়া প্রথমতঃ অবাক হইলেন, পরে বুঝিলেন যে, ইনি অনুস্বার-বিসর্গ পড়িয়াছেন মাত্র; কিন্তু ইঁহার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান নাই। তখন তিনি পণ্ডিতকে বলিতে লাগিলেন—"পণ্ডিত-মহাশয়! আপনি যে কার্য করিতেছেন, ইহাতে শীঘ্রই আপনি নিজের প্রাণ নিজেই বিনাশ করিবেন। প্রাণে আহার প্রদান না করিয়া আপনি যে খাদ্যদ্রব্যের গ্রাস কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির ছিদ্রের মধ্যে ও চক্ষুর মধ্যে পুরিয়া দিতেছেন, তাহাতে ঐসকল ইন্দ্রিয় অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মুখে আহার না দিলে অন্যান্য যে-স্থানেই যত খাদ্যসামগ্রী প্রদান

করুন না কেন, সকলই ব্যর্থ হইবে এবং আপনিও উপবাসী থাকিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি হারাইবেন। প্রাণের শক্তির দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি হইয়াছে। মানুষের যখন প্রাণ চলিয়া যায়, তখন চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি যথাযথভাবে থাকিলেও পতিরূপী প্রাণ না থাকায় উহাদিগের কার্য-শক্তি থাকে না। অতএব প্রাণে আহার প্রদান করুন।'' শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন—

''যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥''

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৩১।১৪

অর্থাৎ যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকল সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য প্রদান করিলে যেরূপ সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র অচ্যুতে বা শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেবপিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

সকল দেবতার প্রাণ—বিষ্ণু। বিষ্ণু না হইলে কোনো দেবতারই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না; বিষ্ণুর শক্তিতেই অন্যান্য দেবতাগণের শক্তি; বিষ্ণুই পূর্ণশক্তিমান স্বয়ং ভগবান। যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত গাছটিই বাঁচিয়া থাকে ও তাহাতে উত্তম ফল জন্মে; পৃথক পৃথক করিয়া আর পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায় বা ফুলে ফুলে জল দিতে হয় না, সেইরূপ একমাত্র বিষ্ণুর সেবা করিলেই সমস্ত দেবতার সন্তোষ হয়,

কেননা 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।' পৃথক পৃথক ভাবে আর তেত্রিশকোটি বা অনন্ত কোটি দেবতার পূজা করিতে হয় না, আর ঐরূপ সকল দেবতার পূজা করিলে নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না; একমাত্র বিষ্ণু-পূজা করিলেই নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। বিষ্ণুই সকল দেবতার 'প্রাণ' বলিয়া সেই 'প্রাণে'ই সকল আহার প্রদান করা উচিত। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা বহু পরিশ্রম, বহু সাধন ও বেদ-বেদান্ত স্মৃতি প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও 'বোকা' অর্থাৎ বঞ্চিত। অতএব মূল বস্তু 'শ্রীবিষ্ণু'রই সেবা করা কর্তব্য এবং বিষ্ণুর অধীন দাস-জ্ঞানে অন্যান্য দেবতাগণকে সম্মান করা উচিত।

হাতে পাঁজি, 'মঙ্গলবার'

নিজের হাতে পাঁজি (পঞ্জিকা) রাখিয়া 'কবে মঙ্গলবার?'—জিজ্ঞাসা করা মূর্খতা। যখন হাতে পাঁজিই রহিয়াছে, তখন খুলিয়া দেখিলেই 'কবে মঙ্গলবার', তাহা জানা যাইতে পারে।

সদ্‌গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের সুদুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়াও কেহ কেহ এতটা অন্যমনস্ক থাকে যে, তাঁহাদের উপদেশ ধারণা করিতে পারে না। সদ্‌গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা-লাভই—সর্বসিদ্ধ। সুতরাং পৃথক করিয়া আর সিদ্ধি-লাভের জন্য

কৌতূহল বা প্রশ্ন কেবল তাঁহাদের সেবার প্রতি মনোযোগের অভাবই প্রমাণিত করে।

অনেকে হরিনামকে 'হরি' বা 'ভগবান' বলিয়া ধারণা করিতে না পারিয়া 'কোথায় ও কিরূপে হরি পাইব?'—ইহা জিজ্ঞাসা করে। যদি বলা যায়, 'হরিনামই'—সাক্ষাৎ 'হরি'; শুদ্ধভাবে হরিনাম-গ্রহণই হরির দর্শন-লাভ, কলিকালে শুদ্ধনাম রূপেই শ্রীহরি দর্শন দান করেন, তাহা হইলে এই সকল পরম সত্যকথায় অনেকের বিশ্বাস হয় না। ইহা 'হাতে পাঁজি' থাকিতে 'কবে মঙ্গলবার?' জিজ্ঞাসা করার ন্যায় অমনোযোগজনিত কেবল কৌতূহলমাত্র। অন্যমনস্ক থাকিয়া কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টার দ্বারা কোনো মঙ্গল-লাভ হয় না। প্রকৃত 'মঙ্গলবার' জানিতে হইলে অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলের সন্ধান পাইতে হইলে, সন্নিকটেই যে গুরুবৈষ্ণব কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদেরই শরণাগত হওয়া আবশ্যক।

মাকড় মারিলে ধোকড় হয়

এক তন্তুবায় কোনো ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতের নিকট যাইয়া বলিল যে, সে একটা মাকড়সা মারিয়া ফেলিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধান দিলেন, তন্তুবায়কে প্রাণিবধজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তন্তুবায় তাহাই করিল।

একদিন উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র তন্তুবায়ের চক্ষুর সম্মুখেই একটা মাকড়সা মারিল। তন্তুবায় ভট্টাচার্য্যের নিকটে যাইয়া অনতিবিলম্বে তাহা জানাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তাহাতে আর কী হইয়াছে? মাকড় মারিলে ধোকড় (বস্ত্র) লাভ হয়।" অর্থাৎ মাকড়সা মারিলে কাপড়চোপড় পাওয়া যায়।

কর্ম্মজড় স্মার্তগণের বিধিসমূহের অধিকাংশই কপটতাপূর্ণ। তাহারা অপরের জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা করে, নিজেদের বেলায় তাহা রক্ষা করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে সুবুদ্ধি রায় নামক এক মহাত্মা ছিলেন। হুসেন শাহ তখনও বঙ্গের বাদশাহ হন নাই। তখন তাঁহার নাম ছিল হুসেন খাঁ। তিনি সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কার্য করিতেন। সুবুদ্ধি রায় একটি দিঘি খনন করাইতেছিলেন, তিনি হুসেন খাঁকে ঐ কার্য পরিদর্শন করিতে নিযুক্ত করিলেন। হুসেন খাঁ তাঁহার কার্যে অবহেলা করায় সুবুদ্ধি রায় হুসেন খাঁর গাত্রে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন খাঁ যখন বঙ্গের বাদশাহ হইলেন, তখন তিনি সুবুদ্ধি রায়কে নিজের ভূতপূর্ব প্রভু জানিয়া উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হুসেন শাহের বেগম স্বামীর অঙ্গে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া ও তাহা সুবুদ্ধি রায়ের কৃত জানিতে পারিয়া সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করিবার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ পূর্ব-প্রভুকে হত্যা করিতে অসম্মত হইলেন। তখন বেগম সুবুদ্ধি রায়কে অন্ততঃ জাতিভ্রষ্ট করিবার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ জানাইলেন, সুবুদ্ধি

রায়কে জাতিভ্রষ্ট করিলে সে কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিবে না। বাদশাহ বেগমের অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন না দেখিয়া বেগম জীবন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন হুসেন শাহ অগত্যা সুবুদ্ধি রায়কে জাতিভ্রষ্ট করিলেন।

সুবুদ্ধি রায় মনের দুঃখে স্মার্ত পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য একাকী কাশীতে গমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতগণ সুবুদ্ধি রায়কে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিলেন; কোনো কোনো পণ্ডিত অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দিলেন।

বেগম সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অহিন্দু প্রতিহিংসাকারিণী স্বীয় স্বামীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সুবুদ্ধি রায়ের যেরূপ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কাশীর ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতগণও তাঁহার জাতিনাশের প্রায়শ্চিতার্থ সেইরূপ প্রাণত্যাগেরই ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায়ের আত্মার মঙ্গলের বিষয়ে কেহই কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা বলিলেন। মহাপ্রভু তথাকথিত ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতগণের "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" এইরূপ সমস্ত বিধিব্যবস্থা পরিবর্জন করিয়া সুবুদ্ধি রায়কে বৃন্দাবনে গমনপূর্বক সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণনামে সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। নাম-গ্রহণের আভাসেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট

হয়; আর শুদ্ধভাবে জিহ্বায় নাম উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তি ও প্রেম-লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণনামে জীবের চেতনের বৃত্তি পরিস্ফুরিত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদি দৈহিক দণ্ডের দ্বারা অন্তরের শোধন হয় না বা আত্মা বিকশিত হয় না। অতএব পাতক, অতিপাতক, মহাপাতক সমস্তই হরিনামের আভাসেই বিদূরিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা সকলেরই মঙ্গল হইয়া থাকে। ইহাতে কোনো প্রকার কপটতা নাই।

কাজীর কাছে হিন্দু-পরব জিজ্ঞাসা

কাজী অন্য ধর্মের নেতা বা বিচারক। তিনি হিন্দুধর্মের আচার ও প্রচার করেন না। তাঁহার নিকট হিন্দুর পর্বের সম্বন্ধে কোনো মতামত জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত বিষয়ে জানা যাইবে না।

অনেকে স্মার্ত পণ্ডিত বা স্মার্তগণের নেতাদের নিকট কিংবা মায়াবাদীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম বা শুদ্ধভক্তির বিচার প্রার্থনা করেন। জগতের সাধারণ ব্যক্তিগণের সহিত শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্ত লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইলে কতকগুলি লোক জগতের নামজাদা পণ্ডিত বা বিখ্যাত মায়াবাদী ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতা স্বীকার বা বিচার-সভা আহ্বান করিয়া শুদ্ধভক্তির মীমাংসা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল ব্যক্তিকে মধ্যস্থ বা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা 'কাজীর নিকট হিন্দুপরব জিজ্ঞাসা করা'র ন্যায় মূর্খতা। কাজী যেরূপ হিন্দুর পর্বের ধার ধারেন না,

স্মার্ত, মায়াবাদী বা জাগতিক তথাকথিত নামজাদা বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় প্রচারক, হিন্দু সমাজের বড় বড় নেতা—ইঁহারা কেহই শুদ্ধ ভক্তির কোনো ধার ধারেন না। ইঁহারা সকলেই বিদ্ধা ভক্তি, ছলভক্তি বা **লৌকিকী ভক্তির** অভিনয়কে 'ভক্তি' মনে করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদের লৌকিক সম্মান ও গণমতের নিকট উচ্চ আসন দেখিয়া ইহাদের উপর শুদ্ধভক্তির কোনো বিষয়ের মীমাংসার ভার প্রদান করিলে 'কাজীর নিকট হিন্দুর পর্ব জিজ্ঞাসা করা'র ন্যায় ব্যাপার হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে—''বৈষ্ণবগণ বড়ই 'গোঁড়া'। তাহারা আর কাহাকেও মানুষ বলিয়াই স্বীকার করে না!'' বস্তুতঃ এখানে সাধারণের অজ্ঞতাই দায়ী। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না যে, জগতের পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা বা বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। তথাকথিত বড় বড় ধার্মিক নেতৃগণের মধ্যে যদি মায়াবাদ বা অন্য অভিলাষের লেশমাত্রও থাকে, তাহা হইলে তাহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। অনেক সময়ে বাহিরে ভক্তির অনেক **'মুদ্রা'** প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাতে অজ্ঞ সাধারণ লোক উহাদিগকে 'পরম ভক্ত' বলিয়াই মনে করে এবং তাহারাও শুদ্ধভক্তির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ, এইরূপ মনে করিয়া থাকে।

লৌকিকী ভক্তি—সাধারণ লোকে মনের খেয়ালে যাহাকে ভক্তি মনে করে; ভক্তিসম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম হইতে জাত ধারণা অর্থাৎ উহা প্রকৃত-ভক্তি নহে।

মুদ্রা—চিহ্ন, অভিনয়, হাবভাব।

বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যেও নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ ও নির্বিশেষ-বাদের বিচার থাকায় ইহারা শুদ্ধভক্তির সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, তাহাদের নিকট শুদ্ধভক্তির প্রকৃত মীমাংসা পাওয়া যাইবে না।

চোরের মন পুঁই আদাড়ে

চোরের মন সর্বদা পুঁই-লতার ঝোপের অন্ধকার অনুসন্ধান করে। অনেক ব্যক্তিই সাধুগণের নিকট আসিবার অভিনয় করে, তাঁহাদিগের নিকট বাসের অভিনয়, সেবার অভিনয়, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয়ও করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের মন থাকে অন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিবার দিকে। কেহ কেহ সাধুগণের সঙ্গে বাস করিয়াও, তাঁহাদিগের আদর্শ দেখিয়াও তাহা অনুসরণ করিবার পরিবর্তে অনুকরণ করিয়া অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ে। কেহ বা দুই চারিটি জাগতিক লোভের জিনিস—কিছু সম্মান, কিছু জাগতিক পাণ্ডিত্য, ভাল খাওয়া-দাওয়া, জাগতিক বড় বড় লোকের সহিত পরিচিত হওয়া—এই সকল বিষয়ই অনুসন্ধান করে। যেমন, চোর চুরি করিবার জন্য ঝোপের অন্ধকার খোঁজে, সেইরূপ সাধুর নিকট আসিয়াও অন্যাভিলাষী ব্যক্তি কোন্ অন্ধকারে ইন্দ্রিয় তর্পণ করা যাইবে, তাহারই অনুসন্ধানে থাকে। অতএব হৃদয়ে

অন্যাভিলাষ থাকিলে সাধুসঙ্গে ও সেবার অভিনয় করিয়াও প্রকৃত হরিসেবায় হৃদয় আকৃষ্ট হয় না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই নীতিটির দ্বারা সকলকে অন্যাভিলাষ ছাড়িয়া গুরুবৈষ্ণবের শরণাগত হইয়া হরিভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ে অনেক কপটতা ও অন্যাভিলাষ থাকিলেও আমরা যদি গুরুবৈষ্ণবের নিকট সকাতরভাবে আমাদের হৃদয়ের অনর্থের কথা অকপটে ক্রন্দন করিতে করিতে নিবেদন করি এবং যাহাতে ঐ সকল অন্যাভিলাষ দূর হয় তজ্জন্য যত্নের সহিত তাঁহাদের শরণাগত হইয়া সেবা করি, তাহা হইলে আমাদের মন আর ঝোপের অন্ধকারকে অর্থাৎ কপটতাকে আশ্রয়স্থান মনে করিবে না।

৯০❀৩

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার

যখন রাজার হস্তী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন কুকুরগুলি হস্তীর পশ্চাতে 'ঘেউ' 'ঘেউ' করিয়া চিৎকার করিতে থাকে। হস্তী কুকুরের সহিত কোনো বাক্যালাপ বা উহাদের কোনো অনিষ্ট না করিলেও হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিৎকার করাই কুকুরের স্বভাব।

সাধুগণ যখন হিমালয়ের গুহায় বা নির্জনে বসিয়া ধ্যান করেন, তখন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলে না। কিন্তু যখন তাঁহারা লোকের মঙ্গলের জন্য জগতে সত্যকথা প্রচার করিতে থাকেন, তখন যাহারা প্রকৃত মঙ্গল চাহে না তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সাধুদিগকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। কুকুরের দল মনে করে—রাজার হাতি যখন তাহাদের নিকটবর্তী স্থান বা পথ দিয়া চলিতেছে, তখন তাহাদের জায়গায় একজন ভাগীদার আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজার হাতির সম্মান বা উহার বড় শরীর দেখিয়াও কুকুরগুলির হিংসা হয়; এজন্য তাহারা এত 'ঘেউ' 'ঘেউ' করিতে থাকে। জগতের দুষ্ট লোকেরা সাধুগণকে তাহাদের অংশীদার মনে করিয়া এবং তাঁহাদের সম্মান ও বিশেষত্ব দেখিয়া হিংসায় অধীর হইয়া পড়ে। এজন্য তাঁহারা সাধুদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা কুৎসা ও নিন্দা রটনা করিয়া থাকে। রাজার হাতি যেরূপ কুকুরের চিৎকারে একটুও বিচলিত হয় না, তাহাতে ভ্রূক্ষেপই করে না, আপন কাজেই চলিয়া যায়, সাধুগণও সেইরূপ দুষ্টলোকের কুৎসা ও নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভগবানের কথা-কীর্ত্তন ও জগতের হিত সাধন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিজেদের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা রাজহস্তীর ন্যায় জগতের দুষ্ট লোকের নিন্দায় বা প্রশংসায় বিচলিত না হইয়া ভগবানের সেবায় সর্বদা নিযুক্ত থাকিবেন।

৯০❀৩

উলট্ জলে মছ্‌লি চলে

নদীর বিপরীত স্রোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি অনায়াসে সঞ্চরণ করিতে পারে কিন্তু হস্তীর ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ জন্তুকেও ঐ স্রোত ভাসাইয়া লইয়া যায়। মৎস্য জলের শরণাগত বলিয়া বিপরীত স্রোতেও গমনাগমন করা উহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক; কিন্তু হস্তী জলের স্রোতের সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হয় বলিয়া সে বিপরীত স্রোতের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। উহা হস্তীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র ভাসাইয়া লইয়া যায়।

যাঁহারা ভগবানে শরণাগত, তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের কৃপা-লাভ করা সহজ। নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা বিঘ্নের মধ্যে পতিত হইয়াও শরণাগত ভক্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দগতিতে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা নিজের সাধনের বলে ভগবানের দর্শন-লাভ করিবার দাম্ভিকতা পোষণ করে, তাহারা অন্যত্র ভাসিয়া যায়, ভগবানের দর্শন, কৃপা ও সেবা লাভ করিতে পারে না। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সাধক-গণ সাধনের বলে ভগবানের রাজ্য জয় করিতে চাহে; তাহারা শরণাগত নহে। তাহারা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে না। ভক্ত একমাত্র ভগবানের কৃপার কাঙ্গাল তিনি—

''কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল-সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন ॥
* * *

কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাৎ ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥''
* * *
''মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা ॥''

—শরণাগতি

কর্মী, জ্ঞানী, যোগীর চিত্তের ভাব এইরূপ নহে। যদিও কোনো কোনো সময় তাহারা ভক্তের কথার অনুকরণ করিয়া ঐ কথাগুলি মুখে উচ্চারণ করে, তথাপি তাহারা 'আমি ব্রহ্ম', 'ধ্যানধারণা-বলেই সিদ্ধি করতলগত হইবে', 'দাসমনোভাবের দ্বারা মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়', 'আমি আবার কাহার ভজন করিব?' 'আমি সেই', 'আমি আমারই ভজন করি'—ইত্যাদি দাম্ভিকতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করায় হস্তীর ন্যায় গায়ের জোর দেখাইলেও মায়ার স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

"গোলা খা' ডালা"

তিতুমীর ওরফে তিতুমিঞা নামক এক ব্যক্তি এক সময়ে অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সে এক ফকিরের উত্তেজনায় নারিকেল বেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে 'বাদশাহ' বলিয়া পরিচয় দিল ও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তৎকালীন বড় লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক তিতুকে প্রথমে ভয় দেখাইবার জন্য তোপের ফাঁকা আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন। তোপ-দাগা সত্ত্বেও কোনো অনিষ্ট হইতেছে না দেখিয়া তিতুর পক্ষের উৎসাহদাতা ফকির পূর্ব্বোক্ত বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"গোলা খা' ডালা।" অর্থাৎ "গোলায় কিছুই হইতেছে না; কারণ, আমি ইংরেজের গোলা খাইয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছি।" ইহাতে তিতুর দলবল অধিকতর সাহস পাইয়া তাহাদিগের যুদ্ধকে 'ধর্ম্মযুদ্ধ' মনে করিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তখন লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রেরিত কর্ণেলের আদেশে সৈন্যগণ কামান দাগিতে থাকিলে নারিকেল বেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতু গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল; ফকির যুদ্ধ-স্থান হইতে অদৃশ্য হইল; বাঁশের কেল্লার নিকটেই সেনাপতি মাসুমের ফাঁসি হইল ও অনেকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

যাহারা নিজেদের বলবুদ্ধি ভাল করিয়া না বুঝিয়াই বৃথা গর্ব্বে স্ফিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর ও অসার উপকরণ লইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহারাও অসত্যরূপ বাঁশের কেল্লায় আশ্রয় লইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার

স্পর্দ্ধা করিয়া তিতুমীরের যেরূপ পরিণাম হইয়াছিল, সেইরূপ শোচনীয় পরিণাম লাভ করিয়া থাকে।

গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী নির্ব্বিশেষবাদিগণ তাহাদিগের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের কেল্লাকে আশ্রয় করিয়া ও জাগতিক বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, ষড়যন্ত্র দুরভিসন্ধি, কূটনীতি, কুবাক্য-বাণ, কুৎসা, নিন্দা প্রভৃতি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও অসার উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কৃষ্ণের নিজজন ও তাঁহাতে সম্পূর্ণ শরণাগত গুরুবৈষ্ণবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কোনো প্রাণীকেই উদ্বেগ দিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং তাঁহারা প্রথমে কথার দ্বারা ঐ উত্তেজিত দলকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ঐ দলের অবৈধ উত্তেজনাকারী ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণবের কথাকে 'ফাঁকা আওয়াজ' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া "গোলা খা' ডালা" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

ফকিরের বেষভূষা ও তথাকথিত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী দল গুরুবৈষ্ণবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াকেই 'ধর্ম্মযুদ্ধ' মনে করিয়া আরও অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাণান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষে-গতি লাভ না করা পর্য্যন্ত উহারা শান্ত হয় না। যে বা যাহারা উহাদিগকে 'ধর্ম্মোন্মত্ত' করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ করায় এবং যে ব্যক্তি "গোলা খা' ডালা" বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তিই অবশেষে পলাতক হয়, আর উহাদিগের সেনাপতির চরম দণ্ড-(Capital Punishment) লাভ হয়। আত্মবিনাশ বা নির্ব্বিশেষগতিই জীবের পক্ষে চরম দণ্ড; তাহাতেই চেতনের বৃত্তির—সেবাবৃত্তির বিলোপ সাধিত হয়।

তিতুমীর যেরূপ রাজশক্তির একাধিপত্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল, নির্বিশেষবাদী গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী দলও সেইরূপ বৈষ্ণবের একাধিপত্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াই অসত্যরূপে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করিতে ধাবিত হয় ও পরিশেষে আত্মবিনাশ-রূপ নির্বিশেষ গতি লাভ করে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিত্য ও পূর্ণ আনুগত্যই করেন, কখনও তাঁহাদিগের প্রতিযোগী হন না।

৯০❀০৪

হেলে ধরতে পার না কেলে ধরতে যাও

জগতে এই প্রকার দাম্ভিক লোকও আছে, যাহারা সামান্য হেলে সাপ (ঢোঁড়া সাপ) ধরিতে পারে না, অথচ কেলে অর্থাৎ বিষাক্ত কেউটে সাপ ধরিতে ছুটিয়া যায়। ধর্মরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও যাহারা নিজদিগকে 'বাহাদুর', দক্ষ ও সমর্থ বলিয়া প্রচার করিতে উৎসাহী হয়, তাহারা হেলে সাপজাতীয় সামান্য কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলিকেই বশীভূত করিতে পারে না, অথচ তাহারা **অপ্রাকৃত কামদেব** শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন

অপ্রাকৃত কামদেব—মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত বা অতিমর্ত্য কামদেব, আর কাম প্রাকৃত বা মর্ত্য কামদেব।

করিতে অগ্রসর হয়। নীলকণ্ঠই (মহাদেবই) কেবল **কালকূট** বিষ পান করিয়া হজম করিতে পারেন,—এই শক্তি একমাত্র তাঁহারই আছে; কিন্তু ক্ষুদ্র জীব ঐ বিষ পান করা দূরে থাকুক, দূর হইতে উহার ঘ্রাণ করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা আস্বাদন করা দূরে থাকুক, ধারণাই করিতে পারে না। পরম মুক্তপুরুষ ব্যতীত তাহাতে অপর কাহারও অধিকার নাই।

আধুনিককালের তথাকথিত পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও মনীষিগণ জাগতিক পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। ইহা যাহারা হেলে ধরিতে পারে না, তাহাদিগের পক্ষে কেলে ধরিতে যাওয়ার চেষ্টার ন্যায় বিপজ্জনক ও হাস্যকর। তাহারা নিজেরা কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস হইয়া ভগবানকে কামী, ক্রোধী, লোভী প্রভৃতি বলিয়া সমালোচনা করিতে প্রস্তুত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণলীলাকে কেহ কেহ দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, লয়লা-মজনু প্রভৃতি জাগতিক নায়ক-নায়িকার প্রীতি বা ব্যাভিচারের ন্যায় ধারণা করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার উপর চুন-কাম করিবার জন্য উহার **আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা** করে বা উহাকে

কালকূট—কাল (জীবন কাল) কূট (নষ্ট করা), যাহা সেবন করিলে জীবনী শক্তি নষ্ট হয়, এইরূপ সুতীব্র বিষ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—(অধ্যাত্ম + ষ্ণিক), মানসিক বা মনের বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃত বাস্তব লীলার ব্যাখ্যা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত বিষয়বিজ্ঞান নহে, মনঃকল্পিত ব্যাখ্যামাত্র।

রূপক কল্পনার দ্বারা সংশোধিত করিবার চেষ্টা করে। এই সকল চেষ্টাই যাহাদিগের যে কার্য করিবার শক্তি নাই, তাহাদিগের পক্ষে তদপেক্ষা বৃহৎ কার্য করিবার চেষ্টার ন্যায় আত্মম্ভরিতামাত্র।

৯০❀৩

কেঁদে মামলা জেতা

নিজেদের পক্ষে বলিবার কিছুই নাই; কেবল অপরের দয়ার উদ্রেক করিয়া নিজেদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য কতকগুলি লোক ক্রন্দন বা উচ্চ চিৎকার করিয়া থাকে।

ধূর্ত লোক জানে যে, তাহার ন্যায় প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো প্রকার দুর্বলতা আছে। জগতের বিচারক যত বড় পণ্ডিত বা দক্ষই হউন না কেন, তিনিও একজন মানুষ। কাজেই মানুষের দুর্বলতা তাহাতেও নিশ্চয়ই আছে। কোনও লোককে ক্রন্দন করিতে দেখিলে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তির হৃদয়েও সাময়িক ভাবে দয়ার উদ্রেক হয়। আর পৃথিবীতে যে-সকল ব্যক্তি দশটা কথা বলিয়া লোককে ভুলাইতে পারে—তাহাদিগের মায়ায় ও

রূপক-কল্পনা—অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া ব্যাখ্যা বা কল্পনা করা। বাস্তব লীলাকে জাগতিক বস্তু বা বিষয়ের সহিত তুলনা করা। যেমন যমুনাকে সুষুম্না নাম্নী, শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন-লীলাকে জীবের কামাদি রিপু-দমনের সহিত তুলনারূপ কল্পনা।

মোহে পতিত হইবার দুর্বলতাও বিচারকের আছে। কাজেই দুষ্ট অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ সেই সকল কৌশল প্রয়োগ করিয়া জাগতিক বিচারকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

কাঁদিয়া মামলা জেতা বা গলাবাজির জোরে মামলা জেতার অভিনয় ধর্মজগতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের গণগড্ডলিকা প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টিই বা অসৎ—অধিকাংশ সময়েই তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতে প্রস্তুত হয় না, অথচ তাহাদিগের নানাবিধ জাগতিক দুর্বলতা লইয়া তাহারা জাগতিক বস্তুর বিচারকের ন্যায় পরমার্থের বিচারকের আসন গ্রহণ করিবার দাবি করে। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার অভিনয়কারী কতকগুলি ধূর্তলোক সেই সকল যশকামী স্বয়ংসিদ্ধ বিচারকগণের হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে থাকে। কখনও বা গলাবাজির জোরে এক বস্তুকে আর এক বস্তু বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। ইহাতে জাগতিক মায়ায় মুগ্ধ বিচারকের আসন টলটলায়মান হয়, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি সৎ তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিয়া মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মায়াবীর প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। ইহাতে ধূর্তলোকের অভিপ্রায় সিদ্ধি হয়; কিন্তু কার্যকালে এইরূপ বিচারক ও মায়াবী উভয়েই বঞ্চিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কাহারও হরিভক্তিধন প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ হয় না।

৯০❀৩

রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি

রাবণ এক সময়ে অহঙ্কারে স্ফিত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকেও তাঁহার গোলাম করিতে পারেন, এমনকি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকেও (?) হরণ করিতে পারেন, তখন তিনি স্বর্গে যাইবার এমন একটা সুগম পথ প্রস্তুত করিবেন যে, তাহাতে তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ ও পরবর্তী ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র যখন-তখন স্বর্গে গমনা-গমন করিতে পারিবেন। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি পৃথিবী হইতে স্বর্গের দিকে একটি অতি উচ্চ সোপান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিঁড়ি কিছুদূর পর্যন্ত নির্মিত হইলে পর আকাশ পথে অবলম্বনশূন্য হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। রাবণ সোপান-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গের দিকে উঠিতেই, কিছুদূর উঁচুতে উঠিয়াই সিঁড়ির সহিত ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। রাবণের দশটি মাথার বুদ্ধির দৌড় আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

যাহারা ভগবানে একান্ত শরণাগতি বা সদ্‌গুরুর **শ্রৌতবাক্যে** বিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া রাবণের ন্যায় নিজের চেষ্টায় উচ্চে আরোহণ করিতে চাহে, তাহারা অনেক উচ্চে উঠিবার অভিনয় করিয়াও এবং সাময়িকভাবে জগতের লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াও শরণাগতির অভাবে **স্থানভ্রষ্ট** হইয়া অধঃপতিত হয়।

শ্রৌতবাক্য—যে উপদেশ বা সত্য সাক্ষাৎ ভগবান হইতে গুরুপরম্পরায় আসিয়াছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ রাবণের এইরূপ স্বর্গের সোপান-নির্মাণের চেষ্টাকে 'আরোহবাদ' আর শরণাগতি বা ভক্তির পথকে 'অবরোহবাদ' বলিতেন। তিনি আরোহবাদের আর একটি নাম দিয়াছিলেন—**'তর্কপথ'**, আর অবরোহবাদের নাম—**'শ্রৌতপথ'**,; অর্থাৎ একটি নিজের বিচার-বুদ্ধির বলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বস্তু-সম্বন্ধে তর্ক, যুক্তি ও বিচার করিবার চেষ্টা, আর একটি যাহা প্রকৃত সত্য তাহা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া তাঁহার কৃপায় **সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের** দ্বারা বরণ করিবার জন্য আত্মসমর্পণ। রাবণের স্বর্গের সোপান-নির্মাণের নীতির মধ্যে নিজের বাহাদুরীতে দম্ভবশে বড় হইবার চেষ্টা; আর শুদ্ধভক্তিতে বাস্তব সত্যে আত্মনিবেদন ও ধৈর্যের সহিত উপলব্ধি করিবার চেষ্টা রহিয়াছে।

৯০❀০৩

গাছেরও খাব, তলারও কুড়াব

'গাছে যে ফল আছে, তাহাও ভোগ করিব, আর তলায় যাহা পড়িয়াছে, তাহাও আর কাহাকেও লইতে দিব না, নিজেই সমস্ত আত্মসাৎ করিব'—এইরূপ মনোভাব লইয়া আমরা কোনো

স্থানভ্রষ্ট—স্থান অর্থাৎ সত্যের ভূমিকা হইতে চ্যুত।

সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় সেবার জন্য উন্মুখ অর্থাৎ সেবার দিকে গতিবিশিষ্ট।

কোনো সময়ে ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহি। প্রাকৃত সহজিয়াগণ মনে করেন তাহারা ভবিষ্যতে প্রেম-ফল তো' লাভ করিবেই; লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, ভোগ, মোক্ষ প্রভৃতি যে সকল তুচ্ছ ফল প্রেমকল্পতরুর তলায় পড়িয়া থাকে, তাহাও কুড়াইয়া লইয়া আত্মসাৎ করিতে পারিবে।

শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে যোগদানের অভিনয় করিয়াও কোন কোনো অতি চতুর ব্যক্তি মনে করে, চতুরতা করিয়া সে গুরুদেবের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য (?) হইতে পারিবে, বা পারিয়াছে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু কামিনী, কাঞ্চন, সম্মান, নানাপ্রকার লাভ-পূজা প্রভৃতি যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহীরুহের তলায় পড়িয়া থাকে, তাহাও কুড়াইয়া লইয়া আত্মসাৎ করিবে। যাহাদিগের হৃদয়ে কৃষ্ণের সমস্ত সম্পত্তি চালাকি করিয়া ভোগ করিবার অভিলাষ আছে, তাহারা বঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগুরুচরণ-কল্পতরুর সেবায় সমস্ত আহুতি দিতে হয়। যিনি নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার খতিয়ান না করিয়া সর্বস্ব দিয়া সর্বক্ষণ অকপটে সেবাবৃত্তি বিশিষ্ট-থাকেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইতে পারেন। প্রকৃত হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবক প্রেমকল্পতরুর ফল নিজে ভোগ না করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আদেশে তাহা সর্বত্র বিতরণ করিতে করিতে অধিক লাভবান হন। স্বয়ং প্রেমকল্পতরু শ্রীচৈতন্যদেব মালাকাররূপে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে ॥
একলা মালাকার আমি ত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥
অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৯।৩৪-৩৯

দোর্ খোল পা'বে আলো

এক 'আলালের ঘরের দুলাল' যখন যাহা 'আবদার' করিত, তাহার মাতাপিতা তখন তাহাই পূরণ করিত। এইরূপ করিতে করিতে মাতাপিতা বালকটির সর্বনাশ করিয়াছিল। যখন বালক যুবক হইয়া উঠিল তখন সে আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সে মনে করিত, তাহার মাতাপিতা, চাকর, বাগানের মালী প্রভৃতি যেরূপ হুকুম তামিল করে চন্দ্র, সূর্যও সেইরূপই তাহার হুকুম তামিল করিয়া চলিবে।

একদিন সেই যুবক তাহার কক্ষের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া

শুইয়া আছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবার পরও বেলা প্রায় **এক প্রহর** অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার মাতাপিতা মনে করিল পুত্র হয়ত' অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়াছে বলিয়া তাহার উঠিতে বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু যখন দ্বিপ্রহর কাল প্রায় উপস্থিত, তখন সকলে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া উক্ত যুবকের শয়ন-ঘরের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। যুবকটি শয্যায় শয়ান থাকিয়াই বলিতে লাগিল—''আমি এই অন্ধকার রাত্রিতে তোমাদিগকে কপাট খুলিয়া দিব না; তোমরা আমার বহুমূল্য ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিবার জন্য আসিয়াছ।''

যাহারা বাহিরে ছিল, তাহারা সকলেই বলিল—''অনেকক্ষণ হইল সূর্য উঠিয়াছে প্রায় দ্বিপ্রহর উপস্থিত; তুমি দরজা খোল।''

যুবকটি উত্তর করিল—'' লোকে সূর্যকে ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করে। আমি তো' সূর্যের কোনো শক্তিই দেখিতেছি না। আমি এই শীতের সময়ে কষ্ট স্বীকার করিয়া সুখপ্রদ শয্যা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না; সূর্যের যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে এখানে তাহার আলোক প্রবেশ করাইয়া তাহার মহিমা প্রদর্শন করুক।''

তখন সকলে বলিতে লাগিল—''তুমি দরজা খুলিলেই ঘরে আলোক পাইবে।''

"দোর্ খোল, পা'বে আলো"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গল্পটি উল্লেখ করিয়া এই শিক্ষা দিতেন যে, কতকগুলি লোক মনে করে

এক প্রহর—দিবারাত্রের ৮ ভাগের এক ভাগ, তিন ঘণ্টা।

যে, 'ভগবান দয়াময়'—ইহা কেবল কথার কথা বা তাঁহার স্তাবকগণেরই বাগাড়ম্বর মাত্র। ভগবান্ যদি সত্য সত্যই দয়াময় হইবেন, তবে তিনি এরূপ নিষ্ঠুরতা করিয়া সংসারে নানাপ্রকার যন্ত্রণা, ক্লেশ ও মায়া রাখিয়াছেন কেন?

আবার কতকগুলি লোক এমনই অলসপ্রকৃতির যে, তাহারা বলিয়া থাকে—''ভগবান যদি সর্বশক্তিমানই হন, তবে আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাদিগের প্রবৃত্তিকে ফিরাইয়া দেন না কেন?'' ইহাদিগের বিচার ঠিক ঐ 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত। ইহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র কক্ষের সমস্ত জানালা ও দরজা বন্ধ করিয়া মায়াশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আর এতটা আরামপ্রিয় ও তমোভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কিছুতেই মায়া-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দ্বার খুলিতে প্রস্তুত হইতেছে না। সূর্যদেব বা ভগবান তাহাদিগের জন্য দরজা জানালাগুলিও কেন খুলিয়া দেন না অর্থাৎ তাহাদিগের চাকর, প্রজা, রাইয়ত বা বাগানের মালির কাজ করেন না?—এইরূপ বলিয়া তাহারা ভগবানকে দোষারোপ করিতে উদ্যত!

সূর্যদেব সর্বদাই আলোক বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন; তাহাতে ধনী, দরিদ্র, রাজপ্রসাদ বা কুটীরের বিচার নাই, যে দরজা খুলিবে, সে-ই আলোক পাইবে; যে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবে, বা তাহা উন্মোচন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিবে না, সে আলোকও পাইবে না। ভগবান সর্বদাই তাঁহার করুণা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক জীবকে তিনি স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন ইচ্ছা (free will) দান করিয়াও তাঁহার করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

করিয়াছেন। তিনি জীবকে জড়-বস্তু করেন নাই, চেতন করিয়াছেন; তাহাকে স্বাধীনতা-রত্ন দান করিয়াছেন। ইহা ভগবানের অশেষ করুণারই পরিচয়। কিন্তু জীব যদি সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার না করে, তমোগুণ ও জাড্য পরিহার করিয়া দ্বার উন্মোচন না করে, তবে ভগবানের করুণা সর্বত্র প্রসারিত থাকিলেও ঐরূপ মায়ার কবলে কবলিত জীবের কক্ষে সেই জীবেরই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলে করুণার আলোক প্রবেশ করিবে না। ইহাতে সেই জীবই দায়ি। ভগবানকে যদি সেই জীবের প্রবৃত্তিকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জীব জড়বস্তু হইয়া পড়ে, তাহার চেতনধর্ম অর্থাৎ স্বাধীনতা আর থাকে না। অতএব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া দরজা খুলিয়া দাও, ভগবানের অযাচিত আলোকসম্পাতে উদ্ভাসিত হইবে।

৯০❀০৪

নেড়া ক'বার বেলতলায় যায়?

এক নেড়া বেলতলা দিয়া বাজারে যাইতেছিল, এমন সময় একটা বড় পাকা বেল গাছ হইতে খসিয়া তাহার মাথায় পড়িল। তাঁহার মাথা নেড়া বলিয়া আঘাতটা খুব বেশি লাগিল। অন্য একদিনও ভ্রমবশতঃ বেলতলায় গিয়া তাহার ঐরূপ দশাই হইল। তখন হইতে আর সে বেলতলা দিয়া যাইত না। একদিন তাহার কয়েকজন বন্ধু সেই বেলতলা দিয়া অন্যত্র যাইতেছিল। তাহারা ঐ নেড়া বন্ধুটিকে তথায় ডাকিলে সে বলিল—''ন্যাড়া আর ক'বার বেলতলা যায়?'' অর্থাৎ 'একবার যে কাজ করিয়া ঠকিয়াছি, বা তাহাতে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি, জীবনে আর কখনও সে কাজ করিব না।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই নীতিটি উল্লেখ করিয়া বলিতেন—জগতের লোক ভোগের সংসারে কত কষ্ট পাইতেছে, তথাপি তাহারা ঐ ন্যাড়ার ন্যায় বুদ্ধি লাভ করিতেছে না, আবার বেলতলায়ই যাইতেছে। যে বুদ্ধিমান, তাহার একবারের তিক্ত অভিজ্ঞতাতেই জ্ঞান হয়। মায়ার সংসারে জীবের এত কষ্ট দেখিয়াও যাহারা মায়ার সংসারে প্রবিষ্ট হইতে চাহে, তাহাদের ন্যায় নির্বোধ আর কেহ নাই।

৯০❀০৪

ফেল কড়ি, মাখ তেল

''কড়ি অর্থাৎ নগদ পয়সা ফেল, তারপর তেল লইয়া গায়ে মাখ''—ইহাই পৃথিবীর বানিজ্যনীতি। যে পরিমাণ পয়সা দিবে, উহার বিনিময়ে সেই পরিমাণ ভোগ লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইহাকেই পার্থিব **'অপবৈশ্যনীতি'** বলিতেন। ইহাই কর্মী-সম্প্রদায়ের নীতি।

অপবৈশ্যনীতি—বৈশ্য বা ব্যবসায়ী দুই প্রকার—সদ্‌বৈশ্য ও অপবৈশ্য। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বা গুরুবর্গের সেবার জন্য বাণিজ্য করেন, তাঁহারা সদ্‌বৈশ্য; আর যাহারা নিজের ভোগসুখ বা স্বার্থের জন্য ব্যবসায় করেন তাহারা অপবৈশ্য; তাহাদের নীতি।

জগতের যে প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ, তাহা এই নীতির দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। কর্ম্মীগণ যে কর্ম্ম করে, তাহা কেবল নিজ নিজ ভোগ বা **অপস্বার্থ-সিদ্ধির** জন্য। তাহারা যাহাকে নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম কর্ম্ম বলে, তাহার অন্তরালেও শান্তি, সিদ্ধি বা মুক্তি-কামনা লুক্কায়িত থাকে। কোনো কোনো কর্ম্মী বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কোনো ফললাভের জন্য কর্ম্ম করিতেছেন না, কেবল চিত্ত-শুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করিতেছেন এবং সেই কর্ম্ম নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থ কর্ম্ম। কিন্তু এই চিত্তশুদ্ধির কামনার অন্তরালে শান্তি বা সিদ্ধি-কামনা গুপ্তভাবে লুক্কায়িত আছে। অতএব উহাও ''ফেল কড়ি, মাখ তেল'' এই নীতির ন্যায় ভগবানের সহিত **অপবণিক** বৃত্তি চালাইবার চেষ্টা।

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ এই নীতিকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার বাণী এই—''যস্তু আশীষ আশাস্তে, ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্'' অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাহে, সে ভৃত্য নহে, সে বণিক মাত্র; আর যে প্রভু ভৃত্যকে কোনো পার্থিব বস্তু দান করেন, তিনিও প্রভুর কার্য না করিয়া

অপস্বার্থসিদ্ধি—স্ব [নিজ বা আমার] অর্থ—প্রয়োজন। প্রকৃত স্ব বা আত্মার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দেহ ও মনকে 'আমি' মনে করিয়া উহাদের অর্থ বা প্রয়োজন অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগের অভিলাষ-পরিপূরণ।

অপবণিক—অপবৈশ্য ও অপবণিক একই কথা। ভগবানের সহিত যাহারা অবৈধ বাণিজ্য করিতে চাহে অর্থাৎ ভগবানের নিকট হইতে ভোগ-মোক্ষ, শান্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি লাভের জন্য যাহারা তাঁহার পূজার অভিনয় করে।

বঞ্চকের কার্য করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তির রাজ্যে ''ফেল কড়ি, মাখ তেল''—এই নীতি নাই; তথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অহৈতুক আত্মসমর্পণ (Unconditional surrender)। এই ভক্তিনীতি বা শরণাগতির কথা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ এইরূপ গাহিয়াছেন—

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।

ভকতি-বিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥
—শরণাগতি

খট্বা-ভঙ্গে ভূমিশয্যা

কোনো এক ব্যক্তি তাহার বিবাহকালে শ্বশুরবাড়ি হইতে একটি খট্বা (খাট) যৌতুকস্বরূপ পাইয়াছিল। শ্বশুর মহাশয় অতি অল্প মূল্যের খাটটি জামাইকে দিয়া বঞ্চনা করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই খাটটি ভাঙ্গিয়া গেল; তখন জাবাইবাবু পাছে লোকের নিকট সম্মানের লাঘব হয়, এই আশঙ্কায় অতিশয় বিরাগি সাজিল। তখন সে লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, এই পৃথিবীর ভোগ, সুখ সব অনিত্য; উত্তম শয্যা; স্ত্রী-পুত্র কিছুই নিত্য নহে। সে তখন মাটিতেই কোনোরূপে সামান্য বিছানা পাতিয়া লোকের নিকট তাহার বৈরাগ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে লাগিল।

খাট ভাঙ্গিয়া গেলে বা খাটের অভাবে যে ভূমিতে শয্যা, তাহা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠাশা অর্থাৎ সম্মানের কামনা আছে। মায়াবাদিগণ যে স্ত্রী, পুত্র, সংসার বা পৃথিবী প্রভৃতির প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করে, তাহা ঐরূপ। এই-সকল বস্তু চিরকাল থাকে না, উহা নানা-প্রকার অশান্তি ও ক্লেশ আনয়ন করে, এ-জন্যই তাহারা উহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া

উহাদিগকে ত্যাগ করে। এই ক্রোধ অনুরাগেরই এক প্রকার লক্ষণ! যদি ঐসকল দ্রব্য ক্লেশ প্রদান না করিত, তবে তাহারা ঐসকল বস্তুকে ভোগ করিতে বিরত হইত না—উহাদের প্রতি ক্রোধও করিত না। ইহা যেন না পাইয়া বৈরাগ্য। খাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খাট নাই, তাই ভূমির আদর। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ এইরূপ বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা ভগবানের সুখের জন্য ভোগ ত্যাগ করেন। তাঁহারা জানেন,—ভগবানই একমাত্র সমস্ত বস্তু ভোগ করিবার মালিক। ভোগ একমাত্র তাঁহারই একচেটিয়া। জীবের ভোগ বা ত্যাগ করা—কোনোটিই ধর্ম নহে। জীব সমস্ত বস্তু ভগবানের ভোগের জন্য প্রদান করিবেন। ভগবানের উচ্ছিষ্ট বা অবশেষমাত্র ভগবৎসেবাময় জীবন ধারণের জন্য গ্রহণ করিবেন। কোনো বস্তুর প্রতি বিরক্ত বা আসক্ত হইবেন না।

মাছের বাসা গাছের আগায়

"মাছের বাসা, গাছের আগায়,
কাকের বাসা জলে।
দুর্য্যোধনের, উরু-ভঙ্গ,
মাণিকতলার খালে ॥"

—এইরূপ যে কোনো একটা পদ্য বা সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক হইলেই কতকগুলি লোক উহাকে ধর্মশাস্ত্র বলিয়া ধারণা

করে এবং উহা জনসাধারণের মধ্যে অতি সহজে প্রচারিত হইয়া পড়ে। সাধারণ লোক প্রকৃত সত্য ও সিদ্ধান্তের বিচার না করিয়া গণগড্ডলিকা যাহা লুফিয়া লইতেছে, তাহাকেই 'সত্য' বলিয়া মনে করে। 'গাছের আগায় মাছের বাসা, জলের স্রোতে কাকের বাসা বা কলিকাতার মাণিকতলার খালে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ' হওয়া সম্ভবপর নহে।

এইরূপ অনেক অযৌক্তিক মত ধর্মরাজ্যেও বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—

''ঢেকি ভজে' যদি এই ভব-নদী,
পার হ'তে পার বঁধু;
লোকের কথায় কিবা আসে যায়,
পিবে সুখে প্রেম-মধু ॥''

***

''উদ্দেশ্যে নাহিকো ভেদ,
এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
যোগ, ভক্তি, পুণ্য এক উপাদানে গঠিত।
এক দয়া, এক স্নেহ,
এক ছাঁদে গড়া দেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত এক বর্ণ লোহিত ॥
ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্য স্থান,
যে যেমন পারে, ট্রেনে ইষ্টীমারে
হোক্ সেথা আগুয়ান ॥''

এইরূপ নানাপ্রকার ছড়ার মধ্য দিয়া 'যত মত, তত পথ' বলিয়া এক মতের প্রচার হইয়াছে। 'যত মত, তত পথ' ছড়াটি শুনিতে ভাল, ইহাতে সকল হাঙ্গামাও চুকিয়া যায়, সকলের সহিত 'গোলে হরিবোল' দিয়া চলা যায়, সকলেরই মনোরক্ষা হয়, অর্থাৎ এক কথায় সর্বতোভাবে লোকরঞ্জন করা যায়। এই গণবাদের যুগে 'লোক-ভজা'ই একমাত্র ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের এক প্রধান পার্ষদ লিখিয়াছেন—

"গৌর-ভজা লোক-রক্ষা একত্র নিষ্ফল"

এই সকল সারগর্ভ উপদেশ কেহ শুনিতে চাহে না, সত্যের বিচার করিতেও চাহে না। 'ঢেঁকি-ভজন' ও 'হরিভজন'—এক নহে। পূর্বলিখিত ছড়াগুলির মধ্যে কিছু কিছু যুক্তিও আছে। কিন্তু সেই যুক্তির মধ্যে যে-সকল ভ্রম রহিয়াছে, তাহা কেহ বিচার করিতে চাহে না। তথায় গণগড্ডলিকার চিন্তাস্রোতঃই উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়ে।

হিরণ্য-কশিপুর উদ্দেশ্য ও প্রহ্লাদের উদ্দেশ্য—এক নহে, রাবণের উদ্দেশ্য ও ভক্তবীর হনুমানের উদ্দেশ্য—এক নহে, ঠাকুর হরিদাস ও ঢঙ্গ বিপ্রের উদ্দেশ্য এক নহে, সীতা ও সূর্পণখার কামনা এক নহে, পূতনা ও যশোদার উদ্দেশ্য এক নহে, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের উদ্দেশ্য এক নহে। কর্মীর উদ্দেশ্য—ভুক্তি বা স্বর্গ-সুখাদিলাভ; যোগীর উদ্দেশ্য বিভূতি বা সাযুজ্যলাভ; জ্ঞানীর উদ্দেশ্য ব্রহ্মলয় বা নির্বাণলাভ; আর ভক্তের উদ্দেশ্য—একমাত্র কৃষ্ণের সেবা ও প্রেম-লাভ। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীর স্বর্গ ও মোক্ষ-কামনাকে ভক্ত নরক অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করেন।

স্বর্গাদি-সুখ-কামনাতে ও মুক্তিবাসনাতে ভক্তি বিলুপ্ত হয়। কর্মের ট্রেণ বা যে কোনো যান চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যাইতে পারে; জ্ঞান ও যোগাদি-ট্রেনের শেষ সীমা—বিরজা নদী; কিন্তু ভক্তির যান জীবকে বৈকুণ্ঠ ও তাহারও উপরে গোলোকে লইয়া যায়। ভক্তি ও পুণ্য এক উপাদানে গঠিত নহে, চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত পুণ্যের স্থান; কিন্তু চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তিলতার স্থান নাই।

যাঁহারা 'যত মত, তত পথে'র ছড়াকে আদর করেন, তাঁহারা যুক্তি দিয়া বলিয়া থাকেন—যেমন এক জলকেই কেহ 'পানি', কেহ 'অপ্', কেহ 'ওয়াটার' (Water) বা কেহ 'একোয়া' (aqua) বলিয়া থাকে; সেরূপ এক ভগবানকেই কেহ 'বিষ্ণু', কেহ 'শিব', কেহ কালী', কেহ 'সূর্য', কেহ 'গণেশ', কেহ বা অন্যান্য নামে ডাকিয়া থাকে।

যদি বস্তু এক না হয়, তাহা হইলেও কি ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিলে একই বস্তু পাওয়া যাইবে? কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, হরি, নৃসিংহ, ইহা একই বিষ্ণু-বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু শিব, দুর্গা, শক্তি, সূর্য প্রভৃতি সেই বিষ্ণুর নিকট হইতে শক্তিপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবতা, তাঁহারা স্বয়ং ভগবান নহেন; তাঁহারা ভগবানের সেবক বটেন; ভগবানের সেবকের ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া ডাকিলে তাঁহারা উত্তর দিবেন; কিন্তু 'ভগবান' বলিয়া ডাকিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন। একজন পুলিশকে 'সম্রাট এডওয়ার্ড' বলিলে পুলিশের প্রতি বিদ্রূপ করা হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহের অপরাধও হইয়া থাকে। কোনো পুলিশ সম্রাটের মুকুট ও রাজদণ্ড ধারণ করিতে পারে না, রাজসেবকের

চিহ্নসমূহই ধারণ করিতে পারে। সম্রাটের মহিষীকে অপরে ভোগ করিতে পারে না, একমাত্র সম্রাটই পারেন। কাজেই বিষ্ণুতত্ত্ব ও আধিকারিক দেবতা-তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন নাম এক নহে।

প্রকৃত সত্য বিষয় বিচার না করিয়া সাধারণ লোক কতকগুলি লৌকিক যুক্তি ও সাধারণ ভ্রমের (Common Errors-এর) মোহে পতিত হইয়া কল্পিত ছড়াকেই শাস্ত্রবচন বলিয়া ভ্রান্ত হয়।

আমার হৃৎকমলে, বামে হে'লে

এক সময় এক ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিতেছিল—"আমার হৃৎকমলে, বামে হে'লে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।" ঐ ব্যক্তির গলার সুর ও হাবভাব দেখিয়া সাধারণ লোক তাহাকে খুব বড় কৃষ্ণপ্রেমিক ও কৃষ্ণভক্ত মনে করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি কীর্ত্তনের মুখে ঐ গানটি গাহিতেছিল এবং তাহাতে নানাপ্রকার আখর দিতেছিল। সাধারণ লোক যাহাকে 'ভক্তি' মনে করিয়া মুগ্ধ হইতেছিল, শুদ্ধবৈষ্ণব তাহাকে ভক্তির পরিবর্তে 'ভুক্তি' বা 'ভোগ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেন—ঐ জাতীয় গানের মধ্যে কেবল ভগবানকে ভোগ করিবার পিপাসাই আছে, সেবা করিবার কোনোই আন্তরিকতা নাই। এজন্য শ্রীল

প্রভুপাদ ঐ গানের পদের সহিত এই আখরটি যোগ করিতেন—
"ওগো আমার বাগানের মালি"

কৃষ্ণ যেন আমাদের বাগানের মালী, আমাদের রাইয়ত, আমাদের প্রজা, আমাদের হুকুম তামিল করিবার লোক, আমাদের খান্‌সামা বা আজ্ঞা সরবরাহকারী (Ordersupplier)। আমরা যখন যেরূপভাবে তাঁহাকে ভোগ করিতে চাহিব, তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইবেন! কোনো শুদ্ধভক্তই ভগবানের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইবার জন্য তাঁহাকে ঐরূপভাবে ডাকেন না। ইহা ভগবানের সেবা নহে, ভগবানকে ভোগ করিবারই চেষ্টা। জগতে ঐইরূপ **প্রচ্ছন্ন** ভোগি-সম্প্রদায় 'ভক্ত' বলিয়া পরিচিত হন। এই শ্রেণির কপট লোককে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বা ঐরূপ গান গাহিতে দেখিলেই অতত্ত্বজ্ঞ লোক ভুলিয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ বলেন—"ভগবান তাঁহার ইচ্ছা হইলে, দর্শন প্রদান করুন, আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, দর্শন প্রদান না-ই করুন, তাহাতে আমার কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি যেন নিত্যকাল তাঁহার অহৈতুকী সেবা করিতে পারি—ইহাই চাই। তাঁহার সুখ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই আমার সুখ, আমার যাহাতে সুখ, তাহা ভক্তি নহে—তাহা ভোগ, আর তাঁহার যাহাতে সুখ, তাহাই 'ভক্তি' বা 'প্রেম'।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৪র্থ পঃ

৪০❀৩

প্রচ্ছন্ন—গুপ্ত

"গৌরাঙ্গ ছাড়তে পারি ত' দাড়ি ছাড়তে পারি না"

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বের কথা। এক ব্যক্তি নিজেকে কোনো **আচার্য-বংশের অধস্তন** বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাউল-দরবেশদিগের ন্যায় ঐ ব্যক্তির খুব লম্বা দাড়ি ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ঐরূপ গুম্ফ (গোঁফ), **শ্মশ্রু** (দাড়ি) প্রভৃতি রাখাকে অভদ্রবেশ বলিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত 'আচার্য-সন্তানকে' শ্রীচৈতন্যদেবের মতের বিরুদ্ধে ঐরূপ গুম্ফ ও লম্বমান শ্মশ্রু রাখিতে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি আচার্যসন্তান হইয়াও কিরূপে বড় দাড়ি রাখিয়াছেন? ইহাতে ঐ ব্যক্তি নানারূপ তর্ক উঠাইয়া বলিলেন—"বাহ্য বেশের সহিত ভক্তির কি সম্বন্ধ আছে? বিশেষতঃ বৌবাজারের আর্ট ষ্টুডিওর একটি ছবিতে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর লম্বমান শ্মশ্রু দেখিতে পাওয়া যায়।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদা বলিলেন—"কোনও আর্ট ষ্টুডিওর কল্পিত ছবি কিছুতেই সত্য বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না।"

বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তিটির দাড়ির প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তাই অবশেষে সেই ব্যক্তি একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—"যদি দাড়ি না ছাড়িলে বৈষ্ণবধর্ম রক্ষা করা না যায়, বা গৌরাঙ্গের

আচার্য-বংশের অধস্তন—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের বংশধর। 'আচার্য' শব্দের অর্থ—গুরুদেব বা বৈষ্ণবধর্মের নিয়ামক, সংরক্ষক ও পালক।

উপাসনা না হয় তাহা হইলে আমি 'গৌরাঙ্গ' ছাড়তে পারি তথাপি দাড়ি ছাড়তে পারিব না।''

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনেক সময় ''গৌরাঙ্গ ছাড়তে পারি ত', দাড়ি ছাড়তে পারি না''—এই কথাটি বলিয়া কুবিষয়ের প্রতি আমাদিগের আসক্তিকে ছেদন করিতে উপদেশ দিতেন। যাহাদিগের নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে আসক্তি, যেমন—কাহারও মৎস্য-ভোজনে, কাহারও পান, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য-সেবনে, কাহারও বা গুম্ফ-শ্মশ্রু প্রভৃতি সংরক্ষণের প্রতি আসক্তি আছে, কেহ বা হৃদয়ের দুর্বলতা-বশতঃ শিখা, তুলসীর মালা বা তিলকাদি ধারণ করিতে লজ্জা বোধ করে, তাহারা অনেক সময়ে তাহাদিগের ঐ কার্যকে নানাপ্রকার কুযুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে চাহে। মৎস্য-মাংসপ্রিয় বা মাদক-দ্রব্যে আসক্ত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে, হরিভজনের সহিত আহারের কোনো সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এখানে যে তাহারা 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতেছে, নিজেদের মনকে ঠকাইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের ঐ সকল বিষয়ে প্রবল আসক্তি আছে বলিয়াই তাহারা ভগবান ও ভক্তের প্রিয় কার্যের অনুবর্তন ও তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহে না, নিজেদের আসক্তিকে কুযুক্তির দ্বারা সমর্থন ও সংরক্ষণ করিতেই চাহে। তিলক, মালা, শিখা প্রভৃতি ধারণ করিলে বহির্মুখ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবে, এই ভয়ে তাহারা সাধুর কার্যের অনুবর্তন করিতে চাহে না। আবার সেইরূপ হৃদয়ের দুর্বলতাকে নানাপ্রকার কুযুক্তির

দ্বারা সমর্থন করিয়া থাকে। যখন কোনো শুদ্ধবৈষ্ণব এই সকল কপটতা ধরাইয়া দেন, তখন তাহারা হৃদয়ের প্রকৃত কথাটি ক্রোধ প্রকাশচ্ছলে ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ তাহারা গৌরাঙ্গকে পরিত্যাগ করিতে পারে তথাপি অন্যাভিলাষ বা জড়বস্তুতে আসক্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদিগের ভক্তির অভিনয়গুলি যে কপটতা, তাহা এইরূপ উক্তির মধ্যেই ধরা পড়ে।

হজমিগুলি সাজা

হাতুড়ে চিকিৎসকের তথাকথিত হজমিগুলি পেটের ভিতর গিয়া হজমের সাহায্য করিবার পরিবর্তে বদহজম ও ভেদবমি করাইয়া থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তি সমস্ত জীবন সংসারের কার্যে গর্দভের ন্যায় পরিশ্রম করিতে করিতে যখন সমস্ত বল বীর্য হারাইয়া একেবারে অকর্মণ্য জরদ্গবতুল্য হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের অন্য কার্য করিবার শক্তি না থাকিলেও তাহারা বোকা দুর্ভাগা লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তিকে নষ্ট করিয়া বেড়ায়। ইহাকেই 'হজমিগুলি সাজা' বলে। এই সকল অকর্মণ্য ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা তাঁহাদের ছিদ্র অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের চেষ্টা ও বহু বোকা দুর্ভাগা লোকের অমঙ্গল করিয়া বেড়ায়।

বহু সৌভাগ্য-ফলে জীবের হৃদয়ে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার অঙ্কুর উদ্গত হয়। এই শ্রদ্ধার অঙ্কুরকে সর্বদা নিষ্কপট সাধুজনের সঙ্গের বেষ্টন দিয়া রক্ষা করিতে হয়; নতুবা যে কোনো মুহূর্তে পশুতুল্য অসদ্ব্যক্তিগণ তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

অনেক সময় নির্বোধ বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ ঐ সকল অকর্মণ্য ব্যক্তিকে প্রাচীন ও অভিজ্ঞ মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গ করে, বা তাহাদিগের অযাচিত উপদেশ শ্রবণ করিতে সময়ক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহারাও তখন হাতুড়ে চিকিৎসকের 'হজ্মিগুলির' ন্যায় ঐ সকল বোকা দুর্ভাগা লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেদ ও বমি উৎপন্ন করে অর্থাৎ সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাকে উৎপাটিত করিয়া দেয়।

কোনো এক ব্যক্তি প্রাচীন বয়সে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে বাসের অভিনয় করিয়াছিলেন। অন্য কোনো কার্য না থাকায় তিনি লোকের নিকট গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্র গাহিয়া বেড়াইতেন ও বোকা লোকের কোমল-শ্রদ্ধাকে বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি পত্রে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন—

''গৃহব্রত ধর্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাহাদের প্রয়াস এবং যাঁহারা বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া 'হজমিগুলি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও

কৃষ্ণগৃহধর্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণু-প্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।''

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড

৯০❁৩

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ

হরকান্ত চক্রবর্তী গ্রামের মধ্যে বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। গ্রামের লোকেরা বলিত—''চক্রবর্তী মহাশয় ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোনো দ্রব্য স্পর্শও করেন না।'' এক পৌষ-সংক্রান্তির দিনে চক্রবর্তী মহাশয় গৃহিণীর ভোজনের জন্য বাজার হইতে কিছু খৈ কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাপটায় খৈগুলি কাগজের ঠোঙ্গা হইতে উড়িয়া যাইতে লাগিল, এমন সময়ে চক্রবর্তী মহাশয় তাহার সম্মুখে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া ''গোবিন্দায় নমঃ'' বলিয়া উড়ো খৈগুলিকে গোবিন্দের (?) উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিলেন। এদিকে চক্রবর্তী মহাশয়ের গৃহিণী তাঁহার স্বামীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। সরল বালক পথে পিতাকে দেখিতে পাইয়া সকলের সম্মুখেই অন্তঃপুরের কথা সরলভাবে বলিয়া ফেলিল—''বাবা। মা খৈ খাইবার জন্য বসিয়া রহিয়াছে। খৈগুলি কোথায়?'' বালক

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় চক্রবর্তী মহাশয় অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন।

যাহারা নিজেরা ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ বাহিরে লোকের নিকট হইতে ধার্মিকের প্রতিষ্ঠা পাইতেও ইচ্ছুক, সেই সকল ব্যক্তির সাধুতা বা ধার্মিকতার অভিনয় কেবল কপটতামাত্র। খৈগুলি নিজের ভোগের জন্যই আনীত হইয়াছে, কিন্তু দৈবক্রমে ঐগুলি ভোগ করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া উহাকে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবার অভিনয় ভগবানের প্রকৃত সেবা নহে। বিষয়ী ব্যক্তিগণ শত চেষ্টা-সত্ত্বেও ধন, জন প্রভৃতি রক্ষা করিতে না পারিলে, ''ভগবান, সবই তোমার, তুমি রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে মারিতে পার''—এইরূপ যেসকল উক্তি করিয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শরণাগতির কথা নহে। উহা ''উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ'' বাক্যের ন্যায় কপটতা মাত্র। কপটতা থাকিলে ভগবান কখনও সেবা গ্রহণ করেন না।

গরু মেরে জুতো দান

কাঞ্চনপুরের জমিদার হিরন্ময় রায়চৌধুরী লোকের নিকটে খুব দাতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই গ্রামেরই এক ব্রাহ্মণপত্নী হিরণ্ময়বাবুর দানশীলতার কথা শুনিয়া স্বামীকে তাঁহার নিকট হইতে পুত্রের জন্য একজোড়া জুতা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ হিরণ্ময়বাবুর নিকটে যাইয়া তাহার পুত্রের জন্য একজোড়া জুতা প্রার্থনা করিলে প্রথমতঃ হিরণ্ময়বাবু পাদুকা ক্রয় করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে একটি টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন—''আমি আপনার নিকট টাকা প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণী তাহার পুত্রের জন্য একজোড়া জুতা ভিক্ষা করিতেই আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইতেছে। বিশেষতঃ অর্থদান অপেক্ষা ব্রাহ্মণের চরণ-সেবার জন্য পাদুকা-দানই অধিকতর ফল-দায়ক।''

হিরণ্ময়বাবু দেখিলেন যে, তিনি যদি ব্রাহ্মণকে পাদুকা দান করিতে না পারেন, তাহা হইলে ''দ্বিতীয় দাতা কর্ণ'' বলিয়া তাঁহার যে সম্মানটি হইয়াছে, তাহা আর থাকে না। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার এক চর্মকার প্রজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্রাম্য চর্মকারের নিকট পাদুকা-নির্মাণের উপযুক্ত চর্ম না থাকায় তিনি একটি গরুকে হত্যা করিয়াই ব্রাহ্মণকে পাদুকা দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কর্মিগণ অনেক সময়ে এইরূপ উৎকট ভক্তি (?) দেখাইয়া থাকে। তাহারা পাপ, এমনকি অপরাধের সাহায্যেও পুণ্য ও সম্মান লাভ করিবার চেষ্টা করে। কোনো কোনো কর্মিসম্প্রদায়ের যুক্তি এইরূপ যে—শাস্ত্র ও ভগবানের প্রতি অপরাধ করিয়াও যদি মনুষ্যের কোনো দৈহিক বা সাময়িক উপকার করিতে পারা যায় অর্থাৎ তাহাদিগের ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাই প্রকৃত সৎকার্য। ক্ষুদ্র জীবকে 'নারায়ণ' বলিলে শাস্ত্র উহাকে পাষণ্ডতা ও চরম অপরাধ বলে বলুক, তদ্দ্বারা শ্রুতিরূপা

গোমাতা বা ভগবানকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করা হয় হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই, তথাপি জগতের নিকট ''পরমার্থী'' বলিয়া সম্মান-লাভ বা নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধন হইলেই সর্বার্থ সিদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণকে পাদুকা দান করিতে যাইয়া গো-হত্যা হয় হউক, জীবকে 'নারায়ণ' বলিতে যাইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ হয় হউক, তাহাতে এক শ্রেণির কর্মোন্মত্ত কর্মীবীরের দৃক্‌পাতও নাই। যাঁহারা প্রকৃতভাবে বস্তু বিচার করেন, তাঁহারা এইরূপ প্রণালীকে আদর করেন না। ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া পৃথিবীর সাময়িক উপকার করিবার চেষ্টা কখনই প্রশংসার্হ নহে। উহাতে দাতা ও দানকারী উভয়েই অপরাধে লিপ্ত হয়। যে-সকল নির্বিশেষবাদী কর্মী জীবকে 'নারায়ণ' বলিয়া উৎকট জীবপ্রেম (?) বা বিশ্বপ্রেমের (?) পরিচয় প্রদান করে এবং যাহারা উহাদিগের দান গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই অপরাধপঙ্কে পতিত ও নরক পথের পথিক হয়।

ঌ❀ও

উপর দিকে থুতু ফেলা

এক আদুরে বালক মাতাপিতাকে আকাশ হইতে চন্দ্র ও তারাগুলি পাড়িয়া দিবার জন্য খুব আবদার করিতে লাগিল। বালকের মাতাপিতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, ঐগুলিকে স্পর্শ করিবারও ক্ষমতা মানুষের নাই। কিন্তু বালক

কিছুতেই শুনিল না। তখন তাহার মাতাপিতা তাহাকে খুব উঁচু ছাদের উপরে উঠাইয়া দিলেন। বালক অত উঁচুতে উঠিয়াও ঐগুলিকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া আকাশের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—''দুষ্ট আকাশ! চাঁদ ও তারাগুলিকে এত উঁচুতে ধরিয়া রাখিয়াছ কেন? আচ্ছা, তোমাকে মজা দেখাইতেছি।'' ইহা বলিতে বলিতে নির্বোধ বালক আকাশের দিকে থুতু ফেলিতে লাগিল। বালক উপরের দিকে যতই থুতু ফেলিতে লাগিল, ততই উহা তাহারই গায়ে পড়িতে লাগিল।

আকাশের প্রতি থুৎকার নিক্ষেপ করিলে যেরূপ তাহা নিক্ষেপকারীর গাত্রেই পতিত হয়, আকাশের কিছুই হয় না, সেইরূপ যাহারা সর্বোত্তম গুরুবৈষ্ণবের প্রতি কুবাক্যবাণ বর্ষণ বা তাঁহাদের নিন্দাদি করিয়া থাকে, সেই সকল কুবাক্য ও নিন্দাদি তাহাদের নিজেদের উপরেই পতিত হয়, উহাতে গুরুবৈষ্ণবের কিছুই হয় না। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও হরিগুরুবৈষ্ণবের দ্বেষ বা নিন্দা-চর্চা করিয়া নিজেই নিজের শরীরের উপরে থুতু ফেলিবেন না। লঘু কখনও গুরুকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য ক্ষুদ্র জীব সর্বদা গুরুবৈষ্ণবের শরণাগত থাকিয়া নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করিবেন।

ঌ❀ও

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা-ভঙ্গ

এক গ্রামে দুইজন প্রতিবেশীর মধ্যে পূর্বে খুব বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু পরে খুবই বিবাদ আরম্ভ হয়। উহাদিগের একজনের নাম সুশান্ত, আর একজনের নাম কৃতান্ত। সুশান্ত দেখিল যে, কৃতান্তের সহিত বিবাদ করিয়া অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা কিছুদিন তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া আসাই ভাল। এই মনে করিয়া সে পুরী-যাত্রার জন্য একটি শুভদিন স্থির করিল। কৃতান্ত দেখিল যে সুশান্ত গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলে তাহাকে আর উদ্বেগ দেওয়া যাইবে না; সুতরাং যে কোনো রূপেই হউক উহাকে দেশেই রাখিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত সর্বদাই বিবাদ করিতে হইবে। কৃতান্ত জানিত যে, সুশান্তের কতকগুলি কুসংস্কার আছে। যে যাত্রাকালে ছিন্ননাসিক ব্যক্তির দর্শনকে অত্যন্ত অমঙ্গল-সূচক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটির সুযোগ লইয়া কৃতান্ত সুশান্তের পুরী-যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট শুভদিনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই নিজের নাকটি কাটিয়া সুশান্তের গৃহের সম্মুখে রাস্তার ধারে বসিয়া রহিল। সুশান্ত যেই ঘরের বাহির হইল, অমনি সে দেখিতে পাইল যে, এক ছিন্ননাসিক ব্যক্তি তাহার বাড়ির সম্মুখে বসিয়া রাহিয়াছে। সুশান্তের আর পুরী যাওয়া হইল না।

গুরুবৈষ্ণববিরোধিগণ এইরূপে নিজেদের নাক কাটিয়া সর্বদাই পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রস্তুত, অর্থাৎ নিজেদের কখনও হরিভজন না হয় না হউক, অনন্তকাল বঞ্চিত হইয়া নরকে পচিতে হয় হউক তাহাতেও ক্ষতি নাই, তথাপি যেন গুরু-বৈষ্ণবের নাম জগতে প্রচারিত না হয়—ইহাই তাহাদিগের গূঢ়

অভিসন্ধি। ইহারা নিজেদের অমঙ্গল, এমনকি আত্মহত্যারূপ নির্বিশেষবাদকে বরণ করিয়া হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি জীবের শ্রদ্ধাভাসকে—জীবের বৈকুণ্ঠের দিকে শুভযাত্রাকে ভগ্ন করিতে উদ্যত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ মৎসরগণের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া একান্তভাবে হরিভজন করিবেন।

পরের সোনা দিও না কানে

পরের সোনা কানে পরিলে যাহার জিনিস সে যে-কোনও মুহূর্তেই তাহা অকস্মাৎ কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারে। তাহাতে সোনা পরিবার সুখ ভোগ করা দূরে থাকুক, কান ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, এমনকি প্রাণ লইয়াও টানাটানি হইতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ''পরের সোনা দিও না কানে, প্রাণ যা'বে তো'র হেঁচ্কা টানে''—এই লৌকিক প্রবাদটির উল্লেখ করিয়া এই শিক্ষা দিতেন যে, জড়বস্তুতে আসক্ত হইলে নিজেকেই কষ্ট পাইতে হইবে। এই পৃথিবীর বস্তুকে যে যতটা আদর করে, উহাদিগকে যে যতটা উপভোগ করিতে চাহে, তাহাকেই ততটা অধিক ক্লেশ পাইতে হয়। মায়াদেবী যে কোনো মুহূর্তেই হেচকা টান দিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আসক্তির দ্রব্যগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি মায়ার কোনও বস্তুর প্রতি আসক্ত না হইয়া একমাত্র সাধুসঙ্গে ও ভগবানের শ্রীচরণেই আসক্ত হইবেন।

চাচা, আপন বাঁচা

সর্বাগ্রে নিজেকে রক্ষা কর, পরে অপরের জন্য ভাবিও। কতকগুলি লোক বিশ্বপ্রেমিকের অভিনয় করিয়া নিজেদের মঙ্গলচিন্তা অপেক্ষা পরের মঙ্গলচিন্তার জন্যই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। ইহাতে তাহারা নিজেদের ছিদ্র না দেখিয়া পরের ছিদ্র, এমনকি, গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে করিতে বিশ্ব প্রেমিকের নামে বিশ্বনিন্দক, গুরুবৈষ্ণবনিন্দক ও শাস্ত্র-নিন্দক হইয়া পড়ে। যাহারা কেবল লোকের নিকট সত্য কথা প্রচার করিবার জন্য অধিক ব্যস্ত, কিন্তু নিজেরা সত্য কথা শ্রবণ করিবার জন্য সেইরূপ চেষ্টান্বিত নহে, তাহারা কখনও আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। এইজন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সর্বাগ্রে নিজের দিকে তাকাইতে বলিতেন। আগে নিজে হরিভজন কর, নিজে আচার কর, নিজেকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা কর, তারপর পরের জন্য ভাবিও। সত্য বটে, তিনি এইকথাও বলিতেন যে, যাহারা পরের উপকার করিতে প্রস্তুত হয় না, তাহারা নিজেদের উপকারও করিতে পারে না। যাহারা প্রচার করে না, কীর্ত্তন করে না, তাহারা নিজেরাও আচার ও সত্য কথা শ্রবণ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি ঐরূপ উক্তিদ্বারা ইহাই শিক্ষা দিতেন যে, সর্বাগ্রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অকপটে আত্মবলি দাও; তাঁহাদিগের শ্রীচরণছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা কর; তবেই

তোমরা কীর্ত্তন করিতে পারিবে, প্রচার করিতে পারিবে, পরের উপকার করিতে পারিবে। যাহারা হরিগুরুবৈষ্ণবকে একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া বরণ করে নাই, তাহারা কোনো দিনই অপরকে রক্ষা করিতে পারে না।

সোনার পাথরবাটি

এক ধনী জমিদার তাঁহার গ্রামের এক স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া তাহার হস্তে একপিণ্ড বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রদান করিয়া বলিলেন—''তুমি এই স্বর্ণের দ্বারা আমার দুগ্ধ পান করিবার উপযোগী একটি সুন্দর বাটি প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহার সহিত কোনও প্রকার খাদ মিশাইবে না বা ইহাতে কোনোপ্রকার কৃত্রিমতা করিবে না।'' স্বর্ণকার ''যে আজ্ঞা'' বলিয়া সেই স্বর্ণ পিণ্ডটি লইয়া চলিয়া গেল।

হস্তে একপিণ্ড স্বর্ণ পাইয়া স্বর্ণকারের ঐ স্বর্ণপিণ্ডটি আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু জমিদারবাবুকে একেবারে বঞ্চিত করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া স্বর্ণকার মনে মনে স্থির করিল যে, বাবুকে সোনার জলে কারুকার্য-খচিত একটি পাথরের বাটি প্রদান করিলে সে স্বর্ণ-অপহরণের দায় হইতে মুক্ত হইতে পারে।

স্বর্ণকার স্বর্ণখচিত একটি পাথরের বাটি জমিদারবাবুর নিকটে উপস্থিত করিলে জমিদারবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ইহা কী আনিয়াছ?" স্বর্ণকার বলিল—"বাবু, ইহা সোনার বাটি। বহু পরিশ্রম করিয়া ইহা তৈয়ারী করিয়াছি।" জমিদারবাবু বলিলেন—"আমি ত' ইহাকে পাথরের বাটি দেখিতেছি! তুমি কী আমার সহিত রহস্য করিতেছ!" তখন স্বর্ণকার বলিল—"বাবু, ইহা সোনার পাথরবাটি।"

যাহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয়বৈষ্ণব, বৈশ্য-বৈষ্ণব, শূদ্র-বৈষ্ণব বা চণ্ডাল-বৈষ্ণব ইত্যাদি বলিয়া থাকে, তাহাদিগের বিচারও 'সোনার পাথরবাটি' বলিবার ন্যায়। হয় 'বৈষ্ণব' বলিতে হইবে, না হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা চণ্ডাল বলিতে হইবে। হয় 'সোনার বাটি' বল না হয় 'পাথরের বাটি' বল। যেরূপ আমের আমসত্ত্বই বলা যায় কখনও 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' বলা যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের শূদ্রত্ব প্রভৃতি বলাও নিরর্থক। যখনই 'বৈষ্ণব' বলা হইয়াছে, তখনই তিনি সামাজিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ, হিন্দু, অহিন্দু প্রভৃতি প্রাকৃত ভেদের অন্তর্গত নহেন, ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। 'হিন্দু বৈষ্ণব' বা 'যবন বৈষ্ণব' কথাগুলি ' সোনার পাথরবাটি' বা 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' প্রভৃতি কথার ন্যায় নিরর্থক ও অপরাধজনক।

নরক গুল্‌জার

একজন ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ এক সময়ে এক মদ্যপায়ীকে বলিয়াছিলেন—"দেখ বাপু! ভাল চাও ত' মদ ছাড়িয়া দাও। শাস্ত্রে আছে—মদ খাইলে নরকে যাইতে হয়।" মদ-খোর উত্তর করিল—"সুরেন বাবু যে মদ খায়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তাহাকে নরকে যাইতে হইবে।"

মদখোর—বরুণ বাবু যে মদ খায়?

ব্রাহ্মণ—সেও নরকে যাইবে।

মদখোর—অরুণ বাবু যে মদ খায়?

ব্রাহ্মণ—যাহারা যাহারা মদ খায়, তাহারা সকলেই নরকে যাইবে।

মদখোর—আর কি করিলে নরকে যাইতে হয়?

ব্রাহ্মণ—মিথ্যাকথা বলিলে, চুরি করিলে, লোককে ঠকাইলে, পরস্ত্রী সঙ্গ করিলে।

মদখোর—তাহা হইলে ভামিনী বেশ্যার কী গতি হইবে?

ব্রাহ্মণ—সেও নরকে যাইবে।

মদখোর—সকল বেশ্যাকেই কী নরকে যাইতে হইবে?

ব্রাহ্মণ—হ্যাঁ।

মদখোর—যাহারা বেশ্যালয়ে যায়, তাহারা কোথায় যাইবে?

ব্রাহ্মণ—তাহারাও নরকে যাইবে।

মদখোর তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল—"তবে ত'

নরক গুল্‌জার! এতলোক যদি নরকে যায়, তবে ত' সেখানে মহা আনন্দের বিরাট মেলা বসিবে!''

পৃথিবীর অনেক ব্যক্তির ধারণা এই যে, জগতের বহু লোক যদি কোনো অতি গর্হিত কার্যও করে, তবে তাহাতে ভয় বা ভাবনার কথা কিছুই নাই। নিষ্কপট ও আন্তরিকভাবে হরিভজন করে না—এইরূপ লোকেরই সংখ্যা পৃথিবীতে অধিক। কাজেই 'গণমত' বা সংখ্যাধিক্যের বলে পরলোকের দণ্ডও অতিক্রম করা যায়—এইরূপ মনে করিয়া অনেকে হরিভজনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বা নিশ্চিন্ত থাকে। ''বহুলোকের যে গতি হইবে, আমারও সেই গতিই হইবে। কাজেই আমরা দুই চারিজন সাধুর উপদেশ শুনিতে যাইব কেন? যে দিকে দল ভারী, সেই দিকেই থাকিব।''—এইরূপ মনে করিয়া অনেকে হরিভজন-বিমুখ হইয়া পড়ে।

কতকগুলি ব্যক্তি বিচার করে—এত লোকের কী অসুবিধা হইতে পারে? আর যদি মরিতে হয়, না হয়, এত লোকের সঙ্গেই মরিব; তাহাতেও একটা সুখ আছে। এইরূপ তমোভাব হরিভজন না করিবার সঙ্কল্পরূপ জাড্য হইতেই উদিত হয়।

শিক্ষককে অঙ্ক কষিয়া দেওয়া

কোনো জমিদার তাহার এক পুত্রের জন্য পনের টাকা মাহিনা ও খাওয়া-পরার খরচ দিয়া একজন গৃহশিক্ষক রাখিয়াছিলেন। জমিদারের পুত্রটি অঙ্কে অত্যন্ত কাঁচা ছিল বলিয়া গৃহশিক্ষক তাহাকে অধিকাংশ সময়েই অঙ্ক করাইতেন। ছাত্রটি শিক্ষককে অঙ্ক কষিয়া দিবার জন্য অনেক সময়ে অনুরোধ করিলেও শিক্ষক মহাশয় বলিতেন—''আমি অঙ্কগুলি কষিয়া দিলে তোমার শিক্ষা হইবে না। আমি প্রথমে অঙ্ক কষিবার প্রণালীগুলি দেখাইয়া দিব, না পারিলে সাহায্য করিব; কিন্তু তোমাকেই সমস্ত অঙ্ক কষিতে হইবে।''

ছাত্রটি বড়ই অমনোযোগী, অলস ও বিলাসী ছিল। তাহার অঙ্ক শিখিবার ব্যক্তিগত কোনো আগ্রহও ছিল না; সে কেবল অভিভাবকের তাড়নায় অঙ্ক শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। একদিন সে তাহার বয়স্যগণের সহিত আলাপকালে গৃহশিক্ষককে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—''আমার জন্য পনের টাকা মাহিনা ও খাওয়া-পরা বাবদ আরও পনের টাকা—মোট এই ত্রিশ টাকা প্রতি মাসে খরচ করিয়া একজন অকর্মণ্য গৃহশিক্ষক রাখা হইয়াছে। তাহাকে প্রত্যহ অঙ্ক কষিয়া দিতেছি। এত টাকা পয়সা খরচ করিয়াও আবার তাহাকে অঙ্ক কষিয়া দিব, তাহার জন্য এতটা পরিশ্রম করিব, এই অত্যাচার আর আমার সহ্য হয় না। নিজেই অঙ্ক কষিলে আর কাহাকে মাহিনা দেওয়া হয় কেন?''

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত গল্পটি

বলিয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেন যে, আমাদিগের অনেকের ধারণা—আমরা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা গুরুসেবার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতেছি; কেহ বা হরিসেবার জন্য অর্থ দান করিতেছি; কেহ বা প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য, সময় প্রভৃতি নিয়োগ করিতেছি; কেহ বা নানাস্থান হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি;—এইরূপে নানাপ্রকার সেবা করিতেছি। ইহা দ্বারা গুরুর কার্যই করিয়া দিতেছি, আমাদিগের কি লাভ হইতেছে? আমরা কেন শিক্ষককে অঙ্ক কষিয়া দিব? তাঁহার জন্য ঐরূপে বৃথা পরিশ্রম করিয়া আমাদিগের কী লাভ? এখানে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, অঙ্ক আমরা নিজের জন্যই কষিতেছি। তাহার দ্বারা শিক্ষক কৃতার্থ হইতেছেন না, আমরাই কৃতার্থ হইতেছি। কারণ, তাহাতে আমাদিগেরই অঙ্ক-শিক্ষা হইতেছে। শিক্ষক অঙ্ক জানেন। তিনি আমাদিগের শিক্ষার জন্যই, আমাদিগের স্বার্থের জন্যই আমাদিগের দ্বারা অঙ্ক কষাইয়া লইতেছেন। আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্যই শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে আমাদিগেরই স্বার্থ আছে। যাহারা নিজেদের মঙ্গলের প্রতি বিমুখ তাহারাই মনে করিয়া থাকে—''গুরুদেবের জন্য, মঠের জন্য, বৈষ্ণবের জন্য, ভগবানের জন্য কেন এতটা পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিব?''

ঌ❀ঙ

শো বটল্ (Show-bottle)

বিলাতী ঔষধ-বিক্রেতাদের বড় বড় দোকানে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য রাস্তার ধারে কাঁচের আবরণের মধ্যে পেট-মোটা বড় বড় বোতলে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের জল ভরিয়া রাখা হয়। উহা একপ্রকার বিজ্ঞাপন বিশেষ। উহার দ্বারা লোককে জানান হয় যে, এই দোকানে নানাপ্রকার ভাল ঔষধ পাওয়া যায়। ঐরূপ বিজ্ঞাপন-প্রচারের বড় বড় বোতলগুলিকে 'শো-বটল্' (Show-bottle) বলে। এই 'শো-বটল্' গুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো ঔষধ থাকে না, কেবল কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রঙের জল থাকে। কাজেই ঐ বোতলগুলির জল পান করিয়া কাহারও প্রকৃত ঔষধ সেবনের ফল হয় না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই ''শো-বট্লের'' উদাহরণটি দিতেন। তিনি বলিতেন যে, মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য, শ্রীচৈতন্যদেবের নাম সংকীর্ত্তন-রূপ মহৌষধ বিতরণের জন্য তিনি যে 'গৌড়ীয় হাসপাতাল' বা ঔষধবিপণী খুলিয়াছেন, তাহারও বাহিরের দরজায় সাধারণ লোককে আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ কতকগুলি 'শো-বটল্' সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। যাহাদের হৃদয়ে সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বা অন্য কোনো অভিলাষ ছিল, শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর তাহাদিগের ঐসকল প্রবৃত্তি দমন করিবার সুযোগ-দানের জন্য তাহাদিগকে 'শো বটল্' করিয়া রাখিয়াছিলেন। পেটমোটা, লম্বা-

চওড়া, বাক্যবাগীশ, বড় বড় দণ্ডধারী উপাধিধারী 'শো-বোটল্' এই রূপ দেখিয়া লোকে যখন 'গৌড়ীয়-হাসপাতালে' প্রবেশ করিবে তখন প্রকৃত সদ্বৈদ্যের নিকট হইতে প্রকৃত ঔষধের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইতে পারিবে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা শো-বটল্ হইতে লাল, নীল জল পান করিয়া, বা ঐ গুলিকে খাঁটি ঔষধ মনে করিয়া তাহাতেই ভুলিয়া গিয়াছেন। আর যাঁহাদের হৃদয়ে রোগ সারাইবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে অর্থাৎ যাঁহারা অকপটভাবে আত্মমঙ্গল লাভ করিতে চাহেন, যাঁহারা সত্য সত্যই খাঁটি হইতে চাহেন, তাঁহারা প্রথমে 'শো-বটল্'-এর বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ঠ হইলেও প্রকৃত সদ্বৈদ্যের নিকট পৌঁছিয়া প্রকৃত ঔষধেরই সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই।

''গৌড়ীয়-হাসপাতালের ঔষধ 'কান' দিয়া সেবন করিতে হয়''—ইহাই ছিল শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশ। যাহারা চক্ষু দিয়া অর্থাৎ কেবল 'শো বটল্' এর রূপ দেখিয়া ঔষধ সেবন করিয়াছিল, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে 'গৌড়ীয়-হাসপাতালে' প্রবেশই করিতে পারে নাই, 'লোক-দেখান' ভাবে প্রবেশ করিলেও তাহাদের প্রকৃত ঔষধ পান করা হয় নাই। যাঁহারা কর্ণের দ্বারা সদ্বৈদ্যের ঔষধ পান করিয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গল হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি কেবল 'শে-বটল্' দেখিয়া বঞ্চিত হইবেন না!

কেহ কেহ বলেন—'শো-বটল্' গুলিকে সাজাইয়া না রাখিলে তাঁহারা এতটা ঠকিতেন না। 'শো-বটল্'-এর বিজ্ঞাপন

বরং খারাপই হইয়াছে। কিন্তু এই বিচার ঠিক নহে। সদ্বৈদ্য জগতে দয়া করিবার জন্য যে ঔষধালয় উন্মোচন করিয়াছেন, তাহা সর্বসাধারণে না জানিলে বহু লোকেরই মঙ্গল হইত না। শাস্ত্র পাঠ করিয়া বহু লোক শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকে বা কুতর্ক শিক্ষা করে বলিয়া ভগবান ব্যাসদেব শাস্ত্র-রচনা করিয়া অন্যায় করেন নাই; তাহা তাঁহার 'অহৈতুকী দয়ার'ই নিদর্শন।

৯০❀০৫

সোনা, রূপা ও লোহার শিকল

এক রাজার পুত্রের সহিত সেই রাজার মন্ত্রীর পুত্র ও কোষাধ্যক্ষের পুত্রের খুব বন্ধুত্ব ছিল। একদিন রাজকুমার, মন্ত্রিপুত্র ও কোষাধ্যক্ষের পুত্র একসঙ্গে দূরদেশে ভ্রমণে বহির্গত হইল। তাহারা অন্য এক রাজার দেশে আসিয়া এক রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। রাজা তখন রাজপুরীতে ছিলেন না, কেবল রাজকুমারী সেখানে বাস করিতেছিল। সেই রাজকুমারীর দুইটি প্রিয়সখী ছিল। একজন সেই রাজার মন্ত্রীর কন্যা, আর একজন কোষাধ্যক্ষের কন্যা। এই তিনজনও পুর্বোক্ত রাজকুমার, মন্ত্রীকুমার প্রভৃতি তিন বন্ধুর ন্যায় পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ইহারা তিনজনই বিবাহযোগ্যা হইয়াছিল।

রাজকুমার ও তাহার দুই বন্ধু উক্ত রাজকুমারীর সহিত তাহার দুই সখীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ক্রমে ক্রমে তিন বন্ধু তিনজন সখীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু, অভিভাবকগণের অনুমতি ব্যতীত কী করিয়াই বা বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়—সকলেই এই চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল যে, আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগের পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত; কারণ শুভকার্য শীঘ্রই সম্পন্ন করিতে হয়।

শুভবিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেল। এদিকে কয়েকদিন পরেই রাজা তাঁহার মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষের সহিত স্বীয় রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, রাজকুমারী ও তাহার সখীদ্বয় তিনজন অপরিচিত যুবকের সহিত আলাপ করিতেছে। রাজা যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীতই তিনজন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারী ও তাহার সখীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছে, তখন তিন জনকেই বন্দি করিতে আদেশ দিলেন।

রাজকুমারী পিতার নিকট অনেক ক্রন্দন করিয়া তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। মন্ত্রীর কন্যাও মন্ত্রীর নিকট এবং কোষাধ্যক্ষের কন্যা তাহার পিতার নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিল। তাহাদিগের ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া রাজা এইমাত্র আদেশ করিলেন যে, ঐ তিনজন যুবককেই বন্দি করা হইবে, তবে তাহাদিগের প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য রাজকুমারকে 'সোনার শিকল', অমাত্যপুত্রকে 'রূপার

শিকলে' ও কোষাধ্যক্ষের পুত্রকে 'লোহার শিকল' দিয়া বন্ধন করা হইবে।

ভগবান জীবগণকে তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কর্মফল অনুযায়ী এইরূপ তিন প্রকার শিকল অর্থাৎ ত্রিগুণের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ করাইয়া থাকেন। সত্ত্বগুণের বন্ধনকে সোনার শিকল, রজোগুণের বন্ধনকে রূপার শিকল ও তমোগুণের বন্ধনকে লোহার শিকলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শিকল যে ধাতুর দ্বারাই নির্মিত হউক না কেন, উহা সকল সময়েই বন্ধন করিবার যন্ত্র। যাহাকে সোনার শিকলে বন্ধন করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকেও বদ্ধই বলা যাইবে; তদ্রূপ যাহারা সত্ত্বগুণ বা রজোগুণের দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে, তাহারাও বদ্ধ জীব। যাহারা পুণ্য ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বা যাঁহারা **মিশ্রসত্ত্ব**-গুণের নানাপ্রকার পুণ্যাদি কর্ম করিতেছেন, তাঁহারাও প্রকৃতির গুণেই বদ্ধ। **শুদ্ধসত্ত্ব** অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত কখনও বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। ভগবানের ভক্তগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বকে 'বসুদেব' বলে। ''সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্।'' শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের আবির্ভাব হয় বলিয়া তাঁহার এক নাম— 'বাসুদেব'। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সোনার শিকল, রূপার শিকল

মিশ্রসত্ত্ব—প্রকৃতির অধীন কোনো বস্তুতে কেবল সত্ত্বগুণ থাকিতে পারে না; তাহার সহিত ন্যূনাধিক রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণ থাকে। তাহাই মিশ্রসত্ত্ব।

শুদ্ধসত্ত্ব—যাহা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অতীত—অবিমিশ্র বা কেবল সত্ত্ব।

বা লোহার শিকল অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব বা রজোগুণ কিংবা তমোগুণ কোনোটিতেই আবদ্ধ না হইয়া নির্গুণা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

আমার মায়া ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা লিপ্তা এবং তাহা অতি অদ্ভুতা ও অলৌকিকী। কেহ উহাকে সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা একমাত্র আমাতেই শরণাগত হন, তাঁহারাই কেবল তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

দরিদ্র ও সর্বজ্ঞ

এক দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে অনেকগুলি ছোট ছোট সন্তান পালন করিতে হইত। ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যের কষ্টে সর্বদাই হাহাকার ও ক্রন্দন করিত। দেশের কোনো লোক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিত। 'ব্রাহ্মণের অনেক অর্থ আছে, বাহিরে দরিদ্রের মত দেখাইয়া কৃপণস্বভাব ব্রাহ্মণ অপর লোকের অর্থ আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে'।— এইরূপ বহুবিধ কুৎসা বলিয়া প্রতিবেশীগণ ব্রাহ্মণের প্রতি

নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিতেন না। একে দারিদ্রের তীব্র কষ্ট, আর এক দিকে লোকের সহানুভূতির অভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ মরমে মরিয়া রহিল।

একদিন এক সর্বজ্ঞ মুনি (যিনি সকল বিষয় বলিয়া দিতে পারেন) ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দুঃখভরে বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিলেন—"ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি এত দুঃখ করিতেছ কেন? তোমার পিতার বিপুল সম্পত্তি রহিয়াছে, তুমি কি তাহা কিছুই জান না? তুমি সেই ধনের অপব্যবহার করিবে মনে করিয়া তোমার পিতা, বোধ হয়, তাহা তোমাকে জানান নাই। তুমি ধনের অনুসন্ধান কর, দেখিবে—তোমার গৃহের প্রাঙ্গণেই তোমার পিতার বহু গুপ্ত ধন প্রোথিত রহিয়াছে।"

সর্বজ্ঞ ইহা বলিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে-স্থানে ধন ছিল, সেই স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ পিতৃধনের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি একটি কোদালি লইয়া দক্ষিণদিক খুদিতে লাগিলেন, তখন সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ওহে ব্রাহ্মণ! সাবধান! সাবধান! দক্ষিণদিকে খনন করিও না, তথা হইতে অনেক ভীমরূল উঠিবে; ধন ত' পাইবেই না, ভীমরুলের দংশনে তোমাকে জ্বলিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞের কথা শুনিয়া এবার ঠিক বিপরীত দিকে খনন করিতে আরম্ভ করিল। এবারও সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সতর্ক করিয়া বলিলেন—"ওহে ব্রাহ্মণ! আরও সাবধান হও। ভীমরুলের দংশন অপেক্ষাও এখানে বিপদ আছে। এই উত্তর দিকে

কালবর্ণের অজগর সর্প বাস করিতেছে; তোমাকে পাইলেই একেবারে গ্রাস করিবে; আর ধন পাইতে হইবে না।''

তখন ব্রাহ্মণ পশ্চিমদিকে গিয়া খুদিতে আরম্ভ করিলেন। এবারও সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিলেন—''ওহে ব্রাহ্মণ! এবার আরও সতর্ক হও। এখানে স্বয়ং যক্ষ ধন আগ্‌লাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইহার নিকট ধন প্রার্থনা করিলে প্রাণনাশ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না। এই যক্ষ এক ভয়ানক প্রাণী; তোমাকে ধনের লোভ দেখাইয়া কত কিছু লাভের আশার কথা বলিয়া শেষটায় তোমার প্রাণ সংহার করিবে।''

এবার দরিদ্র ব্রাহ্মণ অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং ক্ষোভে, দুঃখে, নিরাশায় অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া সর্বজ্ঞকে বলিতে লাগিলেন—''হায়! তুমিও আমার সহিত বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছ! আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, মনের দুঃখে সর্বদা ব্যথিত, প্রতিবেশীগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতেছিলাম; কিন্তু তাহারাও ত' আমাকে এইরূপ ধনের লোভ দেখাইয়া পরিশেষে নিরাশ করে নাই! শেষে কী অজ্ঞাতকুলশীল মায়াবীর হস্তে প্রাণ হারাইতে হইবে!''

সর্বজ্ঞ বলিলেন—''ব্রাহ্মণ! তুমি অস্থির হইও না; আমার কথা শুন, ইহাতে বিশ্বাস কর। তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় বিপদের পথগুলি বরণ করিয়া লইতেছিলে, আমি কেবল তোমাকে তাহা হইতে সতর্ক করিয়াছি; আমি তোমার সহিত বিদ্রূপ বা তোমার প্রতি হিংসা করিতেছি না, তোমার যাহাতে প্রাণ-রক্ষা হয়, অথচ তুমি পিতার সম্পত্তি লাভ করিয়া 'ধনী' হইতে পার, সেই উপায়ই তোমাকে বলিয়া দিতেছি। যেখানে কোনো শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহাকে ঘিরিয়া অনেক বিঘ্নও আছে। যাহাতে তুমি তোমার পিতৃধন ভোগ করিতে না পার এজন্য দক্ষিণদিকে ভীমরুলের প্রকাণ্ড চাক রহিয়াছে এবং উত্তর ও পশ্চিমদিকে কৃষ্ণ অজগর ও যক্ষ উহা পাহারা দিতেছে। তোমার পিতা বুদ্ধিমান, তাই পূর্বদিকে সোনার মোহরভরা কলসটি পুতিয়া রাখিয়াছেন। তোমাকে আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না, অল্প একটু মাটি খুদিলেই তোমার হাতে সেই ধনের কলসীটি পড়িবে।''

এবার ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞের বাক্য বিশ্বাস করিয়া পূর্বদিকের মাটি খুদিতে আরম্ভ করিলেন। সামান্য মাটি খুদিতেই এক সোনার কলস পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রারাশি প্রাপ্ত হইলেন। ধন পাইয়া ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তাহা সমস্ত দুঃখ দূরে গেল; তিনি সুখ-ভোগ করিতে করিতে মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এই দৃষ্টান্তের দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রভু ও রক্ষাকর্তা, তাঁহাতে ভক্তিই তাহার একমাত্র ধর্ম এবং তাঁহার সেবানন্দ-লাভই চরম প্রয়োজন, ইহা না জানিয়া জীব ঐ দরিদ্রের মত দুঃখ পাইতে থাকে। কিন্তু পরম কৃপালু ভগবান শাস্ত্র, গুরু ও অন্তর্যামিরূপে জীবকে তাহার ঐ নিত্যধনের কথা জানাইয়া দেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুদেব জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সংসারের দুঃখে ব্যথিত জীবের দ্বারে আসিয়া যখন দেখেন—জীব প্রেম-মহাধনের সন্ধান না পাইয়া এই সংসারের সুখ ও দুঃখের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে,

তখন তিনি তাহাকে বলেন,—''ওহে জীব! তোমার পিতৃধনের সন্ধান না জানায়—তোমার পরমপিতা পরমেশ্বরের সেবানন্দ মহাধনের সন্ধান না জানায় নিজকে এইরূপ দরিদ্র ভাবিতেছ। তুমি যে লক্ষ্মীপতির সন্তান, তোমার আবার ধনের অভাব কী? তোমাকে ধনের বার্তা বলিয়া দিতেছি। দেখ, তোমাকে তৎসঙ্গে সতর্ক করিয়াও দিতেছি—তুমি দক্ষিণ, উত্তর বা পশ্চিমদিকে ধনের সন্ধান করিতে যাইও না; ঐ-সকল দিকে ভীষণ বিপদ আছে। তুমি ধন ত' পাইবেই না, অধিকন্তু প্রাণ নাশ হইবে।''

এই দক্ষিণদিকই 'কর্মকাণ্ডের' দিক। যাহারা যমের দ্বারা দণ্ডিত হয়, সেই-সকল ব্যক্তি দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া ফল প্রদান করিতে উদ্যত হয়। এখানে ভোগবাসনারূপ 'ভীমরুল' বাস করে। ইহাতে ভোগের আশা ত' পূর্ণ হয়-ই না, ভোগবাসনার জ্বালায় কেবল ছটফট করিতে হয়।

দক্ষিণদিকে এইরূপ বিপদ আছে মনে করিয়া ইহার ঠিক বিপরীত উত্তর দিকেও খুদিও না। ভোগবাসনা ছাড়িয়া তাহার বিপরীত ত্যাগ-বাসনাও করিও না; কর্মকাণ্ড ছাড়িয়া জ্ঞানকাণ্ড ধরিও না। যাহারা এই জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন করে, তাহারা 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ কল্পনা করিতে করিতে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। জ্ঞানকাণ্ডে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে না, কৃষ্ণ অজগররূপ 'নির্বাণ' বা 'ব্রহ্মলয়' জীবাত্মাকে গিলিয়া ফেলে। আর উত্তরদিক হইতে পাশ ফিরাইলেই যে পশ্চিমদিক পাওয়া যায়, সেইদিকেও ধনের অনুসন্ধান করিতে যাইও না—ইহা 'যোগমার্গ'। যোগ পথিমধ্যে নানাপ্রকার বিভূতি ও ঐশ্বর্যের লোভ দেখাইয়া তোমাকে প্রলুব্ধ

করিবে; কিন্তু শেষে তোমার আত্মাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। জ্ঞানমার্গে আত্মার অস্তিত্বই হয় না; আর যোগমার্গ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ও নানা লোভ দেখাইয়া আত্মাকে 'পরমাত্মায় লীন' করিয়া দেয়। অতএব ইহা আরও ভীষণ।

পূর্বদিকই—'ভক্তিপথ'। পূর্ব বা পুরাণ বা নিত্য শাশ্বত ধন 'কৃষ্ণভক্তির পথ' গ্রহণ করিলেই অনায়াসে 'প্রেম-মহাধন' পাওয়া যায়। এই 'প্রেম-মহাধন' লাভ হইলে আপনিই দুঃখ পলাইয়া যায়। দরিদ্রতা-নাশ অর্থাৎ সংসারের ক্লেশের বিনাশ—প্রেমের ফল নহে। যেমন, ধন পাইলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ পলাইয়া যায়, সেইরূপ 'প্রেমফল' লাভ করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের অভাব, অসুবিধার বোধ থাকে না। তখন কী করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিব, সেই সেবানন্দের জন্যই উৎকণ্ঠা হয়। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও প্রেম—এই তিনটি 'মহাধন' **আম্নায়বিৎ** বা তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর বা বৈষ্ণবের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক শুদ্ধভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া এই মহাধনের অনুসন্ধান করিলে জীব সর্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে।

ഋ❀ଓ

আম্নায়বিৎ—গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রুতি বা তত্ত্বজ্ঞান যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন।

* সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্নচাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥—শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১১।১।৩১

তিন ভাই

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি বুদ্ধির গুণ, ইহারা আত্মার গুণ নহে! সত্ত্ব বৃত্তির দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিকে জয় করিবে, আর শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তি দ্বারা মিশ্রসত্ত্ববৃত্তিকে বিনাশ করিবে।*

বুদ্ধি মাতার তিন পুত্র—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। তিন জনেই একই মাতার সন্তান বলিয়া সম্পত্তির সমান ভাগ দাবি করে, কেহ একচুলও কম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহে।

উহাদিগের নিকটেই আর এক ব্যক্তি দেখিতে ঠিক উহাদিগের ন্যায় হইলেও সর্বদা উহাদিগের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতেন—অন্তরে কখনই উহাদের সঙ্গে মিশিতেন না। কিন্তু উহাদের মঙ্গলের চেষ্টাই করিতেন। উহারাও পূর্বে এই ব্যক্তিটিকে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করিতেন। বাহিরের লোকে দূর হইতে দেখিতেন—ইহারা চারিজন ভাই যেন পরস্পর একত্র হইয়া একই মাতার সেবা করিতেছে। পূর্বোক্ত তিন ভাইএর মধ্যে অধিকাংশ সময়ই কামিনী, কাঞ্চন ও সম্মানের ভাগবাঁটোয়ার লইয়া কোনোও না, কোনোপ্রকার মনোমালিন্য বা বিবাদ হইত। মাতা ও পিতা ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইতেন ও চতুর্থ নিঃসঙ্গ ব্যক্তিটির নিকট এই সকল কথা বলিতেন।

মাতা-পিতার পরলোক-গমনের পর তিন ভাই প্রকাশ্যভাবে বিবাদ আরম্ভ করিলেন। রজোগুণ বলিয়া উঠিলেন—''আমি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশ আমার জয় গান করিতেছে! আজ আমি যদি তাঁহাদিগকে না চিনাইতাম, তবে আমার মাতাপিতাকে কে চিনিত? তোমরা সকলেই ত' অলস ও মূর্খের দল। তমোগুণ কখনও জগতে বড় হইতে পারে না, রজোগুণের আসনই সকলের উপরে।''

তখন মিশ্রসত্ত্বগুণ বলিলেন—''তুমি পাশ্চাত্যদেশে লেনিন, ষ্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনী, ফ্র্যাঙ্কো, ডি-ভ্যালেরা প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পিতৃপুরুষের পথ ও মত পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু আমরা তাহা ত্যাগ করি নাই! আমাদিগের সদাচার, শাস্ত্রচর্চা, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সকলই আছে, আমরা সাত্ত্বিক। সুতরাং আমরাই পিতার সম্পত্তির অধিকারী। তুমি যদি আমাদিগের অনুগত থাক, তবেই তোমাকে কিছুটা ভাগ দিতে পারি।''

রজোগুণ বলিল—''পৃথিবীর সর্বত্র আমার নামের প্রচার হইয়াছে; তোমাদিগকে কে চিনে? আমি কেন তোমাদিগের অধীন থাকিব? আমি পাশ্চাত্যদেশে স্বতন্ত্রভাবে আমার নামের মনুমেণ্ট উঠাইব!''

যখন মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন সহোদরের মধ্যে পরস্পর ভাগবাঁটোয়ারা লইয়া এইরূপ মনোমালিন্য চলিতেছে, তখন বহির্দৃষ্টিতে দেখিতে ভ্রাতার ন্যায় চতুর্থ নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব ঐসকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য নিজ স্বাভাবিক অধিনায়কত্ব প্রকাশ করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের বাণী সার্থক ও জীবের মঙ্গল বিধান করিবার চেষ্টা করিলেন।

পূর্বে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন ভাই শুদ্ধসত্ত্বকে নিঃসঙ্গে

দেখিয়া তাঁহার প্রতি কেহ বা আন্তরিক, কেহ বা মৌখিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। যখন ইঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, এইবার শুদ্ধসত্ত্ব তাহাদিগের উপর অধিনায়কত্ব করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন রজোগুণ ত' ক্ষেপিয়াই উঠিলেন, আর রজোগুণের সংযোগে তমোগুণেরও কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা-ভঙ্গ হইল! মিশ্রসত্ত্বগুণ প্রথমে মুখে কিছু কিছু শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিলেন বটে; কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন—মিশ্রসত্ত্বকেও বিনাশ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহার আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত, তখন মিশ্রসত্ত্ব আর দুইটি ভাই এর সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। এইবার তিন ভাই একত্র হইয়া এরূপ চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলেন—''যখন আমাদিগের তিন-জনকেই দলন করিয়া সকলের উপরে তাঁহার অদ্বিতীয় আধিপত্য স্থাপন করিবেন, তখন আমাদিগের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য না রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া যাওয়াই উচিত। আমরা তিনজনই যখন প্রকৃতির গুণ, তখন তিন জনের মধ্যে সামান্য মতভেদ লইয়া শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মবলি দেওয়া কর্তব্য নহে।''

পূর্বে কেবল রজোগুণই গণ-মতের সমর্থন পাইয়াছিলেন; এইবার তিন ভাই এক হওয়ায় গণমত তাঁহাদিগেরই অধিক যোগ্যতা ও দাবি স্বীকার করিলেন। গণমত বলিতে লাগিলেন,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন ভাই ইতঃপূর্বে একত্র হইয়া আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া সমস্ত কাজ করিয়াছেন, বড় বড় সৌধ ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বিরাট স্তূপ নির্মাণ করিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব কী করিয়াছেন, আর কি-ই বা করিতে পারিবেন? তিনি

ত' ঠুঁটোরাম হইয়া থাকেন, তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কোনো ক্ষোভের বা আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু তিনি যদি নিয়ামকত্ব গ্রহণ করেন, তবেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিবাদ; কেননা, তাহা হইলে তাঁহারা ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া পরস্পর সংঘর্ষ, স্বতন্ত্রতা, যথেচ্ছচারিতা প্রভৃতি চালাইতে পারে না।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ সত্ত্ব' রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর বিবাদ ও ঐসকল গুণের সংঘর্ষ বিনাশ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব-স্থাপনের দৃষ্টান্তটি উল্লেখপূর্বক উপদেশ প্রদান করিতেন। গণ-মত শুদ্ধসত্ত্ব, মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই চারিজনকে সহোদর বা একই মাতা-পিতার সন্তান মনে করিলেও, অথবা শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্বকে একাকার করিয়া তিন ভাই এরই অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও এবং এই তিনজন বা চারিজনেরই পিতার সম্পত্তিতে অর্থাৎ ভগবানের প্রেমধনে সমান দাবি আছে বলিলেও একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বই প্রেমধন-গ্রহণের যোগ্যতম নিত্যসিদ্ধ অধিকারী। ঐ সকল মিশ্রগণ পরস্পর মারামারি করিয়া বিনষ্ট হইবে; উহারা কেহই কাহারও নিত্যমঙ্গল করিতে পারে না; কারণ উহাদিগের প্রত্যেকেরই অপস্বার্থ আছে। কিন্তু কেবল শুদ্ধ-সত্ত্বেরই একমাত্র বিষ্ণুর সেবা স্বার্থ ব্যতীত অন্য অপস্বার্থ না থাকায় তিনি অদ্বিতীয় অধিনায়ক হইয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। একমাত্র তাঁহার আনুগত্যের দ্বারাই ঐসকল গুণেরও প্রাকৃতভাব বিদূরিত হইতে পারে।